আগুনপাখি

হাসান আজিজুল হক

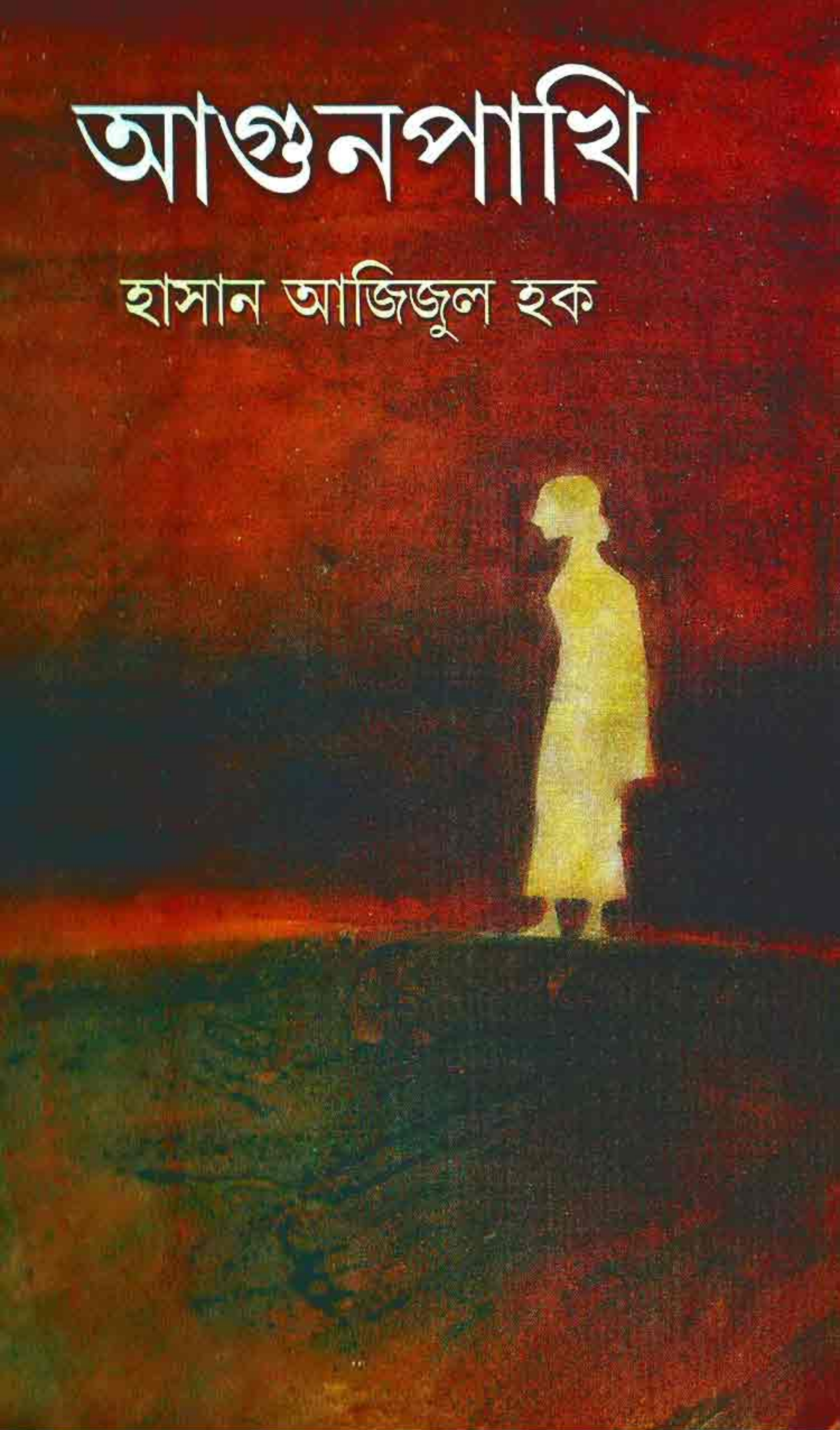

গাঁয়ের একটি মেয়ে, বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ির বাইরে সে জানে চারপাশের মানুষজনকে, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু। হিন্দু বলে তারা যে আলাদা, তেমন তো কিছু বোঝে না সে। গভীর মমতায় সে গড়ে তোলে তাদের বড় একান্নবর্তী সংসার, আর রাতের নিরালায় স্বামীর কাছে শিখে নেয় অল্পস্বল্প লেখাপড়া। সুখদুঃখের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে দেখে কেমন করে তার স্বামী জড়িয়ে পড়ে সামাজিক কাজে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছেই কতটা প্রিয় এক নেতা হয়ে ওঠে সে। কিন্তু হঠাৎ যেন পালটে যায় সব। তাদের একান্নবর্তী সংসারেও ধরে ভাঙন, আর বাইরেও কোথা থেকে রব ওঠে যে দেশটাও না কি হয়ে যাবে ভাগ। তা কী করে হয়? দেশ আবার ভাগ হয় কেমন করে? অবিশ্বাস্য সেই ঘটনাও সত্য হলো একদিন। মুসলমান পাড়া-প্রতিবেশীরা চলে যেতে লাগল ভিটে ছেড়ে। পরিজনেরাও। কিন্তু সে? না, সে কিছুতেই যাবে না, কেননা, সে বলে : 'আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটো দ্যাশ হয়েছে, ...[কেন] এই দ্যাশটি আমার লয়।'

সেই মেয়েটির মুখের আটপৌরে ভাষায় বলা এ এক বুকভাঙা দেশভাগের গল্প।

ISBN : 978-81-295-0820-1

উৎসর্গ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

ভাই কাঁকালে পুঁটুলি হলো

আমার মায়ের য্যাকন মিত্যু হলো আমার বয়েস ত্যাকন আট-ল বছর হবে। ভাইটোর বয়েস দেড়-দু বছর। এই দুই ভাই-বুনকে অকূলে ভাসিয়ে মা আমার চোখ বুজল। ত্যাকনকার দিনে কে যি কিসে মরত ধরবার বাগ ছিল না। এত রোগের নামও ত্যাকন জানত না লোকে। ডাক্তার-বদ্যিও ছিল না তেমন। মরবার আগে মুখে যেদি ওষুধ পড়ত, তাই কতো! পেরায় পিতি বছর কলেরা-বসন্তেই কতো যি লোক মরত, তার সীমাসংখ্যা নাই। আমার মা যি কলেরা-বসন্তে না মরে অজানা কি একটো রোগে মারা গেল তাই কতো ভাগ্যি!

মায়ের মওত আমার পষ্ট মনে পড়ে। এক বাদলের রাত-দোপরে জান গেল। কাঁদবার পয্যন্ত লোক নাই। বাপজি দখিন-দুয়োরি ঘরের উসারায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে। তার এক খালা ছিল, আমি দাদি বলতম– সেই দাদি এসে সব দেখাশোনা করলে। আমার মনে আছে– ঘরে জ্বলছে রেড়ির ত্যালের পিদিম, দেড়ু বছরের ভাই ঘুমিয়ে আছে অঘোরে, গায়ে একটো ক্যাঁথা চাপানো। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকছে বাদুলে হাওয়া। পিদিম নেবে নেবে। তা সকাল না হলে তো করার কিছু নাই। মওতা সারা রাত অমনি করে থাকলে, একটো পুরনো শাড়ি চাপা দেওয়া, মুখ মাথা ঢাকা। মনে হছিল দুনিয়ায় আমাদের কেউ নাই। সবই ছিল আমাদের, তবু মনে হছিল।

মা মরার পরে ভাইটি সেই যি আমার কোলে উঠল আর তাকে নামাইতে পারলম না। যেখানে যাই, সে আমার কাঁকালে আছে। ইদিকে বাড়ি ফাঁকা, দেখার কেউ নাই। অতো বড় বাড়ি! উঁচু-উসারা-অয়লা দখিন-দুয়োরি ঘরটো ত্যাকন করা হয়েছে। তা বাদে বিরাট লম্বা এগ্‌নে, তার দখিন মাথায় আর একটো বড় ঘর। ই ঘরটো উত্তর-দুয়োরি। ত্যাকন ঘরটো পড়ে থাকে। দখিন-দুয়োরি ঘরেই আমাদের ওঠা-বসা। বাপজি ঘরটো বানিয়েছিল খুব যত্ন করে। হোক মাটির– আমাদের দ্যাশের পেরায় সব বাড়িই তো মাটির– ঘরটোর মাটির দেয়াল ছিল খুব চ্যাওড়া, খরানির কালে ঘর যেন ঠান্ডা হিম, ঢুকলেই জানটো একেবারে তর হয়ে যেত। ছাউনি খ্যাড়ের, গরম হবে কোথা থেকে? খ্যাড়ের চালের তলায় কাঠামো ছিল লোহার মতুন কালো কুচকুচে সারি তালকাঠের।

তা অ্যাকন আমি বাড়িতে দিনরাত থাকি কেমন করে? বাপজি দিনের বেলায় কতোক্ষণই বা বাড়িতে থাকত! দখিন-দুয়োরি ঘরের উসারার ছামনেই আঁজির গাছ। ঐ পেয়ারাই, আমরা বলতম আঁজির। ই আঁজির গাছটো ঠিক যেন মাহারুহ, পেল্লায় বড়। পেয়ারা গাছ কুনোদিন অতো বড় হয় না। মণ মণ আঁজির হতো, ভেতরটো ছিল গোলাপি লাল আর মিষ্টি যেন গুড়। ভাইকে নিয়ে এই আঁজির গাছের তলাতেই দিন কেটে যেত। দখিন-দুয়োরি ঘরটোর ঠিক পেছনেই ছিল আর একটো ছোট ঘর। ঐ ঘরে থাকত আমার ঐ দাদি, বাপজির খালা। তিন কুলে কেউ নাই। সোয়ামি-ছেলেমেয়ে সব মরে-ঝরে যেয়ে দাদি একা। ছোট ঐ ঘরে সারাদিন খুটুর খুটুর করে বেড়াত। ঘরের ভেতরটো আঁদার, একটিমাত্র দরজা ঘরে ঢোকার লেগে, কুনোদিকে কুনো জানেলা নাই। ঘরের বাইরে উসারার এক পাশে একটো মাটির চুলো। রান্নাবাড়া সব ঐখানে। ঘরের ভেতরে শুদু হাঁড়ি সাজানো। কালো কালো হাঁড়ি, বড়-ছোট হিসেব করে একটোর ওপরে আর একটো বসানো। সার সার শুদু হাঁড়ি, অতো হাঁড়িতে কি যি থাকত

কে জানে! একটো মোটে মানুষ, কি-ই বা থাকবে?

দাদি আমাকে খুব ভালোবাসত। আমিই বা আর কোথা যাই, ভাই-কোলে দাদির কাছে কাছেই থাকতম। বয়েস তো ত্যাকন অ্যানেকটোই হয়েছে, দাদির এটা-ওটা ফাই-ফরমাশ খাটতম। কিন্তুক ভাই কি কোল থেকে নামবে? সব সোমায় আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কাঁকালে আমার ঘা হয়ে গেল। দাদি বুড়ি মানুষ। খুব ফরশা, মুখে বসন্তের দাগ। অমন মানুষ হয় না। ফল-পাকুড় যা পেত আমার হাতে তুলে দিত। পেরায়ই আমাকে বলত, আমার যা আছে সব তোকে দিয়ে যাব। কি-ই বা এমন ছিল তার? সেই দাদির দেওয়া বড় একটো কাঁসার জামবাটি এখনো আছে আমার কাছে। দাদির ঐ একমাত্র জিনিশ আজও টিকে আছে।

আমার বাপ দাদির ইসব দেওয়া-থোয়া তেমন পছন্দ করত না। খুব রাশভারি মানুষ ছিল, কাউকে তেমন গেরাহ্যি করত না। মাহা বেপদ হলেও কাউরি কাছে যেয়ে কিছুতেই কুনো ব্যাগোতা করত না। তাই বলে বাপজির কিন্তুক মেজাজ গরম ছিল না। বরং উল্টো, খুব আস্তে আস্তে তার কথা। হড়বড় করে কিছু বলত না কুনোদিন। তেমন একটো হাসত না, তবে ভেতরে ভেতরে মজা ছিল খুব কথায়। তা সি যা-ই হোক– কে এসে কি হাতে দেবে ছেলেমেয়ের, বাপজি তা তেমন ভালোবাসত না। তা বলে কি আপন খালার ওপর রাগ করবে? তা লয়।

দাদি পড়ে থাকত এক কোণে। এই গতর, মিশিমাখা দাঁত। দাঁতে তুঁত দিত যি! কুনো পাউডার ত্যাকন ছিল না। গায়ে-মাখা সাবান তা-ও ত্যাকন তেমন পাওয়া যেত না। দাদি কুনো গন্ধ কি কুনো বাস একটুও সইতে পারত না। বোধায় ফুলের গন্ধও নাকে গেলে থু থু করে থুতু ফেলত। কুনো ভালো গন্ধ কি কুনো বাস যেদি দাদির নাকের ছামনে ধরেছি মজা দেখার লেগে, দাদি অমনি কাপড় দিয়ে নাক চেপে ছুটে যেয়ে ঘরে ঢুকত। তা-বাদে শুকুইয়ের হাঁড়ি শুঁকে তবে তার

ধড়ে জান আসত। এমন মানুষের ওপর কেউ কুনোদিন রাগ করতে পারে! আমরা দুই ভাই-বুন ছেলম তার জানের জান। বাপজি তাইলে তার খালাকে আর কি বলবে? সে তো নিজেই বুঝতে পারছে যি, সোংসার অচল হয়ে গেয়েছে। কে রাঁধে, কে খেতে দেয়? কে ঘর ঝাঁট দেয়? সব যি আঁদার। আমি নাইলে এট্টু বড় হয়েছি কিন্তুক ঐটুকু ভাইটিকে কে দেখে? কে লাওয়ায়, খাওয়ায়?

শেষতক বাপজিকে আবার বিয়ে করতে হলো। লতুন মা এল ঘরে। পাতলা কালো মেয়ে, আমার চেয়ে ছ-সাত বছর বড় হবে। মাথায় লম্বা কালো চুল, হেঁটোর নীচে পড়ছে। বড় বড় চোখদুটিতে ভারি মায়া। নিজের মা গেলে কি আর মা পাওয়া যায়! সি কথা সত্যি বটে। মা ফিরে প্যালম না ঠিকই, তবে মায়েরই মতুন আর সেই সাথে সখির মতুন একজনাকে প্যালম। সংসারে আবার ছিরি ফিরল।

কিন্তুক ভাইটি আমাকে ছাড়লে না, আঁকড়ে ধরে থাকলে। কোল থেকে তাকে আর নামাইতে পারি না। লতুন মা অ্যানেক চেষ্টা করলে ওকে কাছে টানতে। সে কিন্তুক হরগেজ আমাকে ছাড়বে না। খাবে আমার কাছে, শোবে আমার কাছে। আমার কাঁকালে সে যেন সব সোমায়ে একটো পুঁটুলি!

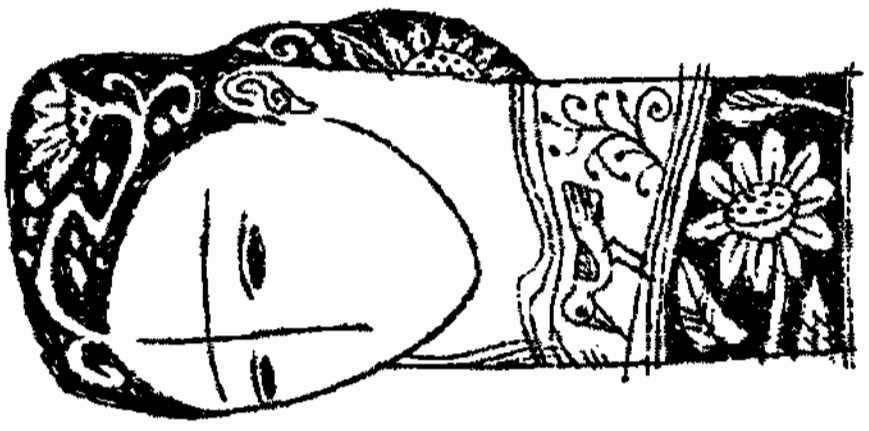

বিছেনা ছেড়ে একদিন আর উঠলে না

দাদি আমার বাপজিকে একটুকুনি ভয়ই করত। যেদি কিছু খেতে দেবে, একটো লাড়ু, বাতাসা কি পাটালি কিংবা চিনির কদমা, আড়ালে ডেকে নিয়ে যেয়ে লুকিয়ে দিত। লতুন মা য্যাতোদিন ছিল না, বাপজি ত্যাতোটো খেয়াল করত না। সারাদিন বাড়িতেই থাকত না, তা খেয়াল করবে কি? লতুন মা এলে বাড়ি আবার ঠিকঠাক হলো, ঘর-দুয়োরে ঝাঁট পড়তে লাগল, ঘরের মেজে-দেয়ালে আবার লাতা দেয়া হতে লাগল। লিয়ম ধরে রাঁধা-বাড়া চলল। সোংসার আবার ঠিক হলে আমাদের হাতে দাদির দেওয়া খাবার-দাবার দেখলে বাপজি যেন অখুশি হতো। তবে ঠান্ডা মানুষ তো! য্যাতোই রাশভারি হোক, চ্যাঁচামেচি কুনোদিন করত না। কিন্তুক তার অখুশির কথা বুক যেন ছ্যাঁদা করে দিত। তা সহ্যি করা খুব কঠিন। আমি জানতম বলেই দাদিকে বলতম, সবকিছু আমাদের দিতে যাস ক্যানে দাদি?

তু যি আমার জান বুন। ই দুনিয়ায় আর থাকা কিসের লেগে? তিন কুলে আমার কেউ নাই। সোয়ামি নাই, পুত নাই, মেয়ে নাই, ভাই নাই। খালি তুই আছিস। আল্লা জানে, তুই আছিস তাই আমার দুনিয়ায় থাকা।

ই কথার কি কুনো জবাব আছে? দাদি যি বলত আমার যা আছে সব তোর– তা আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখতম দাদির কি আছে। ঐ কোঁদাকাটা আঁদার ঘর আর কালো কালো মাটির হাঁড়ির সার আর তো কিছু দেখি নাই দাদির। তবে দাদি য্যাকন আমাকে বলত, আমার জানের জান, ত্যাকন বোঝতম দাদির জান আছে। ঐ একটো জিনিসই আছে, আর সেটো আমার। আঃ, হায়রে– সেই জানটো কি আমার!

একদিন ঠিক সকালবেলায়, কাক ত্যাকন ডেকেছে কি ডাকে নাই, আমি যেয়ে দেখি দাদি ত্যাকনো ওঠে নাই। আমকাঠের ভাঙা দুয়োরটো ঠেসানো। ভাবলম এমন তো কুনোদিন হয় না! দাদি ওঠে

সুয্যি ওঠার আগে আঁদার থাকতে। ই কেমন কথা হলো? আমি যেয়ে দরজাটো ঠেলা দিয়ে খোললম। ঘর আঁদার। ঘরের ভেতরে কিছুই দেখা যেছে না। তাপর একটু একটু আবছা দেখলম খেজুরপাটির ওপর ক্যাঁথার বিছেনায় দাদি শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে ডাকলম, ঠ্যাললম, সাড়া দিলে না। ত্যাকন আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠলম। দাদি আর বিছেনা ছেড়ে উঠলে না। মরে কাঠ হয়ে আছে!

বাপজির খালা য্যাকন, ত্যাকন দাদির লিশ্চয় অ্যানেক বয়েস। তা কতো হবে? কে বলবে সি কথা? ত্যাকনকার দিনে লোকে নিজের বয়েস জানত না। মরা নিয়ে কারও কুনো ভাবনা ছিল না। মওত ত্যাকনকার জ্যান্ত মানুষের পেছু পেছু ঘুরে বেড়াত। বয়েসের কথা ভেবে আর কি হবে? তবে মনে হয়, অ্যানেক বয়েস হয়েছিল দাদির। চার-কুড়ি বছরেরও বেশি হবে।

দাদি চলে গেল যেন দুনিয়ার সব গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে গেল। আবার দাদি নিজেও কতোদিন বাদে শুকনো পাতার মতুনই কোথা হারিয়ে গেল! অ্যাকন আর কিছুই মনে পড়ে না। তবে বুকটোকে চিরলে সোনার পিতিমে আমার দাদিকে আজও দেখতে পাওয়া যাবে লিশ্চয়। কোথা দাদির কবর অ্যাকন আর কেউ জানে না। আমিও জানি না। অথচ আমি ঠিক জানতম কবরটো কোথা। কিন্তুক সি জায়গায় গেলেও অ্যাকন আর বলতে পারব না।

বাপজি ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার কুনো কিছুকে যি ভালোবাসত তা চোখে দেখতে পাবার উপয় ছিল না। কুনোদিন বাপজির কোলে উঠেছি বলে মনে পড়ে না। গায়ে মাথায় হাত দিলে কি দুটো মিষ্টি কথা বললে, কখনো এমন দেখি নাই। কথাই তো বলত কম। মা য্যাকন গেল ত্যাকন তো আমি বেশ বড় হয়েছি– কই বাপজি তো একবারও কাঁদলে না, চোখ থেকে দু-ফোঁটা পানি ফেললে না? ত্যাকনকার ভাবই ছিল এইরকম। বউ মরলে কাঁদলে সেই পুরুষের খুব নিন্দে।

মনে পড়ে, ঘরের ভেতর ছেঁয়া-ছেঁয়া আঁদারে বাপজি খালি গায়ে খেতে বসেছে। পরনে শুদু একটো ধুতি পরা। বেরাট মানুষ, ফরশা ধপধপে গায়ের রঙ। বেরাট কাঁসার থালায় ঝিঙেশাল চালের ভাত, বড় বড় কাঁসার বাটিতে নানারকম তরকারি। মাছ-গোশ্‌তো ত্যাতো লয় কিন্তুক। সব শ্যাষে জামবাটি ভরা ঘন দুধ, কলা আর আখের গুড়। বাপজির গায়ের বলও ছিল তেমনি। এই নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে কতো গপ্পো! অত বল, কিন্তুক কুনোদিন একটি লোকের গায়ে হাত তোলে নাই। জেনে-শুনে একটি পিঁপড়ের ক্ষেতিও করে নাই। কুনোদিন কুনো মানুষকে একটো অকথা-কুকথাও বলে নাই। তবু কতো যি কথা ছিল তাকে নিয়ে! একবার একটো আখমাড়াইয়ের কল দশজনা মিলে সরাইতে পারছে না। যিখানে আখমাড়াই হবে, সাল হবে, গুড় উঠবে– সি তো বছরের একটো উচ্ছবই বটে– কলটোকে গরুর গাড়িতে তুলে সিখানে নিয়ে যেতে হবে। ঐ কল পুরোটা লোহা দিয়ে তৈরি। চার ধারে শুদু চারটে শালকাঠের পায়া। দশজনায় সি কলটোকে কিছুতেই জুৎ করতে পারছে না। দেখতে দেখতে বাপজির কি যি হলো, আস্তে আস্তে বললে, সর্‌ দিকিনি তোরা। এই বলে একাই সেই লোহার কল সাপুটে ধরে মাটি থেকে চাগিয়ে তুলে ফেললে। এই আচ্চয্যির কথা এখনো সবাই বলে।

ইদিকে ল্যাখাপড়া জানা মানুষ– বাংলা জানত, ফারসি জানত। গাঁয়ে ত্যাকন পাঠশালা হয়েছে বটে কিন্তুক বাপজি কোথা থেকে ওসব শিখেছিল, তা জানি না। ল্যাখাপড়া শেখার লেগে ত্যাকনকার দিনের মানুষ কোথা কোথা সব চলে যেত। বাপজি-ও লিশ্চয় কোথাও যেয়ে শিখেছিল ল্যাখাপড়া। ফারসি বয়েত বলত মাঝে মাঝে আর একটো বাংলা শুভঙ্করি বই লিখেছিল। ইসব অ্যানেকদিন দখিন-দুয়োরি ঘরের চ্যাঙারিতে টাঙানো ছিল। পরে আর দেখি নাই।

জমিজমা আমাদের বেশ ছিল। খাওয়া-পরার অভাব হতো না। কিন্তুক ঐ জমিই সব– আর কিছু নাই। কঠিন ছ্রম না করলে কিছুই

পাবার উপয় ত্যাকন ছিল না। জান-পরান দিয়ে খাটলে ভাতের অভাব নাই। নিজে খাও, গরিব-দুখিকে দাও। নুন আর মশলাপাতি ছাড়া কিছুই তো কিনতে হতো না। পরের কালে দেখলম কেরাসিন কয়লা আর মিলের শাড়ি কিনতে হতো।

আমাদের ছেলেবেলায় ধুতি আর শাড়িও কিন্তুক তাঁতিবাড়িতে কিনতে পাওয়া যেত। ই কথার মানে হচে, কম-বেশি জমি যার আছে তার সব আছে, তার আর কুনো ভাবনা নাই। সবরকম আনাজপাতি, চাল-গম-আটা, তেল-ডাল-গুড়, মিষ্টি-দুধ-দই-ছানা— কিছুর অভাব নাই। তবে গরিবের অভাব সব কালে। জমি-জিরেত না থাকলে উপোস না করে কি উপয়? তবে একটো কথা— না খাটতে পারলে তোমার শত জমিজমা থেকে কিন্তুক কিছু পাবে না। তা তুমি নিজেই খাটো কি মুনিষ-মাহিন্দার খাটাও।

বাপজি সব কাজ জানত। এমন কাজের লোক আমি জেবনে দেখি নাই। ই কি আচ্চয্যি— হ্যানো কুনো কাজ নাই যা বাপজি পারত না। চাষবাসের য্যাতো কাজ, জমি চষা, রোয়া, নিড়নো, ধান কাটা, গম কাটা, ঝাড়া, মরাই তৈরি করা, ইসব কাজ তো বটেই, জাল বোনা, মাছ ধরা, বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ— বিশ্বসোংসারের সব কাজ তার জানা ছিল। তা বলে সব কাজ কি নিজে নিজে করত, তা লয়। বরঞ্চ আয়েশিই ছিল খানিকটো। ডালপালায় বড় বংশ, আদ্দেকটো গাঁ-ই আমাদের জ্ঞাতিগুষ্টি ভাই-ভায়াদে ভরা। আর তেমনি দাপট। জমিসম্পত্তি বিস্তর। বড় বড় পুকুর, দিঘি ইসব ছিল। সব জমি চাষ হতো না, পড়ে থাকত। গরু-মোষ চরার লেগে জমি, ভাগাড়ের লেগে আলাদা জমি সব ছিল।

বাপজির ভাইদের সব আলেদা আলেদা সংসার, আলেদা আলেদা বাড়ি। দলিজ খামার সব আলেদা। ইয়াদের মধ্যে বাপজির বড় ভাই, আমাদের দেড়েল চাচার কুনো সংসার-ছেলেমেয়ে ছিল না। তার কি নোম্বা-চওড়া চেহারা! ভয়ে মুখের দিকে চাইতে পারতম না। মুখভর্তি

সফেদ পাকা দাড়ি নাভির নীচে এসে পড়ত আর তেমনি ঘের সেই দাড়ির। চোখ আর কপাল বাদ দিলে মুখের কুনো জায়গা বাদ ছিল না আর তেমনি ঘন নোম্বা গোঁফ। হাঁ-মুখটো দেখতেই পাওয়া যেত না। বাঘের মতুন গলার আওয়াজ। আমরা তো দূরের কথা, গাঁয়ের কুনো মানুষ তার ছামুতে দাঁড়াইতে পারত না। তা দেড়েল চাচাও কম কথার মানুষ, চিৎকার চ্যাঁচামেচি কুনোদিন করে নাই। বুজুর্গ মানুষ, কটো পুঁথিও লিকিনি লিখেছিল। তাকে আমরা দেড়েল চাচা বলতম ক্যানে? চাচা য্যাকন পেশাব করতে বসত, দাড়ি এসে পড়ত ভুঁয়ে। সেই লেগে দু-হাতে দাড়ি গোছ করে ধরে ডান বগলে ভরে তবে পেশাব করতে বসতে পারত।

দেড়েল চাচা কুনোদিন বাড়িতে ঢুকত না। বাড়ি থেকে খানিকটো দূরে মসিদ দিঘির দখিন পাড়ে আমাদের দলিজ ছিল। সেই দলিজেই থাকত চাচা। দলিজটো উত্তর-দক্ষিণে নোম্বা। মাটির দেয়াল আর টিনের চাল। তাতে তিনটো ঘর। দখিন দিকের ঘরটো এমনি পড়ে থাকত। বাকি ঘরটোয় মেহমান কিংবা বিদেশী কেউ এলে থাকত। আর উত্তর দিকের ঘরটোয় থাকত দেড়েল চাচা। একটো তক্তপোশে চাচার বিছেনা, বালিশ। এক পাশে কাঠের চৌপাইয়ের ওপর ফরসি হুঁকো। ইয়া নোম্বা তার নল। ভুরভুরে গন্ধঅয়লা অম্বুরি তামুক দিয়ে কল্কে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে সেই ফরসি দেওয়া হতো দেড়েল চাচার হাতে। দেড়েল চাচা রাত-দিন ভুরুক ভুরুক তামুক টানত, ম-ম গন্ধোয় ভরে যেত খানকা। খানকার বাঁ দিকে বেরাট মসিদ দিঘি, তার পচ্ছিম-পাড়ে ভাঙা কিন্তুক পাকা মসিদ। পুবদিকটো একদম খোলা। বাঁ দিকে খানিকটো দূরে খাঁ-দের খামারের ঘরদুয়োর খানিকটো দেখা যেত।

ঘরের ভেতর পুবমুখো বসে দেড়েল চাচা ফরসিতে তামুক টানছে। দোপরবেলায় দস্তরখানা কাঁধে ফেলে খাঞ্চা করে ভাত-তরকারি নিয়ে যেছে আবযশ চাকর। রেতে খাবার নিয়ে যেচে ঐ আবযশই। দিনে-রেতে আর কুনো লোকই চাচার কাছ ঘেঁসতে সাহস পেত না।

সি একটু কেমন বেপার না? আবার কথা শোনো। ক ক রোদে কাকপক্ষী নাই, গরম হাওয়ায় ধুলোয় দম আটকিয়ে যায়, এমন সোমায় কোন্ গাঁয়ের কোন্ বেল্লিক ছাতা মাথায় দিয়ে দলিজের ছামনে দিয়ে যেছে। দেড়েল চাচা শুদু হেঁকে উঠলে, কে? কে যায়? আবযশ, ধরে নিয়ে আয় তো! দেখি কোন্ লায়েক ছাতা মাথায় আমার খানকার সামনে দিয়ে যায়। বেয়াদপ!

আর বলতে হতো না, ছাতামাতা গুটিয়ে সি লোক তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করত। লোকে বলত, আমাদের দেড়েল চাচা কামেল মানুষ ছিল। কেউ বলত, দু-দুটো জিন তার ফরমাশ খাটত। আমরা সিসব জানি না। তার ছামনে পড়তম না কিছুতেই। দেড়েল চাচার মওত হলে ঐ দলিজের উত্তর দিকেই পুকুরের পাড়ে তার মাটি হয়েছিল। কেন যে গোরস্থানে হয় নাই তা আমরা কেউ জানি না।

যাকগো, ভাই-বেরাদরে বিরাট এই বংশ। কাউরির সাহস ছিল না একটো কথা বলে। কিন্তু বাপজি নিজে কাউরির সাথে মাখামাখি পছন্দ করত না। ভাই, চাচাতো ভাইদের সাথেও না। মা মরার পরে বিয়ে আবার করলে বটে তবে ঐ একলা স্বভাবটো ঠিকই রইল। বিয়ের কিছুদিন পর লতুন মায়ের প্যাটে আবার একটো ভাই হলো আমাদের। তারপরে হয়েছিল আরও তিন বুন। লতুন মায়ের মতুন ভালো মানুষ দুনিয়ায় দেখা যাবে না। সব দিকে নজর তার। তবে সবচাইতে বেশি নজর আমার আর আমার ছোট ভাইটোর দিকে, তার পরে তার নিজের ছেলেমেয়ে। কালোপানা মানুষটির চেহারা-ছবি যেন পটে আঁকা। আর কি যি তার হাতের গুণ! ঐ হাতের রাঁধা যে একবার খেয়েছে, সে কুনোদিন ভুলতে পারবে না। মাটির ঘরের দেয়াল কেমন করে যি লেপত, সি আর কেউ পারবে না। গরুর গাড়ি করে লাল মাটি আনিয়ে রাখত এরোলের মাঠ থেকে। সেই মাটি দিয়ে ছোট ছোট ম্যাঘের গায়ে ম্যাঘের মতুন দেয়াল লেপত। ঠিক যেন লাল কোদালে কুড়ুলে ম্যাঘের আসমান।

লতুন মায়ের খোঁকাটি জন্মানোর পরেই দু-কোশ দূরের আমার নানার বাড়ির গাঁ থেকে মামুরা এসে বললে, এক মেয়ে এক ছেলে রেখে আমাদের বুন মরতে না মরতে দামাদ-ভাই আবার বিয়ে করেছে সি ভালো কথা, লতুন খোঁকার জন্ম হয়েছে, সি-ও ভালো কথা, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নেকে নিয়ে যাব, তাকে মানুষ করব। ভাগ্নিটো এখানে থাক্। তার মানে হচে, আমার মায়ের প্যাটের ভাইটোকে মামুরা নিয়ে যাবে, আমি বাপের সোংসারেই থাকব। আমার দু-তিন মামু ত্যাকন বেঁচে, খালারাও আছে, নিজের নানা আর ত্যাকন বেঁচে নাই। তাদের আবস্তা তেমন ভালোও লয়, মন্দও লয়। বরং এট্টু গরিবই বটে। তবে নাম-করা বড় বংশ, চাষাভুষো লয়। নিজের হাতে চাষবাস কেউ করে না। কেউ পাঠশালে মাস্টার, কেউ মক্তবে ওস্তাদজি– বিদ্বেনবংশ আর কি! কেউ কেউ ছিল অকম্মা, ই গাঁ উ গাঁয়ের দিঘিতে মাছ ধরে বেড়াত সারা বছর, কেউ পুঁথি লিখত, কারুর শখ ছিল নানারকম তামুক খাবার। কতোরকম তামুক আর কতোরকম তার সরঞ্জাম, সি আর কি বলব! মেয়েদের তো রাঁধাবাড়া আর ছেলে মানুষ করা ছাড়া আর কুনো কাজ ছিল না। বিয়ে আবার সব ঘরে ঘরে– মেয়েরা কেউ বংশের বাইরে যায় না– বাইরের মেয়ে কেউ আসেও না তেমন। মোসলমান মিয়ে মোকাদিমদের মদ্যে এইরকমই চল ছিল। তা আমার ভাইটিকে নিয়ে যাবার পেস্তাব য্যাকন করলে, বাপজি একটো কথা বললে না। তার স্বভাবই ছিল ঐরকম। ছেলে নিয়ে যাবি যা। আমার সোংসারে মানুষ হবে না, খেতে পাবে না মনে করছিস, কর গা। এমন চাপা মানুষ, এ কথাগুনোও বললে না। শুদু বললে, আমার ইখানে কুনোদিন ভাতের অভাব হবে না। তবে সৎ-মায়ের কাছে ভাগ্নেকে রাখতে চাও না, আমি কিছু বলব না। যা করার তোমরাই করবে, ছেলের কাছ থেকে আমার কুনো পিত্যেশ নাই।

সত্যিই আমার কাঁকাল থেকে ভাইটিকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল মামুরা। বাপজি ঘর থেকে বেরুল না, লতুন মা নিজের কাঁচা ছেলেকে

কোলে নিয়ে ঝর ঝর করে চোখের পানি ফেললে।

ভাইকে নিয়ে মামুরা চলে গেল।

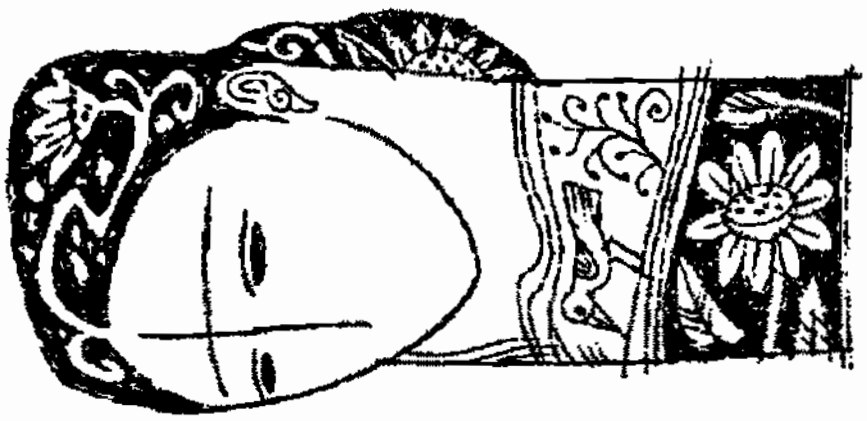

আমার বিয়ের ফুল ফুটল

দাদি ত্যাকন আর নাই। ভাইটিও কাছে নাই। লতুন মা-ই তার নিজের খোঁকাটিকে দেখে, আমাকে তেমন আর ওকে নিয়ে বেড়াতে হয় না। এই করতে করতে একদিন আমি হঠাৎ কেমন করে যি বড় হলোম, তা নিজেই জানতে পারি নাই। কবে একদিন ফালি ছেড়ে মোটা তাঁতের শাড়ি ধরেছি। তাঁতিবাড়ি থেকেই পাওয়া যেত ত্যাকনকার দিনে শাড়ি ধুতি। শাড়ি ধরার পর আর তেমন বাড়ির বাইরে যাই না।

পুকুর-ডোবা গাছপালা আর পাঁজর-বেরুনো মাটির বাড়ি দেখে বোঝা যেত আমাদের গাঁ-টো খুব পুরনো। পাকা সয়রান হয়েছিল এই সিদিন যুদ্ধর সোমায়। দিনে দুটো, সকালে একটো আর সাঁঝবেলায় একটো– এই দুটো মটরগাড়ি যেত ঐ পাকা রাস্তা দিয়ে। ই ছাড়া সারাদিন শুনশান– গাঁ-টোকে মনে হতো ই দুনিয়ার লয়। আমি তো চিনি গাঁ-টোকে! গেরস্ত বাড়ির ছামনে অত বড় পাকুড়গাছ, ই কি অলক্ষুনে লয়? পাকুড়গাছ থাকবে মাঠের মাঝখানে, নাহয় গাঁয়ের মাঝখানটোয়, যেখানে লোকজন এসে বসবে, তামুক খাবে– তা লয়– পাকুড়গাছ, মাহারুহ গাছ, বাড়ির এগ্‌নের ওপর। ই অলক্ষুনে লয়? কাকচিল তো বসছেই, শকুনিও এসে বসছে। মরা গরু-বাছুরের হাড়, বেড়াল-কুকুরের ছেঁড়া চামড়া এইসব পড়ছে বাড়ির এগ্‌নেয়। ভিন পাড়ায় যাবার সোমায়

বেলগাছের মাথায় দুটো শাকচুন্নিকে আমি অ্যানেকদিন দোপরবেলায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। কারুর বাড়ির মাছভাজা খাবার যুক্তি। ই গাঁয়ের বাতাসটোই এমনি। মাঠের বড় পুকুরটোর ধারে প্যাত্তা তো যে খুশি দেখতে পেত সাঁঝবেলাটা পার হলেই। লোকে ইসব জানত। তবে এদের ঘরের লোক বলেই মনে করত। লোকে যেন মনে করত মানুষ দুরকম— মরা মানুষ আর জ্যান্ত মানুষ। একসাথে তো থাকবেই। যেসব জ্যান্ত মানুষ ঘরে-বাইরে ঘুরে বেড়াইছে, তাদের মদ্যে দু-একটো মরা মানুষ যি নাই তা কে বলবে? চেনবার তো বাগ নাই। কি রূপ নিয়ে কার ভ্যাকে জ্যান্ত মানুষের সাথেই যি জিন-ভূত আছে তা কেউ বলতে পারবে না। আমার ছোট মামুর ঘরেই একটো জিন থাকত, তার কথা আমি নিজের কানে শুনেছি। সে ছিল ভালো জিন, বাড়িতে হঠাৎ মেহমান এলে সরু গলায় ক্যান ক্যান করে বলত, উসারায় তক্তপোশে মিষ্টি আছে দ্যাখো গা। বাড়িতে অমুক এয়েছে, মিষ্টি লাগবে না?

মিষ্টি লাগবে তো আপনি আনতে গেলেন কেন? মামু জিজ্ঞাসা করলে।

বাড়িতে মেহমান এলে মেহমানদারি করতে হয়, মেহমানের খেদমত করতে হয়।

তা তো হয়, তা আপনি কোথা থেকে কার মিষ্টি নিয়ে এলেন?

আমরা জিন, আমরা সব পারি।

কার না কার মিষ্টি এনেছেন, দাম দিয়েছেন?

আমাদের দাম দিতে হয় না।

মামু মক্তবের ওস্তাদজি, এট্টু রাগ করে বললে, আর কোনোদিন আনবেন না।

টিনের চালে ত্যাকন খুব শব্দ হতে লাগল, জিন-ও রেগেছে বুঝতে পারা গেল। তা সি যাকগো, লোকে জানে না, আমরা জানি যি রাতদোপর আর দিনদোপর একরকম, কুনো তফাত নাই। নিশুতি রাতদোপর যেমন ছমছম ছমছম করে, দিনদোপরও তেমনি। পেত্যয়

না হলে জষ্টি মাসের দোপরবেলায় ত্যাকনকার দিনের গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। দোপর ঠিক নিশুত রেতের মতুন। সারা গাঁ খাঁ খাঁ করছে, রাস্তায় একটি লোক নাই, কুনো পেরানির সাড়া-শব্দ নাই— গরুর গোয়ালের আঁদার মাচান থেকে উই যি গাওড়া খটাশটো রাস্তায় গরম ধুলোর ওপর দিয়ে বাপ বাপ বলে ডাকতে ডাকতে যেচে কে বলবে ওটো খটাশ লয় আর কিছু? আর ঐ যি গাঁয়ের ই কোণে উ কোণে একটো-দুটো পুরনো মাটির ঘর ছিল যিগুনোয় কুনো মানুষ বাস করত না, আলকাতরা মাখানো আমকাঠের দুয়োর শেকল-তালা দেওয়া থাকত, ঐ ঘরগুনো কি একদম ফাঁকা? দেয়ালঘেরা এগ্‌নে, ঘরের পিঁড়ে কি একদম শুন্যি? তা লয়, তা লয়। ঐসব ভিটে ঐসব ঘর ক্যানে ছেড়ে যেত লোকে? তা কেউ বলতে পারবে না।

আবার এই একই গাঁয়ে সকালে কিংবা বৈকালে যাও— কি সোন্দর! মানুষ যেচে-আসচে, কথা বলছে, ছেলে-পিলেরা খিলখিলিয়ে হাসছে, পাড়ার মেয়েগুনো অমনিই কুনো ভিটেতে ঝাল-ঝাপ্‌টি খেলছে— কোথা ভূত, কোথা জিন? কেউ কোথাও নাই। বিহানবেলায় কোদাল কাঁধে, গরু-মোষের লাঙল নিয়ে জোয়ান মরদ ছেলে-ছোকরারা মাঠে যেচে, ওস্তাদজি পোষ্কার একটো খাটো ধুতি পরে মোটা পাঞ্জাবি গায়ে পাঠশালে যেচে, কচি কচি ছেলেরাও যেচে পাঠশালে। কি সোন্দর! তাই বলছেলম একই গাঁ, তার কতোরকম রূপ।

আমি কিন্তুক একদিনও পাঠশালে যাই নাই। বাপজি যেতে দেয় নাই। মেয়ে আবার পাঠশালে যেয়ে ল্যাখাপড়া শিখে কি করবে? খানিকটো বেয়াদপ হবে, মুখের ওপর কথা বলবে— এই তো? এর লেগে পাঠশালে পড়ার কি দরকার? এইরকম দিন যি ছিল একদিন, অ্যাকন আর আমারও পেত্যয় হয় না। ত্যাকন লোকের কুনো নড়াচড়া ছিল না। কেউ কোথাও যেত না— সারা জেবন সবাই একসাথে থাকত। গাঁ থেকে এক কোশ দূরেও কেউ যেত না। মাঠের জমি, ধান, ফসল, আবাদ, পুকুর ঘুরে যে যেখানেই যাক, ঠিক সাঁঝের বেলায় ফিরে

আসবে– ইয়ার কিছুতেই বে-লিয়ম হবে না। ক্যানে যাবে মানুষ! হাটে যেতে হতে পারে কুনোদিন, গরুর গাড়িতে ধান বেচতে যেতে পারে গঞ্জে কিংবা মোকামে, নাহয় কুটুমবাড়ি যেত দু-চার গাঁ পেরিয়ে। ল্যাখাপড়া শিখে কি করবে গাঁয়ের মানুষ? বাপজি তাই মনে করত কার লেগে ল্যাখাপড়া রে বাপু!

তা পাঠশালে তো গ্যালম না, তাই বলে বয়েস কি বসে থাকবে? হঠাৎ একদিন শুনতে প্যালম আমার বিয়ের সম্বন্ধ এয়েছে। ত্যাকন আমার বয়েস চোদ্দ কি পনেরো। ত্যাকনকার দিনের হিসেবে অ্যানেক বয়েস। এই আমাদের বয়সের মেয়েদের কুনো একটা ভুল হয়ে গেলে মা-চাচিরা বলত, শরম লাগে না ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে? বিয়ে হলে এতদিনে যি দুই ছেলের মা হতিস। তাইলে, আমার বিয়ের সম্বন্ধ যি এল তা আর আচ্চয্যির কথা কি? সম্বন্ধ এল, কথাবাত্তা হতে লাগল কিন্তুক আমাকে কেউ একটো কথাও শুদুলে না। শুদুবেই বা ক্যানে? ই ব্যাপারে আমার তো কুনো কথা নাই। মুরব্বিরা যা করবে তা-ই হবে। তারা যেদি মনে করে একটো কলাগাছের সাথে আমার বিয়ে দেবে, আমাকে তাই মানতে হবে। এইরকমই ছিল ত্যাকনকার দিন। ছেলে হয়তো ত্যাতোটা লয়, মেয়ে হলো বাপের আঘিন্নে দায়। বাপ যেদি মনে করে মেয়েকে কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেবে, তাতে কারু কিছুই বলার নাই। সেই লেগে বলছি, মেয়ে ই কথা শুদুতেই পারবে না যি কার সাথে তার বিয়ে হচে। রূপ-গুণের কথা দূরে থাক, পাত্তরের বয়েসটোও শুদুতে পারবে না। বুড়ো হোক, ধুরো হোক, মেয়েকে মেনে নিতেই হবে। ষাট বছরের বুড়োর সাথে পনেরো বছরের মেয়ের বিয়ে ত্যাকনকার দিনে আকছার হতো। দোজবরে তেজবরে হেঁপোরুগি মাতাল চোয়ার কাউরির বিয়ে করার লেগে সোন্দর মেয়ের অভাব হতো না। সিদিক থেকে আমার তো মাহা কপালের জোর যি শোনলম, পাত্তরের বয়েস মাত্তর এক কুড়ি আট বছর। ইয়ার চেয়ে ভালো যোগ ত্যাকনকার দিনে আর কিছু ছিল না। হলোই বা আমার দ্বিগুণ বয়েস–

বিয়ে যে হচে এই পরম ভাগ্য! অ্যাকনকার দিনে ছেলে পেথম বিয়েই করছে দু-কুড়ি বছর বয়েসে। তাতে কুনো দোষ নাই।

শোনলম চার কোশ দূরের এক গাঁ থেকে সম্বন্ধ এয়েছে। একটু দূর হয়ে যেছে বটে তবে মটরে আর র‍্যালে খানিকটো রাস্তা যাওয়া যায়। শুকনো দ্যাশ তো, গরুর গাড়িতে মাঠে মাঠে একবেলার মদ্যেই যাওয়া যাবে। তা দূরেই হোক আর কাছেই হোক, ই সম্বন্ধ ছাড়া যাবে না। নামজাদা বেরাট বংশ, আবস্তাটো অ্যাকন একটু পড়ে এয়েছে বটে কিন্তুক ভাত-কাপড়ের অভাব কুনোদিন হবে না।

আমি শুদু এইটুকুই শোনলম। পাত্তর কেমন, কি করে ইসব কথা কেউ তুললেও না, আমিও আর কিছু জানতে প্যালম না। ত্যাকন কি আর জানি এমন সোয়ামি আমার কপালে ছিল! ছিপছিপে ছোটখাটো শামলা রঙের মানুষ, আসমানের বাজের মতুন শক্ত। তবু সে সোনার মানুষ। কিন্তুক আমার লেগে মুটেই লয়– আর সবার লেগে। মা-বাবা, ভাই-বুন, আত্মীয়স্বজনের লেগেই শুদু লয়, সারা দিগরের মানুষের লেগে। আমার কথা আর কি বলব? আমাকে সে সারা জেবন হেনস্তা করেছে, কতো কুবাক্যি বলেছে, হাত ধরে ঘর থেকে বার করে দিতে চেয়েছে, তবু আমি মনের ভেতরে ঠিকই জানি ভেতরে ভেতরে কি সনমান সে আমাকে দিয়ে গেয়েছে। কিন্তুক সে শুদু ভেতরে ভেতরে, নাইলে তামাম লোকের ভালো করবে, শুদু আমার দিকে চেয়ে দেখবে না।

বিয়ে হয়েছিল বৈকালি। সাঁজ রেতে একসাথ্ করা হলো। তা শেষ হতে না হতে লোকজন নিয়ে পালকি করে নিজের গাঁয়ে ফিরবে। একবার কি দুবার বলার পর আর কারুর সাধ্যি হলো না রাতটো থেকে যেতে বলতে। হাজার হলেও মাঠ ভেঙে পালকি নিয়ে এই এতটো পথ যেতে হবে। দিনকাল ভালো লয়, সঙ্গে সোনাদানা আছে, বেপদ হতে কতোক্ষণ? কুনো কথাই সে কানে তুললে না। সঙ্গে কজন লেঠেল আছে আর বাউরি কাহাররা তো সবাই লেঠেল। ভাবনা কিছু নাই। মিশমিশে

আঁদার রেতে মিশমিশে কালো চার মুশকো বাউরি কাহার বাতাসের বেগে পালকি নিয়ে ছুটল মাঠের ওপর দিয়ে। কাহারদের হাতে এই বড় বড় লাঠি— এক একজনা যমদূতের মতুন। কে তাদের ছামনে দাঁড়াবে? সঙ্গের বরযাত্রী লোক-লস্কর সেই আঁদারেই তাদের সাথে সাথে ছুটল। খালি একজনার হাতে একটো ডেল্লাইটের আলো।

লতুন মায়ের ত্যাকন আবার ছেলেপুলে হবে। এইটুকুনি মানুষ। তেমন লড়তে-চড়তে পারছে না। ইয়ার মদ্যে তার এক খোঁকা হয়েছে। লিয়ম মতুন লতুন মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলে। আমিও কাঁদলম। এইরকমই লিয়ম ছিল— গলা জড়িয়ে কাঁদতে হবে, নাইলে নিন্দে হবে। তবে কেউ কাঁদত লিয়ম মতুন, একটু হুঁ হুঁ করলে, ফোঁৎ ফোঁৎ করে মিছে নাক ঝাড়লে, আবার কারু কারু বুকের কবাট ফেটে যেত যেন। আমার ঠিক তা-ই হলো। এই মা, এই ভাই, এই বাড়ি-ঘর, ঘাট-পুকুর, এই আসমান-জমিন— সব ছেড়ে চেরকালের লেগে বিদেয় লিছি। কতো কথা মনে পড়ছে। কোথা থাকল মা, কোথা থাকল বাপ, কোথা থাকল ভাই! লতুন মা আওয়াজ করে কাঁদতেও পারলে না। পেটের ভারে সে ত্যাকন হাঁসফাঁস করছে। গড়গড়িয়ে চোখে পানির ধারা নামল।

বছরে দু-মাস করে আমার কাছে থাকবি। আমি নিয়ে আসব।

তা মনে হয় আমার বিয়ের পর থেকে শেষ ছেলেটো হওয়া পয্যন্ত এই লিয়মের তেমন লড়চড় হয় নাই। ঐ মা যি আমাকে আমার নিজের মায়ের শোক ভুলিয়ে দিয়েছিল!

ক-দণ্ডের মদ্যে সেই রেতে রেতেই কাহাররা বিয়ের পালকি পৌঁছে দিলে আমার শ্বশুরবাড়ি। আমি আমার জন্মস্থান থেকে চেরবিদায় লেলম।

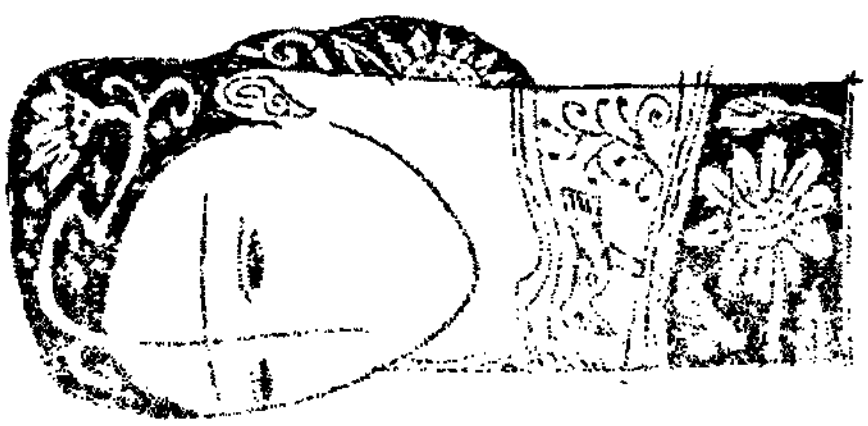

মাটির রাজবাড়িতে আমার আদর

বিহানবেলাতেই আবার বাউরি কাহাররা এল। পালকি সাজাতে লাগলে তারা। আমাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবে। সি আবার কি বেপার! কেউ কিছু বলে না আমাকে। লতুন বউ, শুদুবই ঝ্ কাকে? শ্যাষে কত্তা এসে ঘরে ঢুকে ঘাড়টো একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললে, রাজবাড়ি গাঁয়েই– বেশি দূরে নয়। এপাড়া থেকে ওপাড়া। কিন্তু গরুর গাড়িতে সেখানে গেলে মান থাকবে না। পালকিতেই যেতে হবে তোমাকে। গয়না যেখানে যা আছে সব পরো। বিয়ের লাল বেনারসিটা পরে নতুন বউ সেজেগুজে যেতে হবে, বুঝেছ? এরা রাজার আত্মীয়।

কত্তা ঐ বাড়িতে ছেলের মতুন। সেই লেগে নতুন বউ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হচে। এই আমি পেথম কত্তাকে কাছ থেকে ভালো করে দেখলম। কেমন পোষ্কার কথা! তেমন করে কথা আমি তো এ জেবনে আর কাউকে বলতে শোনলম না। আমাদের মতুন গেঁয়ো ঘড্ডে কথা কুনোদিন তার মুখে শুনি নাই। ইদিকে আবার সহজ মানুষ। হায়, ত্যাকন কি আর জানি, ঐ সহজ মানুষ কি কঠিন মানুষ।

পালকি তুললে কি হিঁদুপাড়ায় এক বাড়ির সিং-দরজায় নামালে। পালকিতে বসেই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলম দু-তিনটে বড় বড় বাঁধা ঘাটঅয়লা পুকুরের ঘাস-ঢাকা পাড় আর বড় বড় বিরিক্ষের পাশ দিয়ে লহমার মদ্যে পালকি এক বেরাট দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কত্তা কিন্তুক হেঁটেই একটু আগে সেখানে হাজির। আমি পালকির ভেতর থেকে চোখ তুলে যাকে দেখতে প্যালম, সাথে সাথে বুঝতে পারলম সে-ই হলো ই বাড়ির গিন্নি। খুব ফরশা মোটা মানুষ, বেশি নোম্বা লয়। বয়েস হয়েছে, সেই লেগে কোমর অ্যানেকটো পড়ে গেয়েছে। এই ভেরোলো মুখ, চাইতে ভয় লাগে। মাথায় ছোট ছোট শাদা চুল। মোটা কুঁজো মানুষ আবার বুড়ি! ইনি লিকিনি রাজার ভাগ্নি।

আগে কিছুই জানতম না, অ্যাকন জানলম, এই গাঁ-ই রাজার

শ্বশুরবাড়ি। হিঁদুদের মদ্যে রাজা লিকিনি জেতে তেমন উঁচু লয়। নিজের জেতের মদ্যে তেমন মেয়ে পেছিল না যি বিয়ে করে। শ্যাষে ই গাঁয়েই এক গরিব ঘরে নিজের জেতের একটো সুন্দরী কন্যে পেয়েছিল। তাকেই লিকিনি বিয়ে করে। আবার সেই লেগেই নিজের ভাগ্নির ই গাঁয়েই বিয়ে দেয়। তাইলে ই গাঁ হলো রাজার শ্বশুরবাড়ি। সেই লেগে ই গাঁয়ে আছে পাকা শিবতলা, সিখানে তিনটে পাকা মন্দির, আছে পাকা ইশকুল। এমন ইশকুল ইদিকে আর অ্যাকটোও নাই আর সেই ইশকুল চালানোর লেগে আছে বেরাট এক দিঘি আর বিস্তর জমিজোমা। গাঁয়ে আরও এক ঘর রাজার আত্মীয় আছে। বোধায় রাজার ভাই-ভায়াদদের কেউ। তারাই সব জমি-সম্পত্তি ভোগ করে, দেখাশোনা করে, ভাগ্নি তেমন কিছু পায় না। সেই ঘরের সাথে এই ভাগ্নি বাড়ির তেমন পোট নাই।

ইসব কথা পরে শুনেছি। ত্যাকন হাঁ করে তাকিয়ে থাকলম কত্তামার মুখের দিকে। মুখে কি এট্টুও হাসি আছে? শুদু বললে, এসো। তার সাথের ঝি-বউরা আমাকে পালকি থেকে নামিয়ে নিলে। কত্তামা মুখ ফিরিয়ে থপথপ করে হাঁটতে শুরু করলে আমরাও তার পেছু পেছু বাড়িতে ঢোকলম।

এই বিরাট এগ্নে! এগ্নে শুদ্ধু গোটা বাড়ি মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সব নিখুঁত ছিমছাম। এগ্নের ভেতরে ইদিকে-উদিকে জাম গাছ, পেয়ারা গাছ, আমড়া গাছ– তা-বাদে গ্যাঁদা, সন্ধ্যামণি, পাতরকুচি, তুলসী– এইসব গাছ। সারা উঠোনে ছেঁয়া। পরিপাটি করে এগ্নে লিকোনো, একটি শুকনো পাতা পড়ে নাই। এগ্নের উত্তর দিক ঘেঁসে দখিন-দুয়োরি মাটির দোতলা বড় কোঠাঘর। তার চাল খ্যাড়ের, কড়িবরগা শাল আর তাল-কাঁড়ির। দেখেশুনে মনে হয় এমন ঘর চেরকাল থাকবে। আরও সব রান্নাঘর, হেঁশেল, বৈঠকখানা– সবই মাটির বটে কিন্তুক মনে হচে সব লতুন, মনে হচে মাটির ঘরে বাস করবে বলেই সব মাটির করেছে, নাইলে পাকা বাড়ি করা এদের লেগে কিছুই লয়।

এগ্নে পেরিয়ে, দোতলা কোঠাঘরের চ্যাওড়া উসারা পেরিয়ে

অ্যাকটো ঠান্ডা আঁদার আঁদার ঘরে নিয়ে যেয়ে আমাকে অ্যাকটো কাঠের পিঁড়িতে বসাইলে। কত্তামার পরনে সরু পাড়ের শাদা মিহি ধুতি। বেধবা তো! গায়ে কিন্তুক বেলাউজ নাই। ত্যাকনকার দিনে গাঁয়ের বউ-ঝিরা বেলাউজ পরত না। কত্তামা এত বড় ঘরের বউ। ভেবেছেলম তার গায়ে কি বেলাউজ থাকবে না?

ঘরের কোণে একটো পেল্লায় কাঁঠালকাঠের দবজ চেয়ার পাতা ছিল। কত্তামা এসে সেই চেয়ারে বসলে। দেখলম, এনার পা দুটিও খালি। হ্যাঁ, মাহারানীর মতুন লাগছে বটে! ধবধবে শাদা মোটা মানুষ, চেয়ার জুড়ে বসেছে, কোথাও একটু ফাঁক নাই। সেই চেয়ারে বসে একজনা মাঝবয়েসি বউকে হাতের ইশারা করলে। বউটোর সিঁতিতে চ্যাওড়া করে সিঁদুর লেপা। ঘরের এক কোণে রাখা একটো গয়নার বাক্সো নিয়ে এসে বউটি আমার ছামনে রাখলে। কত্তামা ত্যাকন আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, বউমা, তোমার গায়ের গয়নাগুলি একটি একটি করে খোলো। আমার গয়না দিয়ে তোমাকে সাজিয়ে একবার নয়নভরে দেখি তো মা কেমন লাগে! এই কথার পরে সব ভুলে কত্তামার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আমি একটি একটি করে আমার গয়নাগুলিন খুলতে লাগলম। সব খোলা হয়ে গেলে কত্তামা আবার চোখের ইশারা করতে সেই মাঝবয়েসি বউটি কাঠের গয়নার বাক্সো খুলে একটি একটি গয়না বার করে আমাকে পরিয়ে দিতে লাগল। আঁদার-আঁদার ঘরে ঐসব খাঁটি সোনার ভারী গয়না ঝকমক করতে লাগল। কের্‌মে কের্‌মে কঙ্কণ, বাজু, কানপাশা, ফাঁদি নথ, টায়রা, গোট, ভারী বিছেহার সব আমাকে পরানো হলো। আরও গয়না ছিল, তবে সি আর পরানোর জায়গা নাই। কত্তামা বললে, বউমা, এখন আর এইসব গয়না খুলো না। ঐ বাক্সোয় আরও গয়না আছে, তোমার গয়নাও এখন ঐ বাক্সোয় থাকুক। যাবার সময় পালকিতে তুলে দেবে।

কত্তামার এই কথার পরে বউটি আবার আমার সব গয়না সেই

বাক্‌সোয় ভরে বাক্‌সোটা বন্ধ করে চাবি আমার ছামনে রেখে দিলে। কি বাহার সেই গয়নার বাক্‌সোর! তার সারা গায়ে হাতির দাঁতের কাজ, কেমন সব মনোহারী নকশা। আর চন্দনকাঠ দিয়ে তৈরি বলে সেই বাক্‌সো হাতে করলেই সুবাস। সেই গন্ধ সেই নকশা আর এই পিথিমিতে নাই। কুথাও কুনোদিন উ আর কেউ পাবে না।

গয়না পরা হয়ে গেলে শাদা পাথরের বড় এক থালায় নানারকম সন্দেশ-মিষ্টি সাজিয়ে আমার ছামনে রেখে দিলে। ই মিষ্টি গাঁ-ঘরে মেলার কুনো কথাই নাই, শহর থেকে আনাতে হয়েছে। তাপর পায়েস, ক্ষীর আরও কতো কি যি এল হিশেব নাই। কত্তামা শুদু বললে, বউমা, খাও।

অত মানুষের ছামনে একা কি কিছু খাওয়া যায়? কুনোমতে এক-আধটু খেয়ে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকলম।

সব শ্যাষে কত্তামা কষ্ট করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বউমা, মনে রেখো, তুমি আমার বড় ছেলের বউ। তোমার কিন্তু দেওর-ননদ আছে। তারা সব ছোট। তাদের যখন বিয়ে-থা হবে তখন আমি হয়তো থাকব না, তোমাকেই সব দেখেশুনে নিতে হবে।

কত্তামা-ও দেখলম গেঁয়োভাষায় কথা বলে না। আমি পালকিতে ওঠার পরে কত্তাকে নাম ধরে ডেকে বললে, বউমা আমার সোনার পিতিমে, খবরদার তাকে কোনোদিন কষ্ট দিবি না। তাতে তোর ভালো হবে না।

একটো মজার কথা বলি। এত যি কাণ্ড হলো, কত্তামা কিন্তুক একবারও আমার গায়ে হাত দিলে না, ছুঁলে না। জানা কথা, সব মিটে গেলে কত্তামা আর একবার গা ধুয়ে কাপড় বদলে তবে ঘরের কাজ করবে।

বড় সোংসারে থই মেলে না

লতুন বউ আমি এসে ওঠলম ডোবা থেকে দিঘিতে। বড় সোংসার, কিছুতেই থই মিলছে না। আমাদের বংশও বড় ছিল বটে, গাঁ-জোড়া বংশ। তবে সিসব আলেদা আলেদা ভাই-ভায়াদের সোংসার। আমাদের নিজেদের সোংসার ছোট, মা য্যাকন বেঁচে ত্যাকনো ছোট। তার মরার পরে কিছুদিন তো আরও ছোট। লতুন মা আসার পরে একে একে ভাইবুনগুলিন হতে হতে য্যাকন আমার বিয়ের সোমায় হলো, ত্যাকন সোংসার কতকটো বড় হয়েছে বটে, তা বলে ই বাড়ির মতুন লয়। কত্তারা পাঁচ ভাই। আমাকে নিয়ে বউ দুটো। মোটে বড় আর মেজ এই দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। আর আর ভাইয়ের ত্যাকনো বিয়ে হয় নাই। ছোট ভাইটি তো খুবই ছোট, আট-ল বছরের হবে। চার বুনের মধ্যে দুজনার বিয়ে হয়েছে। বড় বুনটি স্বামী-সোংসার নিয়ে গাঁয়েই থাকে। মেজজনার পোড়া কপাল। মাত্তর ল-বছর বয়েসে বেধবা হয়ে এই সোংসারেই ফিরে এসেছে। বাকি দুজনার অ্যাকনো বিয়ে হয় নাই। এত লোক সোংসারে, তবে সবার ওপরে আছে আমার শাশুড়ি। তার বয়েস হয়েছে বটে কিন্তুক ত্যাকনো খুব শক্ত। দু-চারটো চুল পেকেছে, দাঁত একটিও পড়ে নাই, গোটা সুপুরি চিবিয়ে খেতে পারে। শাশুড়ি ফিট শাদা, কত্তার মতুন শামলা লয়। বেধবা মানুষ, শাদা ধুতি পরনে, কপাল পয্যন্ত লাজ-কাড়া, ঠিক বউমানুষের মতুন। দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারলম এই শাশুড়ি-ই ই বাড়ির গিন্নি। তার পরের গিন্নি ঐ বেধবা ননদ। ল-বছরেই বেধবা হয়ে ভাইদের সোংসারে এয়েছে। ই বাড়ির লিয়ম ঠিক হিঁদুদের মতুন, বেধবার বিয়ে নাই ই বংশে। এই ননদ ত্যাকন ভরা যোবতী। আমার চেয়ে বড় বটে, তবে বেশি বড় লয়। বয়েসে চার-পাঁচ বছর বেশি হতে পারে।

আমি লতুন বউ হয়ে থাকলম আর কদিন? কানে তুলো পিঠে কুলো চোখে ঠুলি লাগিয়ে সোংসারের ঘানিতে জুতে গ্যালম দু-দিন

যেতে না যেতেই। তবে, এই এক সুবিদা, ই সোংসারে আমার দেখার কিছু নাই। বাড়ির গিন্নি আছে, সেই দেখবে। যা করবার সেই-ই করবে। বড় বউ আর আমি শুদু ঘুন্নিপাক খেলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই যি ঘানি টানতে লাগলম, সারা জেবন একবারও আর থামতে পারলম না। ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। শুদুই হুকুম তামিল করা। অ্যাকন মনে হয়, জেবনের কুনো কাজ নিজে নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছা কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই। আমি কি মানুষ, না মানুষের ছেঁয়া? তা-ও কি আমার নিজের ছেঁয়া?

তবে নিশ্চিন্তি বটে! কুনো কিছু তো নিজেকে ঠিক করতে হবে না– যা করবার, যা বলবার গিন্নি করবে, গিন্নি বলবে। আর সি কি যে-সে গিন্নি! ঐটুকুন মানুষ, শাদা শাড়িতে কপাল পয্যন্ত ঢাকা, শরীলের কোথাও এতটুকু ধুলোবালি লেগে নাই। এত পোষ্কার থাকে কেমন করে মানুষ তাই ভাবতম। মুখে একটি-দুটি কথা, ভালোবেসেও লয়, মন্দবেসেও লয়। আর না-পছন্দ কুনো কিছু করলে দু-একটি বাক্যি যা বলত তা যেন কল্‌জে ছ্যাঁদা করে দিত। এইটোতেই ভয় লাগত বেশি। তবে বিচের ছিল বটে। একটি অন্যায় কাজ লয়, অন্যায্য কথা লয়। কুনো কিছু নিয়ে দুই দুই করা লয়। একেবারে সুক্ষ্মু ষোলো আনা ন্যায্য বিচের। এমন না হলে কি অত বড় সোংসার থাকে? সেই লেগে বলি শাশুড়ি যেন ই জগতের লোক ছিল না।

ইদিকে সোংসারের কত্তা কিন্তুক মেজ জনা, আমার সোয়ামি। তার বড় ভাই, আমার ভাশুর, কত্তার চাইতে ক-বছরের বড় হলে কি হয়, সে ছিল খুব আলাভোলা মানুষ, নেতান্তই ভালো মানুষ। বিষয়-সম্পত্তির কুনো কিছুতেই তার আঠা ছিল না। জেবনের শ্যাষ দিন পয্যন্ত সে যেন কত্তার ছোটই থেকে গেল, কুনো দায়-দায়িত্ব নিলে না। ছোট ভাইকে যেন এট্টু ভয়ই করত মনে মনে। তার ছিল খাওয়ার শখ, জামা-কাপড়ের শখ। তবে সি আর কতোটুকুনি! ছেলেপুলে হলো না কুনোদিন, ভাইবুনদের ছেলেমেয়েরাই ছিল তার

সব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি ভালোই যি বাসত! বিশেষ আমার ছেলেমেয়েদের। পর পর দুই খোঁকার পরে আমার একটি খুঁকি হয়েছিল। সেই খুঁকি ছিল তার জান। বাড়িতে সে থাকতই না পেরায়। অ্যানেক দিন পরে পরে য্যাকনই বাড়ি আসত, সঙ্গে থাকত হাঁড়িভরা মিষ্টি। মিষ্টি ছাড়া বাড়ি ঢুকত না। হয়তো ব্যাবসার টাকা লষ্ট করে কিংবা টাকা ধার করে ছেলেমেয়েদের লেগে মিষ্টি, খ্যালনা এইসব আনত আর কত্তার কাছে মুখ শুনত এই লেগে। কত্তা বলত শুদু শুদু টাকা লষ্ট করবে কেন? কঠিন কঠিন কথা শুনে ভয় আর লজ্জা নিয়ে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকত ছোট ভাইয়ের ছামনে, যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছে। কিন্তুক ঐ পয্যন্তই। কথা এক কান দিয়ে শুনলে আর এক কান দিয়ে বার করে দিলে। বাড়িতে ঢুকলেই ছেলেপুলেরা কেউ ঘাড়ে, কেউ মাথায়। কেউ তো আর তাকে বড় চাচা বলত না, বলত বড় বাপ। সোংসারের সব দায় ঐ মেজ কত্তার হলেও আবার ইদিকে দ্যাখো তেমন দরকার পড়লে সে খবর দিয়ে বড় কত্তাকে বাড়িতে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করত অমুক কাজটো করবে কি না। বড় ভাই-ও তেমনি, তার শুদু একটি কথা, মন হলে করো গা, ভালো মনে হলে করো গা। আমাদের এমন অবাক লাগত! য্যাকন-ত্যাকন বড় ভাইকে এই বকা তো সেই বকা! আবার তেমন তেমন ব্যাপার হলে তার কাছেই হুকুম চাওয়া! কিন্তুক ইকথাও বলতে হবে, ছোটকে যি কতোটো সমীহ করতে হয়, যেদি ছোট তেমন সনমানের যুগ্যি হয়, তা-ও দেখেছি এই সোংসারে।

কত্তাকে ঐ বয়সে যি অতো দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তার কারণ হলো, আমার শ্বশুর আট-লটো ছেলেমেয়ে আর বেধবা স্ত্রী রেখে অল্প বয়সেই মারা যায়। কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়, শ্বশুর বোধায় খানিকটো আমার ভাশুরের মতুনই বিষয়-সম্পত্তি দেখে রাখবার মানুষ ছিল না। তবে সে আলাভোলা ছিল না। এলেকার হিঁদু-মোসলমান বড় বড় মানুষের সাথে তার ওঠাবসা ছিল। শখ-সাধও ছিল বোধায়

তেমনি। নিজের পালকি ছিল, ছয় বেহারার পালকি। সেই পালকিটি দলিজঘরের বারেন্দায় ভেঙেচুরে পড়ে ছিল অ্যানেকদিন। তা বাদে নিজের আরবি ঘোড়া ছিল তো বটেই। ঘোড়ায় চড়ে ইগাঁয়ে উগাঁয়ে বড় বড় লোকের বাড়িতে যেমন যেত, তেমনি তারাও সবাই ই বাড়িতে আসত। শাশুড়ির ঠেঁয়ে শুনেছি মানুষজনের আসা যাওয়ার কামাই ছিল না। কোর্মা পোলাও দই মিষ্টি দেদার খরচ হতো। এমনি করে করেই জমি সম্পত্তি কতক বিক্রি হলো, কতক বেহাত হলো। শ্বশুর য্যাকন মারা যায়, ত্যাকন লিকিনি সোংসারের বেহাল আবস্তা। শাশুড়ি বলত, সোংসার য্যাকন ভেসে যায়-যায় হয়েছে ত্যাকন তার এই মেজ ছেলেই এগিয়ে এসে হাল ধরলে। তা নাইলে সব যেত। কত্তার ত্যাকন কতোই বা বয়েস, বিশ বছর হয়েছে কি হয় নাই। সে সব আমোদ-আল্লাদ বাদ দিয়ে ভাইবুনগুলিন আর মাকে নিয়ে জান-পরান দিয়ে এই সোংসারটোকে রক্ষা করলে। ই সোংসারে এসে তাই দেখলম বটে। সোংসারের ভেতরে যা করবে সব মা। মা ছাড়া কথা নাই। নিজের ইস্ত্রী তো বটেই পরে পরে যিসব ভাইয়ের বিয়ে হলো তাদের পেত্যেকের বউকে চোখকান বুজে শাশুড়ির কথা মেনে চলতে হবে। শাশুড়িকে একটি কথা ঝাঁঝিয়ে বলেছে কিম্বা কাজ করতে করতে ঘটি-বাসন মাটিতে একটু ঠুকে আওয়াজ করেছে, আর রক্ষা নাই। কত্তা সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে বলবে, যে এরকম করলে সে আর একবার যদি এমন করে, তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। তা কত্তাকে লাগত না, আমার শাশুড়ির শাসনই য্যাথেষ্ট ছিল।

বউ হয়ে আসার পর থেকে অবশ্যি দেখছি সোংসার অ্যানেকটোই ঠাউরেছে। শ্বশুরের মিত্যুর পরে সাত-আট বছর কত্তাকে কেউ বিয়ের কথা বলতে সাওস পায় নাই। আমার শাশুড়ি-ও লয়। সেই লেগেই এত দেরিতে বিয়ে। সোংসারে ঢুকে দেখলম ত্যাকন একমাত্তর সেজ জনার বিয়ের বয়েস হয়েছে, বাকি ভাইবুনরা সব ছোট। বেধবা বুনটোর পরে তার আর দুই ছোট বুনের বিয়ের বয়েস হব-হব। কিন্তুক

কি কপাল, এই সোমায় ঠিক ছোটর বড় যেটি সেই বুনটি মারা গেল। কি অসুখ কে বলবে? মাস দুই-তিন কিছুই পেরায় খেলে না। খাবার দেখলেই বলত অরুচি লাগছে। এই করে শুকিয়ে শুকিয়ে লেয়ালির দড়ি হয়ে গেল। কাটি কাটি হাত পা। তাপর একদিন আমাদের সকলের চোখের ছামনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে। আহা, কতোই বা বয়েস, সারাটা জেবন তার ছামনে, সোয়ামি সোংসার সন্তান কিছুই জানলে না, অকালে মা ভাই বুন সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল। ত্যাকনকার দিনে মরে যাওয়াটো যেন কিছুই লয় এমনি ভাব ছিল মানুষের। দু-চার দিন কেঁদেকেটে সব ভুলে যেত। ডাক্তারবদ্যি তো তেমন ছিল না। যা বা ছিল শহরগঞ্জে, পাড়াগাঁয়ে তার কিছুই মিলত না। কঠিন অসুখ হলে যার অসুখ সে যেমন, তেমনি তার সোদররাও সব আশা ছেড়ে দিয়ে মিত্যুর লেগে ঠায় অপেক্ষা করত। কলেরা আর বসন্ত ই দুটো মাহামারীতে বছরে কতো লোক যি মরত তার আর সুমার নাই। অত কাঁদবে কে? কেঁদে কুনো লাভ নাই। যি কাঁদছে সে-ই দুদিন বাদে মরবে কি না কে বলবে? কলেরা-বসন্ত বাদ দিয়ে আর একটো অসুখ ছিল– বুকের ব্যায়রাম, যক্ষ্মা। উ রোগ হলে চিকিচ্ছের চেষ্টাও ছেড়ে দিত মানুষ। এক-একটো বংশ নিব্বংশ হয়ে যেত ই রোগে। যার হয়েছে ই রোগ, সে হয়তো হা হা করে হাসছে, যা মন চায় তাই খেছে, তাপর একদিন ঠুকুস করে মরে গেল। মানুষ যি জান ভরে কাঁদবে তা কি করতে কাঁদবে? দুদিন বাদে সে-ও যে ঠুকুস করে মরবে!

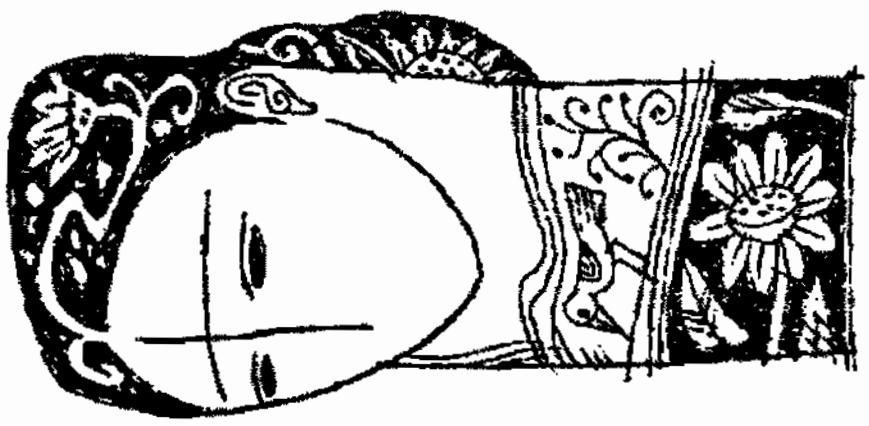

আমার একটি খোঁকা হলো

বিয়ের এক বছরের মাথায় আমার একটি খোঁকা হলো। সি দিনই লিকিনি দোপরবেলায় এক কড়াই দুধ উথুলে পড়ে গেয়েছিল। গাই দুয়ে এনে জ্বাল দেবার লেগে দুধ চুলোয় বসিয়েছিল। কেউ আর খেয়াল করে নাই, আঁতুড়ঘরে আমাকে আর লতুন খোঁকাকে নিয়েই সবাই বেস্ত ছিল। এই ফাঁকে সেই উজ্জ্বলন্ত দুধ সব উথুলে উঠে কড়াই থেকে পড়ে গেল। তাই দেখে আমাদের বুবু, সেই বেধবা ননদ হায় হায় করে উঠলে শাশুড়ি শুদু বললে, দুধ নষ্ট হয়েছে হয়েছে। কেউ কোনো কথা বোলো না। বাড়িতে নতুন মানুষ এল– এ সোংসারের পেথম খোঁকা– আর দুধ উথুলে পড়ে গেল! এ বড্ড সুখের কথা। এবার সোংসারে ধন-দৌলত, সুখ আনন্দও উথুলে পড়বে। তোমরা কেউ এই নিয়ে আর কথা বোলো না।

তা কথা সত্যি বটে– বংশের পেথম ছেলে– লতুন ঝাড়ের গোড়াপত্তন। পেথম ছেলে পেথম লাতিন। আনন্দে সবাই ভাসতে লাগল। ই ছেলে যেন একা আমার ছেলে লয়। কত্তা ত মনেই করলে না যি তার ছেলে হয়েছে। উ ছেলে তো সবারই, ই বংশের ছেলে। মা বলে আমার খাতির বাড়ল, শাশুড়ি আড়লে আবডালে সবার কাছে বলতে লাগল, ঐ মেজবউ সোংসারের লক্ষ্মী, ঐ বউটি আসা থেকে সোংসারের বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। খুব পয়া আমাদের বউ। তা আমার খাতির আর আদর বাড়ল বটে, তা বলে খোঁকাকে একা আগুলে রাখতে পারলম না। সে হলো সবার চোখের মণি। ঘুরেফিরে সবাই এসে খালি তাকে দেখতে চায়। খোঁকাটি আমার শামলা, বাপের রঙ পেয়েছিল, ছেয়ালো ছেয়ালো হাত-পা, ডাগর ডাগর চোখ, ফুলের পাপড়ির মতুন ঠোঁট। সি যি কি সোন্দর! এমন ছেলের মুখ একবার দেখতে পেলে মায়ের এক লাখ বছর দুনিয়ায় বাঁচা হয়ে যায়। সবাই বলতে লাগল আসমান থেকে এক ফালি চাঁদ নেমে এয়েছে আমার

কোলে। বড়ও হতে লাগল চাঁদের মতুন। আজ একটু, কাল একটু। আজ এট্টু আলো দেখি মুখে, কাল দেখি চোখে।

দিন যায়, দিনের পর দিন যায়, দিন গড়িয়ে মাস যায়, মাস গড়িয়ে বছর যায়। সোংসার কের্‌মে কের্‌মে বড় হতে লাগল। সেজ দ্যাওরের বিয়ে হয়ে গেল। বাড়িতে লতুন বউ এল। তাপর একদিন শ্যাষ ননদটিরও বিয়ে হলো মাহা ধুমধাম করে। বিয়ে হলো দশ কোশ দূরের এক গাঁয়ে। সি ঘরও খুব আবস্তাপন্ন।

দু-একটো কষ্টের কথা সব মানুষেরই থাকে। আমারও কি ছিল না? ছিল বৈকি? পিতিকার হোক আর না হোক বলতে পারলে তো মনটা এট্টু খোলসা হয়। তা কাকে বলব? ইসব কথা তো শাশুড়ি-ননদকে বলার লয়। হয়তো তাদের নিয়েই কথা, তাদের বলব কি করে? এক কত্তাকে বলা যায়। তা সে এমন লোক যি ছামনে দাঁড়ালেই মনে হয় ই লোককে ইসব কথা বলা যায় না। মনে হয়, আমার আবার আলাদা কথা কি, নিজের লেগে ইয়াকে আবার কি বলব? সারা দিনে তাকে দেখতেই প্যাতম না। দেখা হতো শুদু অ্যানেক রেতে। শাশুড়ি য্যাতোকাল ছিল আমি ছেলম ঠিক যেন লতুন বউ। এতগুলিন ছেলের মা হয়েও লতুন বউ।

তা আমি আমার কথা বলব কি, একদিন রেতে কত্তা হঠাৎ বললে, একটা কথা বলি শোনো। ছোটবেলায় পাঠশালায় যাও নাই যাও নাই। তা বলে কি চিরকাল মূর্খ হয়ে থাকবে? একটু লেখাপড়া শেখা কি খারাপ?

কথা শুনে আমি তো সাত হাত পানিতে, ই আবার কি কথা! অ্যাকন আবার আমি কি ল্যাখাপড়া শিখব?

লেখাপড়া শেখার কোনো বয়েস নাই। একটু পড়তে লিখতে শিখলেই বুঝতে পারবে দুনিয়া কেমন করে চলছে।

তা জেনে আমার কি হবে? সোংসারে খাটতে খাটতে জান গেল। জানি, এই করেই জেবন যাবে। এই বয়েসে আমি কি আবার বি.এ.

এম.এ. পাশ দোব?

লেখাপড়া শিখতে গেলে বি.এ. এম.এ. পাশ দিতে হয় না। যাই হোক, আমি বই কিনে আনব, দেখবে কদিনের মধ্যেই অক্ষর শিখে যাবে।

উ অ্যাকন আর আমি পারব না।

পারতে তোমাকে হবেই।

কত্তার মুখ দেখে বুঝতে পারলম, উ মানুষ যা করবে ঠিক করে, তা নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে না, ভেতরে ভেতরেই ঠিক করে। আমি চুপ করে থাকলম। একটু বাদে কত্তা আস্তে আস্তে শ্যায কথাটো বললে, আলো আর আঁধারের যে তফাত— অক্ষর জানা আর না-জানা মানুষের মধ্যে ঠিক সেই তফাত।

কি আতান্তরে যি পড়লম! কত্তা আমাকে কি বেপদের মদ্যে ফেললে! কিন্তুক সি মানুষকে যে চেনে নাই, সে চেনে নাই। একদিন ঠিকই আনলে বিদ্যেসাগরের বন্নপরিচয়ের পেথম ভাগ, একটো সেলেট আর পেনসিল। কত্তা এট্টুন শৌখিন ছিল, সারা বাড়িতে রেতে জ্বলত পিদিম আর লন্ঠন, কত্তার ঘরে জ্বলত একটো হেরিকেন। হেরিকেনের ত্যাকন অ্যানেক দাম। কত্তার ঘরে ছিল একটো বিদ্যাশি দামি হেরিকেন। কেউ জানতে পারলে না, অ্যানেক রেতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ঘরের দরজা বন্ধ করে সেই হেরিকেনের আলোয় ল্যাখাপড়া শেখাতে লাগলে আমাকে। সারাদিনের খাটা-খাটনির পরে চোখ জড়িয়ে আসত ঘুমে, কিছুতেই জেগে থাকতে পারতম না। কিন্তুক কত্তার কুনো মায়া নাই, সি কি তার তর্জন-গর্জন! শোয়া-ছেলে তিকুরে তিকুরে উঠত।

খোঁকা যি জেগে উঠবে?

তা উঠুক। মাথায় কি আছে কি তোমার! অক্ষরটা কি চোখে দেখতেও পাচ্ছ না? পেনসিল হাতে বসে আছ, হাত কি ঘুরছে না স্লেটের ওপর?

কি জানি মাথা কেমন গোলমাল লাগছে।

বুঝতে পারছি, ঘুম আসছে। যাও, ওঠো, চোখে পানি দিয়ে এসো, নাহলে চোখে দু-ফোঁটা রেড়ির তেল দাও, ঘুম চলে যাবে।

বললে কেউ পেত্যয় যাবে না, ইকটু ইদিক-উদিক হলে মায়া-দয়া তো করতই না, বোকা গাধা মাথায়-গোবর ইসব বলে গাল তো দিতই, চুলের গোছ ধরে টান, কানের লতিতে একটা মোচড়, ইসবও ছিল। একদিন তো গালে ঠোনা মেরে হাত ধরে টেনে তুললে। সি কি রাগ বাপরে বাপ, যাও বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, কখনো আসবে না এদিকে। একটা সামান্য কথা মাথায় ঢুকছে না তখন থেকে! যাও, বেরিয়ে যাও, দরকার নাই লেখাপড়ার।

কি আর করি, ঘর থেকে বেরিয়ে যেয়ে দুয়োরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলম। খানিক বাদে নিজেই আবার এসে ঘরে নিয়ে যেয়ে বললে, যাও, শুয়ে পড়ো, আজ আর পড়তে হবে না।

হুঁ, এমনি করে আমি পড়তে শিখেছেলম। বিদ্যেসাগরের অ আ ক খ বইয়ের পিতিটি অক্ষর আমার চোখের পানিতে ভেজা বলে চোখ বুজলেই সেইসব অক্ষর দেখতে পাই। কালো কালো যত ছবি ছিল বইয়ে সব মনে পড়ে। অ্যাকনো সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটো হু হু করে। দু-মাসের মাথায় পড়তে লিখতে শেখা হয়ে গেল। পেথম পেথম বানান করে করে, পরে এমনিতে সব পড়তে পারতম। বাড়িতে 'বঙ্গবাসী' বলে একটো কাগজ আসত পোস্টাপিস থেকে। ভালো বুঝতে না পারলেও সেটো কখনো-সখনো পড়তম। কিন্তুক সবই লুকিয়ে লুকিয়ে। বাড়ির কেউ কিছু জানত না। কত্তা কিন্তুক কিছু বারণ করে নাই। তবে ননদ-শাশুড়িকে ইসব বলতে আমারই কেমন শরম লাগত।

আমাদের সোংসারের লেগে সেই সোমায়টো ছিল উঠতির সোমায়। সব সোংসারে এমন হয়। একটো উঠতির সোমায় আর একটো পড়তির সোমায়। শ্বশুরের মিত্যুর পর সোংসারে খারাপ দিন এয়েছিল। শ্বশুর

গত হবার সাথে সাথে ভাই ভায়াদেরা সব সোংসার আলেদা করে নিলে। সবাই ভিনো হয়ে গেল। ঐ যি শ্বশুর অ্যানেক বিষয়সম্পত্তি লষ্ট করে ফেলেছিল, সেই লেগে সম্পত্তি ভাগ হবার সোমায়ে ভাইয়েরা নিজের নিজের সম্পত্তি পুষিয়ে নিলে। আমার বেধবা শাশুড়ির ভাগে পড়ল খুবই কম জমি। কিন্তুক তার ভাগে পড়েছিল সব ধনের সেরা ধন– এক পুত্তুর। সিরকম ধন থাকতে আবার ভাবনা! শুদু একটো ভয়, ইরকম ধন কারুর একার লয়, এমনকি শুদু একটো সোংসারেরও লয়। মায়ের তেমন পুত্তুর গোটা চাকলার। আমার শাশুড়ি সি কথাটো বুঝেই তবে দুনিয়া থেকে গেয়েছে।

কেমন করে সোংসারের উন্নতি-বরকতের অরম্বটো হলো সি কথাটা ইবার বলছি। আমার বিয়ের সোমায় বাপজি গয়না-গাঁটি যা দেবার তা দিয়েছিল। ত্যাকুনি জানা গেয়েছিল আমার সেই দাদি– বাপজির খালা– মরবার আগে আমার নামে তার সব জমি– ষোলে বিঘে জমি– লিখে দিয়ে গেয়েছিল। দাদির তিন কুলে কেউ ছিল ন সি কথা আগে বলেছি, সেই লেগে সম্পত্তিটো নিয়ে কুনে হ্যাঙ্গামা-ফৈজত হয় নাই। বিয়ের পরে-পরেই ঐ সম্পত্তিটো বিক্রি করে দিয়ে কত্তা নিজেদের গাঁয়ের মাঠে পঁচিশ বিঘে জমি কিনলে। আমার নামে কিনেছিল, না সোংসারের সাজার করে দিয়েছিল ঐ জমি, আমি আজও জানি না। সবই তো শাশুড়ির সোংসারের– আমার তোমার কি? এই ছিল শিক্ষে। গোড়াতেই জেনে গেয়েছেলম কত্তার ছামনে কুনো জিনিস নিয়ে আমার আমার করা যাবে না। একবার কি একটো নিয়ে এইরকম আমার আমার করে কথা বলতে যে দেখেছেলম, কত্তা একদিষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। মনে হলো, ই মানুষ আমাকে চেনে না, এখুনি হাত ধরে ঘর থেকে বার করে দেবে। সেই আমার চেরকালের লেগে শিক্ষে হয়ে গেল।

বারে বারে কত্তা কত্তা করছি, তা বলে কেউ যেন না মনে করে যি কত্তা বি.এ. এম.এ. পাশ দিয়েছিল। আমার শ্বশুর লিকিনি খুব

ল্যাখাপড়া-জানা আলেম মানুষ ছিল। কিন্তুক কত্তা কোথা থেকে কি শিখেছিল আমি জানি না। আমাকে কুনোদিন বলে নাই। ক-বছর লিকিনি বাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেয়েছিল, নদী পেরিয়ে পুবের কুন গাঁয়ে কুন এক পীরবাবার কাছে ফারসি পড়ত। এই গপ্পো অ্যানেকবার শুনেছি। তবে সিসব ডানপিটেমির গপ্পো, ল্যাখাপড়ার কথা লয়। যা-ই হোক, আমার খালি মনে হতো, এই মানুষ জানে না এমন কিছু কি ভূভারতে আছে? এই সোমায় সে গাঁয়ের ইশকুলে ছেলে পড়াইত। সেটো চাকরি ছিল কি না জানি না, পড়াইত এই জানি আর কত্তামার ছোট ছোট ছেলেদুটিকে লিয়ম ধরে পড়তে বসাইত।

একদিন দেখি বাড়ির ভেতরে এসে মায়ের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলচে। এমনিতে কিছুতেই বাড়ির ভেতরে ঢুকত না, থাকত তো বাইরের একটো ঘরে। বাড়ির ভেতরে এলে বুঝতে হতো গুরুতর কুনো কথা আছে। তা মায়ের সাথে কথা বলচে, আমাদের কারুর কাছে যাবার হুকুম নাই। দূর থেকে দেখছি, ছেলে কিসব বলচে আর মা খালি ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলচে, না বাবা, তা হয় না। তা কোরো না। কি যি কথা হলো কিছুই বোঝলম না। বোঝলম রেতে। হেঁশেলের কাজকম্ম সেরে শেকল তুলে বাইরের ঘরে য্যাকন অ্যালম, কত্তা দেখলম ত্যাকনো বিছেনায় শোয় নাই। বসে আছে। খোঁকা তার বিছেনায় অসানে ঘুমুইছে। খুব ঘেমেছে দেখছি গলার কাছটোয় ভিজে গেয়েছে। ঠান্ডা লাগবে না কি হবে– আঁচল দিয়ে ঘামটো মুছিয়ে দিচি ত্যাকন কত্তা বললে, শোনো, কথা আছে। গলার স্বর খুব মোলায়েম। কথা কত্তা এমন করে তো বলে না। এট্টু অবাক হয়ে কাছে যেয়ে বসলম। কত্তা বললে, জীবনে সুযোগ দুর্যোগ দুই-ই আছে। সব সময় সুযোগ আসে না, আর সুযোগ আসে যেমন আচমকা, তেমনি চলেও যায় আচমকা। তা একটা সুযোগ এসেছে। পঁচিশ-তিরিশ বিঘে জমি একলাটে আছে। কদিন বাদে সেটা নিলাম হবে। রায়েদের জমি।

রায়েরা আবার কারা?

রায়েরা এ গাঁয়ের জমিদার। ওদের রবরবা আমাদের ছেলেবেলায় একআধটু দেখেছি, তবে আমাদের বাপচাচারা আরও ভালো জানত। এখন অবস্থা খুব পড়ে এসেছে। খেতে জোটে না। তাদেরই পঁচিশ-তিরিশ বিঘে জমি নিলাম হবে— ন-কড়ায় ছ-কড়ায় বিকিয়ে যাবে।

তা উ নিয়ে আমাদের কি ভাবনা? আমরা কি উদের কুনো উবগারে লাগব?

কথা শোনো, আমাদের এত বড় সোংসার, টেনে চলা খুব কঠিন। বাপজি তো সব প্রায় শেষ করে দিয়ে চলে গিয়েছে। নিলামটা ধরতে পারলে কাজ হয়। রায়েদের জন্যে খারাপ লাগছে খুব, হাতি খাদে পড়েছে। মানুষের দুর্দিনের সুযোগ নিতে নাই আমি জানি কিন্তু রায়েরা কিছুতেই এ জমি রক্ষা করতে পারবে না। আমি না নিলে আর কেউ নেবে।

কথা কটি বলে কত্তা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে। আমি তো অবাক— জমি নিতে হলে নাও গা— আমাকে শুদুবার কি আছে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললম, ই তো খুব ভালো কথা, নিলেম ডেকে নিতে পারলে সোংসারের লেগে খুব ভালো হয়। আমাকে আবার ই কথা শুদুইছ ক্যানে?

নিলাম তো আর খালি হাতে ডাকা যায় না? টাকা লাগবে না? অত টাকা কোথা থেকে পাব? কাঁচা টাকা আমার হাতে নাই। সংসারে কারও কাছে একটি পয়সা নাই। পয়সাকড়ি যা থাকে আমার কাছেই থাকে। খোরাকির বাইরে ধান যা আছে তা বিক্রি করে আর কতো টাকা পাওয়া যাবে? বলে কত্তা আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলে। আমি ফের অবাক, টাকাপয়সার কথা আমার কাছে ক্যানে? উ বিষয়ে তো আমি কিছুই জানি না। আমিও কত্তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলম।

টাকার কথা আমি কি বলব?

আমার এই কথার পরে কত্তা এতক্ষণ বাদে আসল কথাটি বললে,

দ্যাখো, গয়না তুমি অনেক পেয়েছ, বাপের বাড়ি থেকে পেয়েছ, কত্তামার কাছ থেকেও পেয়েছ। কি হবে গয়না নিয়ে? কবার পরবে ঐ ভারী গয়না? একটু বয়েস হলে হয়তো আর কোনোদিন পরবে না। ঐ ওজনের লোহা বাড়িতে লুকিয়ে রেখে দিয়ে ভাবলেই হলো গয়না সবই আছে? একই কথা হলো না?

কথা শুনে আমি বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে আছি।

দু-একটা পরার মতো গয়না রেখে দিয়ে সংসারের এমন একটা কাজে বাকি গয়নাগুলো দিয়ে দিলে কি হবে তোমার? সবাই জানবে সংসার গড়ে তুলতে কোন্ এক পরের বাড়ির মেয়ে এই মেজ বউ-ই এত বড় কাজ করেছে!

কত্তার কথা শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এল। এত নিষ্ঠুর, হায়রে এত কঠিন জান আমার সোয়ামির? কলজেটা ছিঁড়ে নিলেও তো এত কষ্ট হতো না। মেয়েমানুষের গয়না ছাড়া আর কি আছে! স্বামী চলে গেলেও গয়না থাকবে। আমার সেই গয়না অ্যাকন সব কেড়ে নেবে? চোখ-ভরা পানি নিয়ে কত্তার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে গ্যালম, ঝাপসায় কিছুই দেখতে প্যালম না। তবে আমি এই ভবসংসারে কার ঠেঁয়ে যেয়ে দাঁড়াব? শুনতে প্যালম কত্তা বলছে, কেঁদো না। তুমি না দিলে গয়না আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব না। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি মেয়েমানুষের কাছে গয়না কি! সন্তান গেলেও তারা গয়না ছাড়বে না।

কত্তার এই শেষ কথাটো যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে আমার কলজেটো পুড়িয়ে দিলে। ই কি কথা, ই কি কথা, হায় হায়! চোখের পানি ত্যাকন ত্যাকনই শুকিয়ে গেল। একবার ঘুমনো ছেলের দিকে তাকালম, বালাইষাট, আমি হাজারবার লাখবার মরি তোর জানের লেগে! একবার কত্তার দিকে তাকালম। হেরিকেনের আলোয় অ্যাকন তার মুখটো দেখতে পেছি। দেখি কি, সি মুখে এট্টুও রাগরোষ নাই। আমার দিকে চেয়ে রয়েছে যে চোখদুটি তাতে কি যে ভরসা! তাই

বটে, তাই বটে, মেয়েমানুষ এইরকমই বটে, নিরুপায়। আমি বললম, গয়না সব নিয়ে যাও। আমি মন খোলসা করে বলছি একটি গয়নাও আমি রাখতে চাই না।

না না, মোটা কঙ্কণ দুটো রেখে দাও। নিজে না পরো, ছেলের যখন বউ হবে; তাকে দিয়ে দিয়ো।

সেই রেতেই একটি একটি করে সমস্ত গয়নাগাঁটি পুঁটলিতে বেঁধে কত্তার হাতে তুলে দেলম। কদিন বাদেই জানতে পারলম, রায়েদের কাছ থেকে তিরিশ বিঘে জমি নিলেমে কেনা হয়েছে। কত্তা টাকা কি করে জোগাড় করেছিল সি আমি জানি না– গয়না বিক্রি করেছিল, না বন্দক রেখেছিল তা আর কুনোদিন শুদুই নাই তাকে। এমন মানুষ, যিদিন নিলেমে জমি পাওয়া গেল, সিদিন বাড়িতে ঢুকে পেথম মাকেই ডেকে বললে, মা, সংসারের আরও তিরিশ বিঘে জমি হলো।

এই পেথম দেখলম আমার শাশুড়ি এগিয়ে যেয়ে ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বললে, চিরজীবী হও বাবা, আল্লা তোমার হায়াত দরাজ করুক। এই বলে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে। অথচ রেতে য্যাকন ঘরে গ্যালম কত্তা শুধু বললে, শুনেছ তো, নিলাম ডাকা হয়ে গিয়েছে?

হিসেব করে ত্যাকন দেখলম দাদির ঠেঁয়ে পাওয়া আমার ষোলো বিঘে জমি, শ্বশুরের জমি, আর এই নিলেমের জমি একঠাঁই করলে পেরায় আশি-নব্বুই বিঘে জমি সোংসারের হয়েছে। গাঁয়ে এত জমি আর কারও নাই। সবারই সাধারণ আবস্তা। মোসলমানপাড়ায় দশ-পনেরো বিঘের বেশি জমি কারুর নাই। হিঁদুপাড়াতেও তাই, খুব বেশি হলে দু-চারজনার চল্লিশ-পঞ্চাশ বা ষাট বিঘে। মাহারাজার যে দুটি আত্মীয় ই গাঁয়ে আছে, তাদের জমি এট্টু বেশি বটে, তবু ষাট-সত্তর বিঘের বেশি হবে না। ইসব কথা কত্তার কাছেই শোনা। মন হলে কখনো কখনো ইসব কথা বলত।

কত্তাকে সারা জেবনে কুনোদিন নেশা করতে দেখি নাই। শখ করে কুনো সোমায় পান খেতে দেখেছি। তেমন সময়ে ফরসি হুঁকো

টানতেও দেখেছি। খেত না, খেত না, য্যাকন খেত, ত্যাকন খুব আয়েশ করেই খেত। দামি অম্বুরি তামুক আনাত, পানের লেগে কিমাম কিনত। দেখে মনে হতো, এই বুঝি কত্তা পান ধরলে কিম্বা তামুক ধরলে। কিন্তুক এসব দু-মাস তিন মাস। তাপর তামুক হঠাৎ ছেড়ে দিলে, ফরসি হুঁকোটোও কোথা পড়ে থাকল। এমনি আজব মানুষ! তবে ইকথা বলব, য্যাকন পান ধরত কিম্বা হুঁকো খেত, মেজাজটো খুব শরিফ থাকত। কথা যা ঐরকম সোমায়েই বলত বেশি।

রায়েদের জমি যি কত্তা নিলেমে কিনে নিয়েছিল, তাতে আমার মনটো খুব খচখচ করত। মাঝে মাঝে মনে হত কত্তাও বোধায় এই নিয়ে আমাকে দুটো কথা বলতে চায়। কাজটো সে করেছে বটে, কিন্তু সি যেন নেহাত বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে বলেই করেছে। কথাটো এই যি জমি কি রায়েদের থাকত আমরা নিলেম না ডাকলে? কত্তা একদিন এমন করে রায়েদের কথা বললে তাতে মনে হলো যেন কেচ্ছা শুনছি। ফরসি টানতে টানতে শুরু করলে, এ গাঁয়ে মিদার যদি কেউ থাকে, তাহলে সে রায়েরা। এরা উঁচু বংশ, বামুন বংশ। গাঁয়ের আদ্দেকটার মালিক ছিল ওরাই। যেমন উঁচু মন, তেমনিই বেহিসাবি খরুচে। খাওয়া-পরায় সবই উড়িয়ে দিত। কিন্তু এদের কেউই মেজাজি ছিল না। সবাই বড় ঠান্ডা মানুষ। যে যা চাইত, ধরে বসত, দিয়ে দিত। এই করতে করতে সব শেষ করে দিলে। ছেলেপুলেরা কেউ গাঁ ছাড়লে না, লেখাপড়া শিখলে না, চোখের সামনে দেখলাম পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে সব শেষ করে দিয়ে ফতুর হয়ে গেল। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অনেকেই এখন গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছে, ছেলেদের কেউ কেউ কলকাতা-টলকাতা গিয়ে বাড়ির চাকর বা রাঁধুনি-বামুনের কাজ করছে। ভিটেমাটি পড়ে আছে, সাপ-খোপ বাসা করেছে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পাকা বাড়ি-ঘর, পুজোর মন্দির। ছাদ ফাটিয়ে বট-পাকুড় গাছ উঠেছে। বেনা ঘাস, গোয়াল-লতা, কন্টিকারির জঙ্গলে কাছে যাবার উপায় নাই। এই তো অবস্থা! দেখবে আর দুদিন বাদে

ছোট রায় ঝুলি হাতে ভিক্ষে করতে বেরুবে। জমিগুলি আমি কিনলাম, খুবই খারাপ লাগে বটে তবে নিয়তি ঢুকেছে বংশে। মানুষের সংসারে নিয়মই এই, উঠতে উঠতে আকাশে ঠেকবে মাথা, তারপরে পড়তে পড়তে একদিন মাটিতেই আশ্রয়। এ হবেই– সব বংশেই হয়। নিয়তির পথ কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

আস্তে আস্তে ফরসি টানতে টানতে ইসব কথা একদিন কত্তা বলেছিল আমাকে। কথা বলতে পারত বটে মানুষটো, অমন আর কোথাও শুনি নাই। ইসব কথা চেরকালের লেগে মাথার ভেতরে ঢুকে গেল : দেখো, কদিনের মধ্যেই জমির টাকা খেয়ে ফুরিয়ে দেবে রায়েদের ছোট তরফ, বড় বড় আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ে পর্যন্ত হবে না।

ঠিকই তাই, কদিন বাদেই শোনলম, ছোট রায় তাদের বেরাট বাড়িটো ভেঙে সেগুনকাঠের কড়ি-বরগা, নোকশা-করা কাঠের সাজ আর আর যা কিছু আছে নকড়ায়-ছকড়ায় বিকিয়ে দিচে। সব ঘর ভেঙে দিয়ে একপাশে মাত্তর একটি ঘর রেখে সেখানে বাস করবে, এগ্‌নের এক কোণে রান্নার লেগে বানিয়ে নেবে একটো ছোট চালাঘর। যাকগো, ই বাড়ি থেকে রায়েদের বাড়ির আর একটিও জিনিশ কেনা হলো না।

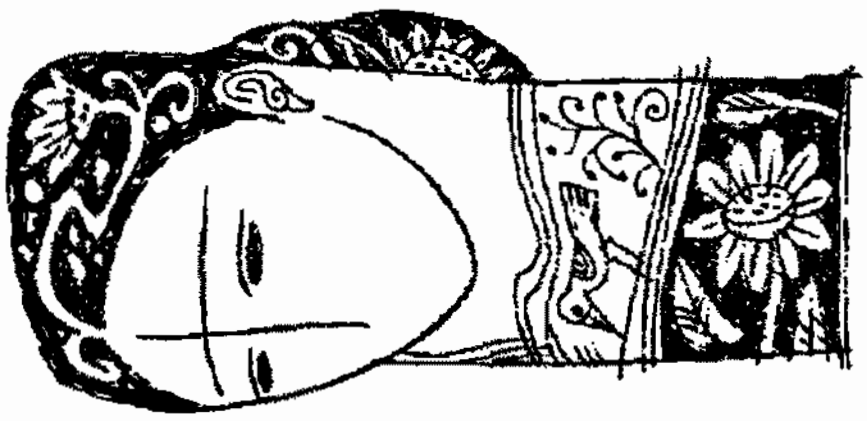

সোয়ামি সোংসার নিয়ে আমার খুব গরব হলো

যে শাশুড়িকে যমের মতুন ভয় করতম, মুখের দিকে তাকাইতে পয্যন্ত সাহস করতম না, সেই শাশুড়ি একদিন বৈকালবেলায় আমাকে তার ঘরে ডাকলে। খোঁকা ত্যাকন খানিকটো ডাগর হয়েছে, সে-ও সেই সোমায় আমার কাছে ছিল। ঘরে যেয়ে দাঁড়াইতেই শাশুড়ি আমার কাছে এসে বললে, মেতর-বউ, আমি একটা কথা বলি। এই বাড়ির লক্ষ্মী তুমি, তোমার পয়েই সবকিছু আবার হবে। তোমার শ্বশুরের মিত্যুর পর সোংসার ভেসে যেছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে অগাধ পানিতে পড়েছেলম। আমার ঐ মেজ ছেলে সব আবার ফিরিয়ে আনলে। সেই ছেলের বউ তুমি। আমি সব জানি, গায়ের গয়না খুলে দিয়েছ তুমি। আল্লা তোমার ভালো করবে। দোয়া করি তোমাকে। দ্যাওর, ননদ, জা সবাইকে তুমি দেখো। চিরকাল ওরা তোমাকে ভক্তি করবে, মেনে চলবে, আমি জানি। তোমার এই খোঁকা আমার বংশের মানিক। ওর হায়াত দরাজ হোক, এই দোয়া করি আমি– এই বলে শাশুড়ি আমার মাথার ওপর হাত রাখলে।

ঐ একবারই অমনি করে কথা বলেছিল আমার শাশুড়ি, আর কুনোদিন লয়। এমনিতে কথা পেঁরায় বলতই না। পাতলা পাতলা দুটি ঠোঁট চেপে থাকত, আমাদের সাথে য্যাকন কথা বলত কি কাঠ কাঠ যি লাগত! তা সি যাকগো, সেই থেকে আমি জানি, সব সোমায় নিজের নিজের করলে কিছুই আর নিজের থাকে না।

সোংসারের আয়-বরকত বেড়ে গেল। কত্তা একদিন তার মাকে হিশেব করে বুঝিয়ে দিলে যে চাষের জমি সব মিলে এক-শো বিঘে না হলেও আশি-নব্বুই বিঘে হয়েছে। আউশ জমি কুড়ি-পঁচিশ বিঘে, তা থেকে আউশ ধান কিছু তো পাওয়া যাবেই, তা-বাদে সোমবচ্ছরের যব, গম, আলু, পেঁয়াজ, তিল, সরষে যা যা সোংসারের দরকার তার সবই পাওয়া যাবে। জমিতে আখ লাগিয়ে চোত মাসে শাল করে যা

গুড় পাওয়া যাবে, তাতে সোংসারের পেয়োজন মিটিয়ে অ্যানেকটো বেচাও যাবে। ডাল যা লাগছে, মুগ মুশুরি মাস মটর ছোলা আইরি সব ডালই সারা বছরের লেগে হবে। খোঁরো ডিঙিলি পটল ইসব তরিতরকারিও করা যাবে। আর সত্তর-আশি বিঘে জমির আমন ধানে বছরখোরাকি তো হবেই, সোংসারের দরকারে ধান কিছু বিক্রিও করা যাবে।

চার-পাঁচটো নাঙলের লেগে কেনা হলো আট-দশটো মোষ। এই এলেকার মাটি ভালো লয়, এঁটেল মাটি, ইদিকে গরুর নাঙল চলে না। এই বড় বড় চ্যাঙর ওঠে জমিতে, সি চ্যাঙর তোলা গরুর কম্ম লয়। হাতি হাতি মোষ দরকার। মোষের নাঙলে-তোলা ঐসব চ্যাঙর আবার টাম্‌না দিয়ে ভাঙতে হয়।

চাষের লেগে একটা-দুটো করে আট-দশটো মোষ কেনা হলো। সেই সাথে গরু-বাছুরও বাড়তে লাগল। বাড়িতে এত লোক, ছোট্ট ছেলে বলতে অবিশ্যি আমার খোঁকা, গরুর দুধ তো কম লাগে না। তাই গাই-গরু অ্যানেকগুলিন হলো। তাদের আবার এঁড়ে বকনা বাছুর যি কতো! সব নিয়ে গোয়াল ভত্তি। পেতলের বড় বড় বালতিতে দুধ আনা হয় দু-বেলা। বড় বড় লোহার কড়াইয়ে জ্বাল দেওয়া হয় সেই দুধ। তাপর বাড়িতে পেঁয়াজের বড় পাহাড় হয়, রাখার জায়গা নাই। বাড়তি পেঁয়াজ বেচেও কুনো লাভ নাই। দু-পয়সা চার পয়সা সের। নেবেই বা কে? পাঁচ কামরার কোঠাঘরের একটো ঘরের মেজেয় পেঁয়াজ রাখা হয়েছে। সব পচে বাড়ি একদম দুগ্গন্ধে ভরে গেল। শুধু পেঁয়াজ ক্যানে, গুড়ের আবস্তাও তাই। খানা রাঁধার বিরাট তামার হাঁড়িতে গুড় রাখা হয়েছে। ঘরে রাখার জায়গা নাই, পিঁড়ের এক কোণে রাখা হয়েছে, ঢাকনা পয্যন্ত নাই। একদিন সবাই দ্যাখে, এই বড় একজোড়া ইঁদুর মরে তার মদ্যে পড়ে রয়েছে, মাগো কি ঘিন্না! সেই গুড় ফেলে দিলে গুড়ের ঢল বয়ে গেল গোটা এগ্‌নে জুড়ে। একেই বলে উপছে-পড়া সোংসার। ধান নিয়েও কুনো কুনোবার

মুশকিল হতো। অত বড় খামার– এক-একটো একশো-দ্যাড়শো মণ ধানের মরাই– একটা-দুটো তো লয়, আট-দশটো সারা খামার জুড়ে, ছেলেপুলেরা লুকোচুরি খেলতে পারত– তা এক-এক বছর সেই খামারেও খ্যাড়ের পালুই আর মরাই করার জায়গা থাকত না। এইসব কথা অ্যাকনকার লোকের পেত্যয় হবে না কিন্তুক ইসবই আমি নিজের চোখে দেখেছি।

বাড়িতে ইদিকে মানুষ বেড়েই যেচে, বেড়েই যেচে। কাজের মানুষ আলেদা পাওয়া যেত না। গরিব পাড়া-পড়শি, ভাই-ভায়াদ, আত্মীয়, বেধবা কিম্বা গরিব বউরা বাড়িতে এসে থাকত, এটো ওটো করত, দুটো খেতে পেত। গামছা দিয়ে ঢেকে বাড়িতে ভাত-তরকারি নিয়েও যেত। কিন্তুক কেউ রেতে থাকত না। গরু মোষ মাঠে নিয়ে যাওয়া, চরানো, আবার বাড়িতে আনার লেগে সোমবচ্ছরের রাখাল রাখা হতো, মাহিন্দার থাকত দুজন। এই সবাই কিন্তুক ঘরের লোক মতুন, তবে রেতে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। বাড়িতে কেউ থাকে না।

এমনি অ্যাকটো পরিবার একবার এল ভিন গাঁ থেকে। বাপটো কুটে, একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে মা হিমশিম খেছে। কত্তা খামারের পাশে ছোট খামারে ঘর বাঁধার লেগে তাদের জায়গা দিলে। কুটে বাপটো কঞ্চি-কাবারি দিয়ে চালের ওপরে খ্যাড় চাপিয়ে ঘর একটো বানাইলে বটে, তা কাকেও তার চাইতে ভালো বাসা বানায়। সেই ঘরে সবারই জায়গা হলো। বড় ছেলেটো হলো মাহিন্দার, ছোটটো– সে একদম ছোট– সে হলো রাখাল। বাপ ঘরের ভেতর দিনরাত শুয়ে থাকে, তামুক খায় আর কাশে। তিন-চারটো মেয়ে নিয়ে মা মাঠেঘাটে চরে বেড়ায়। তা বলে কেউ উপোস থাকত না, দুটো ভাত সবারই জুটত। তিন মেয়ের নোম্বা নোম্বা চুল, কুনোদিন ত্যাল পড়ে নাই তাতে, কটা শণের মতুন রং। বৈকালবেলা মা-টো এই তিন মেয়ের চুলের উকুন বাছতে বসত আর তারা নড়লেই পিঠে মারত

গুম গুম করে কিল। খেতে পেলে তবেই না এমন করে উকুন বাছা!

ছুটো-ছাটা কাজের মানুষ আরও ছিল। তিন-চার আনা দৈনিক মজুরিতে সারা দিনের লেগে মুনিষ দুটো-একটো পেরায় দিন থাকত। তারাও সব গরিব আত্মীয়স্বজন। পানি খাবার বেলা ভরপেট বাসিভাত নাইলে মুড়ি আর দোপরবেলায় ভরপেট গরম ভাত এদের জোগাতেই হতো।

ইসব হলো সারা বছরের ব্যবস্থা। কিন্তুক বর্ষাকালে ধান রোপার সোমায় আর পোষ মাসে ধান কাটার সোমায় একদম আলাদা বেবস্তা। ত্যাকন দশ থেকে পনেরো জনা মুনিষ পেত্যেকদিন কাজ করত। আবাদের সোমায় টানা বিশ-পঁচিশ দিন থেকে এক মাস পয্যন্ত তাদের থাকতে হত। ধান কাটার সোমায়েও তাই, শ্যাষ না হওয়া পয্যন্ত তারা থাকত। অত লোক কোথা পাওয়া যাবে? ভিন গাঁ থেকে, উত্তরের সব গরিব গাঁ থেকে আসত মুনিষরা। তা বাদে সেই কোথা ছোটনাগপুরের দুমকা জেলার সাঁওতালদের এলেকা থেকে সাঁওতাল মেয়ে-মরদ আসত কাজের লেগে। বর্ষাকালে ধান রোয়া হয়ে গেলে কিম্বা জাড়কালে ধানকাটা শেষ হলে এরা আবার সব নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যেত। কত্তার ভাইরা চাষবাসের কাজ দেখাশোনা করত বটে কিন্তুক হাতে মাটি লাগাত না কেউই। একমাত্তর আমার সেজ দ্যাওর নিজের হাতে কিছু কিছু কাজ করত। কিন্তুক কত্তাকে তেমন কেউ দেখতেই পেত না। তবু এত বড় যজ্ঞি সে-ই সামলাত। সারা দিন সে বাড়িতে না থাকলেও গাঁয়েই পেরায় থাকত। স্কুল ছিল, কত্তামার বাড়ি ছিল। শহরেও যেত মাঝে মাঝে। শহরে গেলে ধোপ-দোরস্ত জামাকাপড় পরে ভোরবেলায় বেরিয়ে যেত, ফিরত রেতে। জামা-কাপড় আর কি– এই ধুতি আর শার্ট, কখনো কখনো পিরেন, শীতকালে কাশ্মীরি শাল– ইসবই পরত। কিন্তুক যেখানেই যাক, রেতে ফেরা চাই। চেরকাল এই দেখে অ্যালম, রাত কখনো বাইরে কাটাত না। মেঘঝড়বিষ্টি কোনো কিছুই মানামানি নাই, শতেক

বেপদ ঘাড়ে নিয়ে হলেও বাড়ি ফিরবে। এক কোশ দূরে র‍্যাল ইস্টিশন। সিখানে যাবার পথঘাট নাই বললেই চলে। মাঝে মাঝে ধানের জমির আলপথ ধরে কিম্বা ডাঙাজমির বনবাদাড় ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হতো। চারদিক সাপ-খোপে ভরা। গরমকালে ভায়ানক ধুলো আর বর্ষাকালে বেপজ্জয় কাদা। এরই মধ্যে সে যাতায়াত করত। বোধায় অত কষ্ট পেয়েছিল বলেই আর ক-বছর বাদে সোন্দর সড়ক করিয়েছিল গরমেন্টকে দিয়ে। দশ গাঁয়ের যোগাযোগ হয়েছিল র‍্যাল ইস্টিশনের সাথে।

আমরা আর কি বুঝব? কিন্তুক বড় বড় মানুষ আর বড় বড় শহরের সাথে কত্তার যি যোগাযোগ হচে তা যেন একটু একটু বুঝতে পারতম। তা না হলে অত শহরে যেত ক্যানে? বাড়িতেও দেখি অচেনা-অজানা লোকজন আসার কামাই নাই। আমাদের মতুন মেয়েমানুষদের অজানা-অচেনা তো হবেই, কত্তাই মাঝে মাঝে বলত, অ্যামন লোকও য্যাকন-ত্যাকন বাড়িতে আসে কত্তা যাদের চেনে না। আত্মীয়-কুটুম ছাড়া গাঁয়ে-ঘরে কার বাড়িতে আবার কটো অচেনা লোক আসে? তাইলে ই বাড়িতে এত লোক আসবে ক্যানে? ভয়ে আমার বুক দুরদুর করে— কি জানি এত বেগানা লোক ক্যানে আসে বাড়িতে!

ল্যাখাপড়া এট্টু এট্টু য্যাকন শিখছি, ত্যাকন কত্তা একদিন বলেছিল ই দ্যাশ পরাধীন। উ কথার মানে ত্যাকন কিছুই বুঝি নাই। কত্তাকে শুদিয়ে জেনেছেলম যি, ই দ্যাশ মাহারানীর রাজত্ব। দ্যাড়শো বছর ধরে ই দ্যাশ পরাধীন। তার মদ্যে তিন কুড়ি বছর ই দ্যাশ শাসন করেছে এই মাহারানী। সেই রানী মরেচে পেরায় বিশ বছর হলো। অ্যাকন তার ছেলে রাজা। কি আচ্চয্যি, কোথাকার কোন্ দ্যাশের লোক রাজা-রানী হয়ে ই দ্যাশ শাসন করছে!

ইসব কথার কিছুই বুঝতে পারতম না। রানী শাসন করছে, না রাজা শাসন করছে, চোখে দেখতেও পেচি না, কানে শুনতেও পেচি না— শাসন করছে তা আমার কি? আমার বিয়ের সোমায় শুনেছেলম

একটো যুদ্ধু হচে সারা দুনিয়া জুড়ে। সি তো শোনা কথা, যুদ্ধু কিছু দেখি নাই। তা আজকাল দেখি কত্তা বলছে, সারা দুনিয়ার এই যুদ্ধ জিতে রাজা লিকিনি মুসলিম জাহানের খলিফা যি দ্যাশে থাকে সি দ্যাশ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেবে।

কত্তার কথা তেমন বুঝতে না পারলেও কেমন ভয় ভয় করতে লাগল আমার। এইসব লেগেই কি বাড়িতে অত অচেনা-অজানা মানুষ আসছে? এই লেগেই কি কত্তা পেরায় পেত্যেকদিন শহর-গঞ্জে যেচে?

ইদিকে বাড়িতে সুখের অন্ত নাই। দুধ ঘি মাখন মাছ গোশ্‌তো তরি-তরকারি চাল-ডালে ভেসে যেচে বাড়ি। দিনদিন লোক বাড়ছে। মুনিষ-জন, বছর-কাবারি মাহিন্দারে বাড়ি ভরা। কত্তা আজকাল পেরায়ই বাড়ির ভেতরে মা-বুনের কাছে আসে এটো-ওটো কথা বলার লেগে। কুনোদিন এসে বলে, মা, তুমি জানো বাপজির তাজি ঘোড়া ছিল, নিজের ছয়-বেহারা পালকি ছিল, বাউরি-পাড়ায় সোমবচ্ছরের জন্যে বেহারাদের ঘর ঠিক করা ছিল। সেসব কোন্‌দিকে কি হয়ে গিয়েছে। পরচালির খুঁটিতে ঘোড়ার পুরনো জিনটা দেখি আর ভাবি, সব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। পালকি আবার নতুন করে তৈরি হবে। গিদ্‌গাঁয়ের ছুতোরমিস্ত্রিরা দুদিন বাদে আসবে। পুরনো পালকিটা নতুন করে ফেলব। নতুন ছাউনি হবে, নতুন ডাঁপ, নতুন রঙ হবে। আর ঐ সঙ্গে গরুর গাড়ির নতুন একটি বড় টপ্পরও করিয়ে নোব।

ঘরের কাজ করতে করতে আড়চোখে চেয়ে দেখি, শাশুড়ির মুখে বড্ডা খুশি। মুক্তোর মতুন জিরি জিরি শাদা দাঁত দেখা যেছে কি যেছে না। ছেলের লেগে শতেক দোয়া যেন ঝরে পড়ছে চাউনি থেকে। শাশুড়ি বলছে, সে তো ভালো কথা বাবা। আমি জানি, তুমি আবার সব করবে।

হ্যাঁ, সব আমার লতুন করে হলো। লতুন পালকি হলো, গরুর গাড়ির লতুন ছই হলো। বাইরে কাজ হতো, কাঠের গন্ধ, বাঁশের গন্ধ, রঙের গন্ধ বাড়ির ভেতরেও প্যাতম। কাঠ চাঁচা, বাঁশ চাঁচা, বেত চাঁচার

শব্দও কানে আসত। সব তৈরি হয়ে গেলে একদিন সিসব দেখেও অ্যালম।

কদিন বাদে, এক-দু-মাস হবে, কত্তা একদিন ঠিক দোপরবেলায় বাড়ির ভেতরে এসে মাকে বললে, মা, ঘোড়া একটি কেনা হয়েছে, আমাদের খামারে বাঁধা আছে। আড়াল থেকে দেখবে চলো।

শাশুড়ির বাইরে আসার মন ছিল না। কিন্তুক ছেলে বললে আর কি করবে। বউ-ঝি বিধবা ননদ সবাইকে সাথে যেতে বললে। কত্তার ভাইরা কেউ ছিল কি না মনে পড়ছে না। পরচালির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলম, এই বড় একটো সর্ষে-সর্ষে রঙের ঘোড়া খুঁটিতে বাঁধা আছে, মাহিন্দার ছোঁড়াটো একবার কাছে যেচে, আবার ভয়ে পিছিয়ে আসছে। ঘোড়ার লতুন সাজ, লতুন চামড়ার জিন, ইসব কেনা হয়েছে— সি-সবের গন্ধ পেচি, চামড়ার ক্যাচম্যাচ আওয়াজও পেচি। শাশুড়ি এট্টুখন দাঁড়িয়ে থাকলে, তাপর বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

আর কি, সব তো যোলোকলায় পুন্ন হলো। সবাই এমন ভাব করতে লাগলে যেন সব গরবই আমার। মিছে বলব না, সি আমার খুব ভালো লাগত। তাই বলে দেমাগ আর গরব দেখানোর কুনো বাগ নাই। আমি জানতম, উসব করতে গেলে কত্তা আমার নতিজার বাকি রাখবে না। চিনি তো উ মানুষকে। তা আমারও কুনোদিন উসব করতে মন যায় নাই। আমি ছেলের মা, আমার তো আর কুনো গরব নাই। এক এই গরবই য্যাথেষ্ট!

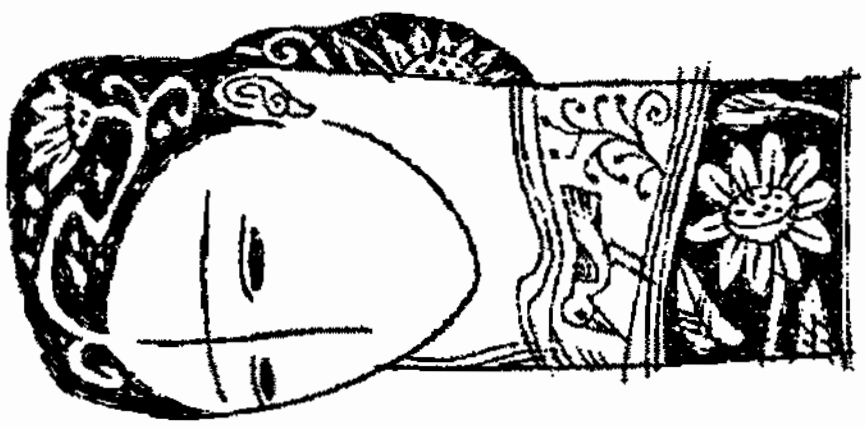

সোংসার সুখ-দুখের দুই সুতোয় বোনা বই-তো লয়

বিয়ের এক বছরের মাথায় আমার খোঁকা হয়েছিল। তাপর আট বছরের মধ্যে আমাদের সোংসারে আর কুনো ছেলেপুলে হয় নাই। ভাশুরের বিয়ে কত্তার বিয়ের ক-বছর আগেই হয়েছিল। পেথম পেথম মনে হতো, বড় বউয়ের ছেলেমেয়ে হতে একটু সোমায় লাগছে। তা-পর এক বছর যায়, দু-বছর যায়, তিন বছর যায়, য্যাকন ছেলেপুলে হলো না, ত্যাকন বোঝা গেল উয়াদের আর সন্তান হবে না। ওষুধ-পত্তর করা হয়েছিল বৈকি। কিন্তুক কের্‌মে কের্‌মে সবাই আশা ছেড়ে দিলে। বড় বউ তাইলে বাঁজা। আর বড়কত্তা, আমার আলাভুলো ভাশুর, উ নিয়ে কুনোদিনই মাথা ঘামাইলে না। সে তো সোংসারের কুনো কিছুতেই থাকত না!

সেজ দ্যাওরের বিয়েটো হলো অ্যানেক পরে। তার বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেয়েছিল। তবে এট্টু দেরি হলেও কত্তাই উদ্‌যুগ করে বিয়ে দিলে। কিন্তুক বিয়ের তিন-চার বছর পরেও তার ছেলেপুলে কিছু হলো না। সেই লেগেই বলছেলম আট বছর ধরে সোংসারে ছেলে বলতে আমার ঐ খোঁকা। তা এই আবস্তায় সে আর একা আমার খোঁকা হয়ে ক্যানে থাকবে? সে হলো সবার চোখের মণি– জানের জান। একা সোংসারে দিন দিন ছিরিবৃদ্ধি। সবাই মনে করতে লাগল ঐ খোঁকাই এত সুখের মূল। তাকে নিয়ে কি যে করবে সি আর কেউ খুঁজে পেত না। সবকিছুতে আগে বড় খোঁকার কথা। বাড়িতে মন্ডা মিঠাই এলে বড় খোঁকা কই? যে য্যাকন বাইরে যেচে, কিছু একটো হাতে করে আনছে বড় খোঁকার লেগে। কত্তাই বরঞ্চ খোঁকার দিকে তেমন নজর দেয় না। সে হয়তো সোমায়ই পায় না। হয়তো ভাবত, ছেলে তো সবারই, আমি না দেখলেই বা কি, দেখার লোকের কি অভাব? ছোট বুনটির ত্যাতোদিনে বিয়ে হয়ে গেয়েছিল বটে; তবে তারপরের ছোট ভাই দুটির ত্যাকনো বিয়ে হয় নাই। এই ল আর

ছোট দ্যাওর দুটি আমার দুটি ভাই-ই ছিল, যা বলতম তা-ই শুনত আর খোঁকাকে খানিকক্ষণ না দেখলেই চোখে যেন আঁদার দেখত।

এই করতে করতে আট বছর কেটে গেল। কি আচ্চয্যি মা, চোখের ছামনে আমার শামলা রঙের খোঁকা আট বছরেরটি হয়ে গেল। কি তার চোখে মায়া কি তার, মুখে লাজুক হাসি! সি আর কুনোদিন দেখলম না! ঠিক সোমায়ে তার হাতেখড়ি হলো। কত্তা নিজেই হাতেখড়ি দিলে। এই সোমায়ে, কি করে আমার মনে নাই, গাঁয়ে এক ওস্তাদজি এল। তাকে গাঁয়ে আনা হলো, নাকি সে নিজেই এল, অ্যাকন আর বলতে পারব না। তার কাজ হলো খোঁকাকেই পড়ানো। গাঁয়ে, মোসলমান পাড়ায় তো পড়ার মতুন আর একটি ছেলেও ছিল না। কত্তা মাটির পাঁচির দিয়ে ঘেরা একটো বড় ভিটে কিনেছিল। একটি মাত্তর ছোট মেটে ঘর ছিল সিখানে, তাতে কুনো জানেলা নাই। আলকাতরা মাখানো একটিমাত্র দরজা ছিল। সেই ঘরে হলো ওস্তাদজির আস্তানা আর মোটে একজনা পোড়ো আমার খোঁকা। সবাই বলত কালা ওস্তাদজি, কানে সে কিছুই শুনতে পেত না। ভারি ভালো লোক, তিন-বেলা তার খাবার যেত আমাদের বাড়ি থেকে।

খোঁকার জন্মের চার বছর পর আমার একটো সন্তান লষ্ট হলো। সে-ও খোঁকা ছিল। পেট থেকে মরাই জন্মাইছিল। কে আর কি করবে? দু-দিন বাড়িটো থম ধরে থাকল, শুদু শাশুড়িকে মুখ ফুটে আহাজারি করতে শুনেছেলম। ত্যাকন দুনিয়া ফাঁকা ছিল, গভ্‌ভো লষ্ট হলে সবারই খুব গায়ে বাজত। ই ক্যানে হলো, ই ক্যানে হলো, এমন দুর্দৈব ক্যানে– শাশুড়ির খালি এই আপসোস! ইদিকে ছেলে হতে যেয়ে আমার পেরায় সব রক্ত বেরিয়ে গেল, মরার মতুন হলোম। শরীর শুকিয়ে কাটি হলো। মরা ছেলের মুখটো একবারই দেখেছেলম। সি না দেখাই ভালো ছিল। সোমায়ের অনেক আগেই সে দুনিয়াতে আসতে চেয়েছিল। যিদিন বাড়িতে এই বেপদ ঘটে, সিদিন কত্তা বাড়িতে ছিল কি না মনে করতে পারছি না। বোধায় ছিল না। বাড়ির

বউয়ের সন্তান হবে ই ছিল মেয়েলি বেপার, বাড়ির পুরুষদের ই নিয়ে নিয়ে কুনো ভাবনাই ছিল না। তাদের তো কিছু করার নাই। হাড়িবউ দাই ঠিক করা আছে, সি ব্যবস্থা বছরকাবারি। বছরের শেষে দাই একটো সিদে পায়, শাড়ি-কাপড় পায়, চাল-ডাল পায়, পারলে কেউ কেউ নগদ-ও কিছু দেয়। সন্তান হলেও দেয়, না হলেও দেয়। বছর শেষে চোত মাসের মদ্যেই দেয়। আর সন্তান হলে তো কথাই নাই, ত্যাকন অ্যানেক কিছুই পায়। বড়লোকের বাড়ি হলে সোনা-রুপোর গয়নাও পায়। আমার বড় খোঁকা হলে তার দাই সোনার মাকড়ি পেয়েছিল। যাকগো, কত্তা সিদিন ছিল কি ছিল না মনে নাই, এতটুকুনি মরা ছেলে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে একপাশে রাখা হয়েছে। রেতে ফিরে কত্তা কি একবার দাঁড়িয়ে দেখলে? কি জানি! ডাক্তারবদ্যির কুনো কথাই ছিল না। তাই ভাবি, ছেলে মলো, মা-ও তো মরতে পারত! তাই যেদি হতো, তাইলে কত্তা কি করত? ব্যাটাছেলে আবার কি করবে? মায়ের কথা শুনে দিনকতক বাদে আবার বিয়ে করত। একটো ফল দিয়ে ফলগাছ মরে গেয়েছে, তা আবার তার পাশে আর একটো ফলগাছ লাগাতে হবে না? ইসব কথা অ্যাকন মনে হয়, ত্যাকন কিন্তুক মনে হয় নাই। কত্তার মুখটো কেমন হয়েছিল ত্যাকন দেখি নাই, পরেও কুনোদিন কত্তা ই নিয়ে কুনো কথা বলে নাই।

বেপদের ছেঁয়া কি চেরকাল থাকে? ই বাড়িতেও থাকল না। একদিন খবর পাওয়া গেল ছোট যে বুনটির বিয়ে হয়েছিল দশ কোশ দূরের এক গাঁয়ে, সেই বুনের একটি খোঁকা হয়েছে। যেদিও সি অন্য বংশের বেপার, তাদের বাড়িতে পেথম বংশধর এয়েছে, তবু মেয়ে তো ই বংশের! সেই লেগে ই বাড়ি আনন্দের সাগরে ভাসতে লাগল। কত্তা তার ছোট বুনদের কি চোখে দেখত সিকথা আগে বলেছি। বিশেষ, তার এই ছোট বুনটিকে ভারি ভালোবাসত! সোম্বাদ পেয়েই কতো কি সামিগ্রি দিয়ে ঝুড়ি বাঁক ভরে লোক রওনা করিয়ে দিলে আর নিজে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটল ছোট বুনের বাড়ি। গাঁয়েই যে বড়

বুনের বিয়ে হয়েছিল, তার ত্যাকন বেশ কটো ছেলেমেয়ে হয়েছে, দুটি ভাগ্নে তো ত্যাকন বেশ ডাগরই হয়েছে, তবু ভিনগাঁয়ে ছোট বুনের খোঁকা হবার খবরে কত্তা কি খুশি যি হলো সি আমার অ্যাকনো মনে পড়ে।

আস্তে আস্তে সব আবার আগের মতুন হলো। ছোট দুটি দ্যাওর অ্যাকন জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছে। দুজনাই বড় স্কুলে পড়ছিল। সেজ-জনা তো ল্যাখাপড়া করলে না, আমার বিয়ের আগেই বোধায় স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। অ্যাকন দেখছি ল-দ্যাওরের-ও মতিগতি ভালো লয়, স্কুল মনে হয় ছেড়েই দেবে। কত্তার কাছে এসে মাথা নামিয়ে দাঁড়ায়, পায়ের নোখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে আর ব্যাবসা-ট্যাবসা করা যায় কিনা ভয়ে ভয়ে ভাইকে সেই কথা শুদোয়। তবে ছোট দ্যাওরটি মন দিয়ে স্কুলে পড়ছে। আমার খোঁকাও কালা ওস্তাদজির কাছ থেকে ছাড়ান পেয়ে স্কুলে ভত্তি হবে হবে করছে। এই সোমায়ে য্যাকন সবারই মনে হছিল সোংসারে শিগগিরি আর কুনো ছেলেমেয়ে আসবে না, সেইরকম সোমায় আমারই আর একটি খোঁকা হলো। বড় খোঁকার বয়েস ত্যাকন আট বছর।

বড় খোঁকা ছিল শামলা, সি রঙ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত, জানে শান্তি হতো। গরমকালে গাছের ছেঁয়ায় বসার মতুন মনে হতো। আর ই লতুন খোঁকার রঙ হলো গোরো ধপধপে। বড় খোঁকা হলো ঠিক তার বাপের মতুন– কত্তার গায়ের রঙ-ও ছিল শামলা– লতুন খোঁকা হলো তার মামার মতো।

তাইলে সোংসারে ত্যাকনো পয্যন্ত ছেলেপুলে বলতে হলো আমার দুটি খোঁকাই। সেই কালে ছেলেমেয়ে কমবেশি নিয়ে কেউ কিছু ভাবত না। চাকরি করে কাঁচা টাকা আয় করে সবকিছু কিনে খাওয়া তো ত্যাকন ছিল না। সবাই গাঁয়ে-ঘরে থাকে, বাইরে আর কে যেচে? বাড়ির খেচে, বাড়ির মাখছে। শুদু কি মানুষ? গরু ছাগল কুকুর বেড়াল সবারই হক আছে। বলতে গেলে এক থালাতেই সবাই

খেচে। পগারে, জমিতে, ড্যাঙ্গায় যিখানে ঘাস হয়েছে, সি ঘাস দুটো ছাগলে খেলেও যা, দশটো ছাগলে খেলেও তা-ই। ঘাস কি ফুরিয়ে যেচে? সব্বারই গরুছাগলে সি ঘাস খেতে পারবে। বাড়িতে একটো ছেলে, না দুটো ছেলে, না দশটো ছেলে সি হিসেব ক্যানে করবে লোকে? খাক না সবাই মিলে য্যাতোক্ষণ আছে। তাই দেখতম পেরায় সব বাড়িতেই পাঁচটো-ছটো ছেলেমেয়ে আছেই। দশ-বারোটো, পনেরোটা পয্যন্ত ছেলেমেয়ে হতো কারু কারু। তবু গাঁ-ঘর ফাঁকাই লাগত, অ্যাকনকার মতুন গিস্-গিস্ করত না।

লতুন খোঁকার জন্ম হলো বলে বাড়িতে তাই আনন্দ বাড়ল বই কমল না। শাশুড়ি ননদ আমাকে নিয়েই বড়াং করতে লাগল। তারা বলত মেতর-বউয়ের পয়েই সব হচে। আয়-সম্পত্তি বাড়ছে, আবার দ্যাখো ক্যানে, বংশও বাড়ছে।

এই করতে করতে দিন পেরুইচে, মাস পেরুইচে, বছর পেরুইচে, শ্যাষে দু-বছর গেলে, আমার পরের খোঁকাটি দু-বছরেরটি হলে, একদিন জানা গেল সেজ বউ বারদার। এই কথা জেনে আমার আনন্দ হলো সবচেয়ে বেশি। এতদিন পেরায়ই মনে হতো সবারই সব সুখ যেন আমি একাই কেড়ে নিয়েছি। সুখ যি ভাগ করে নিতে হয়! নিজের সুখ কম করে নিলে তবে সেই সুখ বাড়ে। আমি সেজ বউয়ের খুব আদর-যত্ন করতে লাগলম। অনেক কাজ আর আমি তাকে করতে দেতম না, নিজেই করতম।

গাঁয়ের খাওয়াদাওয়া ত্যাকন খুব শাদামাটা, একইরকম খাবার-দাবার সব বাড়িতে। সেই ভাত ডাল তরিতরকারি! মাছ গোশ্‌তো খুব কম। মাছ যেদি বা মিলত, গোশ্‌তো খাওয়া খুবই কম। হিঁদুরা বোধায় সারা বছরেও একদিন গোশ্‌তো খেত না। মোসলমানরা মুরগি পুষত বলে ডিম আর মুরগির গোশ্‌তোটো কখনো কখনো খেতে পেত। সেজ বউয়ের খাওয়াটো যাতে ওরই মদ্যে একটু ভালো হয়, আমি সেই চেষ্টা করতম। তবে সে খুব সামান্য। কারও লেগে, কুনো কারণে

আলাদা খাবার-দাবারের কথা ত্যাকন কেউ ভাবত না। ছেলেমেয়ে হবে, না হবে, ভূ-ভারতে রাতদিন হচে, ইয়ার লেগে আবার হ্যানো লয় ত্যানো করতে হবে ক্যানে। সি যা-ই হোক, দুধ আর ডিমটো আমি আলাদা করে সেজ বউকে জোর করে খাওয়াতম। দশ মাস দশ দিনের মাথায়,– কে জানে দশ মাস, না ন-মাস– সবাই দশ মাস দশ দিনই বলত, তাই বলছি, দশ মাস দশ দিনের মাথায় সেজ বউয়ের একটো মোটাসোটা খোঁকা হলো। আপনাআপনিই হলো। দাইবউ এসে দেখে খোঁকা হয়ে গেয়েছে। মাটিতে পড়ে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদচে। আমরা সবাই মজাক করে হেসে হেসে বললম, দাইবউ, তোমার ইবার আর কুনো পাওনা নাই, আঁতুড়ঘরে ঢুকতেও হলো না। ই ছেলে তোমাকে কি দাই-মা বলে ডাকবে?

কথা শুনে দাইবউ লথ নেড়ে নেড়ে কি হাসতেই না লাগল। ইয়ার পরের কথাটো এইখানেই বলে দিছি। সেজ বউ আর কুনো সোমায় নিলে না– পরের বছর, এক বছর হয়েছে কি হয় নাই, তার আর একটো খোঁকা হলো।

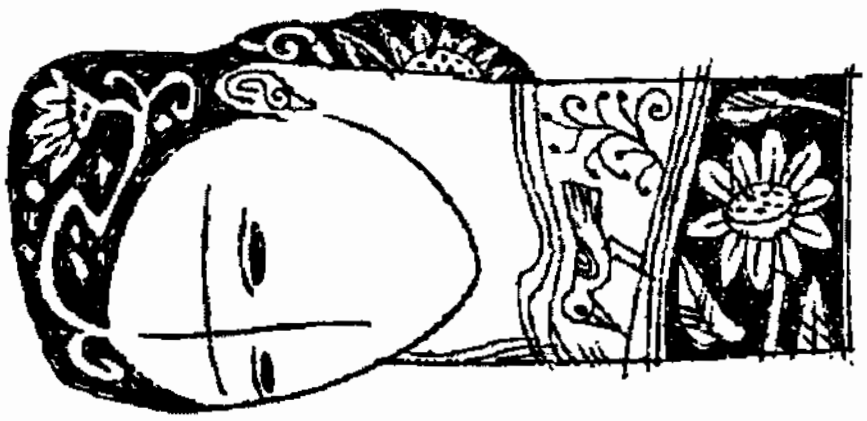

ও মা, মাগো, কতোদিন যাই নাই, এইবার বাপের বাড়ি যাব

দুই ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি যেচি। ছোট ছেলেটো ত্যাকন একটু ডাঁটো হয়েছে। মাঝখানে পরপর দু-বছর বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নাই সোংসারের হ্যাঙ্গামে। বিয়ের পর থেকে পিতিবারেই গরমকালে বাপের বাড়ি যাওয়া হয়েছে। আবার পিতি বছরেই বাপের বাড়ি থেকে ভাদর মাসের শেষে, নাহয় আশিন মাসে মা কতো যি খাবার-দাবার, পিঠেপুলি, ফলমূল, কাপড়-জামা পাঠাইত তার সীমা নাই। সৎ-মা বলে যি কোথাও গাফিলি হবে, তার জো ছিল না। ভারা কাঁধে নিয়ে লোক আসত, সঙ্গে আসত বাগদিবউ। অ্যানেকরকম জিনিশ আসত। কুনো কুনো বছর আবার বড় মিরিক লয়তো রুই মাছও আসত। শাশুড়ি ইসব যেমন খুব পছন্দ করত, তেমনি নিজের কত্তব্যও করত। ফেরত যাবার সোমায় বাগদিবউকে খুশি করে দিত। ভারাটো-ও ফাঁকা যেত না। আমি বাপের বাড়ি যাই আর না যাই মায়ের কিন্তুক উসব পাঠানোর কুনোবছর কামাই ছিল না।

মাঝখানে দু-বছর যাই নাই। যাই নাই কিন্তুক ইবার যেই যাবার কথা হলো, কত্তাও মত দিলে, ত্যাকন জান যেন ছেড়ে যেতে লাগল। কি করে ভুলে ছেলম মা! কোন্ নিব্বাসনে পড়ে আছি? কাদের নিয়ে কি করতে সোদর ছেড়ে এত দূরে আছি? কোথা রইল মা-বাপ, কোথা রইল ভাই-বুন, কোথা রইল গাঁ-ঘর— এইসব মনে করে বুকের মদ্যে হু হু করতে লাগল।

আমি বাপের বাড়ি য্যাতম আমাদের নিজেদের মোষের গাড়িতে আর ফিরে আসতম বাপের বাড়ির গরুর গাড়িতে। গাড়ি বিহানবেলায় যাবার লেগে তৈরি হলো। গাড়িতে খ্যাড় বিছিয়ে তার ওপর মোটা মোটা চারটো ফুল-তোলা ক্যাঁথা বিছিয়ে বিছেনা তৈরি হলো। লতুন টপ্পরের পেছনের মুখ শাড়ি দিয়ে বাঁধা, ছামনের মুখ-ও শাড়ি দিয়ে বাঁধা। একবার ভেতরে ঢুকলে আর কিছুই দেখবার উপয় নাই। মাহিন্দার

ছোঁড়াটো গাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে যাবে, পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে পেছু পেছু হেঁটে যাবে হলা বাগদি। পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে।

দুই ছেলে সাথে করে গাড়িতে উঠে টপ্পরের ভেতরে ঢোকলম, না, কবরের ভেতরে ঢোকলম! বড় খোঁকা ত্যাকন অ্যানেকটো সেয়ানা হয়েছে। সে ভেতরে থাকবে ক্যানে, গাড়োয়ানের কাছে যেয়ে বসবে। আমি খালি ভাবচি পাড়াটো শুধু পেরুইলে হয়, মাঠে যেয়ে পড়তে বাকি, টপ্পরের ছামনের শাড়িটো তুলে দোব। গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচে, টপ্পর লতুন রঙ করা হয়েছে, তার গন্দো আসছে, টপ্পরের সরু একটো ফাঁক দিয়ে রাস্তার লাল ধুলো দেখতে পেচি। বোঝলম, পাড়াটো পেরিয়ে এসে গাঁয়ের ঠিক বাইরে বড় দিঘিটোর দখিন পাড় দিয়ে যেচি। শুকনো ডহরে হড় হড় করে গাড়ি নেমে আবার রাস্তায় উঠতেই আমি খোঁকাকে বললম, ছামনের কাপড়টো সরিয়ে দে তো বাপ।

কাপড় সরিয়ে দিতেই এমন ভালো লাগল সি আর কি বলব! সকালবেলার হাওয়া এসে গায়ে লাগল, জানটো যেন তর হয়ে গেল। ইদিকে নদীনালা তেমন নাই, শুদু ধানের জমি। বিরাম জমি লয়, সেই লেগে মাঠ ধু ধু করে না। ফসলি ধানের জমির মাঠ, তার কি অরম্ব, শ্যাষ নাই? যিদিকে তাকাই, চোখ যেচে যেচে যেচে, কোথাও আটকাবে না। উঁচু-নামো-ও নাই কোথাও। শ্যাষে অ্যানেক দূরে চোখ যেয়ে ঠেকছে কুনো একটো গাঁয়ে। মাথার ওপরের আসমানের মতনই মাঠের আসমান।

সেই সোমায় রাস্তাঘাট তেমন ছিল না। পাকা রাস্তা তো লয়-ই, কাঁচা সরান-ও লয়। মাঠের ওপর দিয়ে পায়ে-চলার রাস্তা চ্যাওড়া আলের ওপর দিয়ে। লোকে বলে পথ-আল। আর আছে গরু-মোষের গাড়ি চলার অ্যানেক অ্যানেক রাস্তা। কিলবিল করছে। এঁকে-বেঁকে হয়তো দশটো রাস্তার একটো যেয়ে গাঁয়ে ঢুকেছে। ইসব রাস্তা ধান-কাটার সোমায় জাড়কালে খুব ব্যবহার হয়েছে। অ্যাকন খরানির

কালে আস্তে আস্তে ঘাসে ঢেকে যেচে। শুদু একটো-দুটো রাস্তা এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ হয়ে মাঠের বুক চিরে কোথা গেয়েছে কে জানে! গাড়ি যেয়ে যেয়ে সিসব রাস্তায় খুব ধুলো। বাতাসে উড়ছে, আর বেশি বাতাস হলে ধুলোয় ধুলিষ্কার শাদা মেঘ হয়ে উড়ে বেড়াইচে।

মাঠের মাঝে এসে দেখলম, কুনোদিকে লোকজন দেখা যেচে না। অ্যাকন থাকবেই বা ক্যানে লোক? সেই মাঘ-ফাগুনে ধান কাটা হয়ে গেয়েছে। সব একফসলা রোয়া আমন ধানের জমি, ধান ছাড়া আর কিছু হয় না। ধান কাটার পরে জমি সব অ্যাকন ফাঁকা পড়ে আছে, নাড়াগুলিনও ধুলোয় ঢেকে গেয়েছে। আবার জষ্টি মাসে পানি হয়ে জমিতে বাত না হলে গরু-মোষের নাঙল নিয়ে মানুষ মাঠে নামবে না।

আমি তাই টপ্পরের দু-মুখের শাড়িই খুলে দিতে বললম। কে আর দেখছে? দুই পুত নিয়ে বাপের বাড়ি যেচি, ভয় তো কিছু নাই! সঙ্গে লোকও আছে। গাছপালা ইদিকে তেমন নাই বটে, তাই বলে বনকুল শেয়াকুল, র‍্যালপাতি ইসবের ঝোপ-ঝাড় কি নাই? আর আছে যিখানে সিখানে থ্যালানে থ্যালানে পুকুর। অ্যাকন শুকিয়ে কাঠ। দু-একটোয় সামান্য পানি আছে, অ্যাকটো-দুটো আছে বেশ পানিতে ভরা। সি পানি খাওয়া-ও যায়। ইসব মেঠো দিঘির পাড়ে বেরাট বেরাট বট-পাকুড় গাছ। তাদের ছেঁয়ায় খানিকক্ষণের লেগে গাড়ি থামিয়ে গরু-মোষের বিছ্রাম হয়। উদের পানি খাওয়ানো-ও হয়।

আমরা তা-ই করলম, অ্যাকটো বড় পাকুড় গাছের তলায় গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ান মোষদুটোকে পানি খাওয়াইতে নিয়ে গেল। আমি-ও কাঁকালটো একটু ছাড়ানোর লেগে ছেলেদুটোকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলম। দ্যাখলম, হলা বাগদি ত্যাল-চুকচুকে পাকা বাঁশের লাঠিটি বগলে রেখে দু-হাত জোড় করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয় কিছু নাই। জানি যি হলা বাগদি কুনো বেপদ এলে জানকে জান করবে

না, তাকে না মেরে আমার কি আমার সন্তানদের গায়ে কেউ একটো আঁচড় পয্যন্ত দিতে পারবে না।

আমি এট্টু ইদিক-ওদিক হাঁটছি, বড় খোঁকা বটগাছটোকে ঘুরে ঘুরে দেখছে কি কি পাখি আছে। দোপরবেলা, তাই পাখি ডাকছে না বটে কিন্তুক অত বড় গাছে অ্যানেক পাখি নড়েচড়ে বেড়াইছে বেশ বোঝা যেচে। গাছটো মনে হচে জ্যান্ত, কথা বলছে। গাছতলায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলম। হ্যাঁ, অ্যাকন মনে হচে, মাঠের ঠিক মাঝখানে এয়েছি। কুন্ দিকে কুন্ গাঁ তা আর বোঝা যেচে না। ধুলোয় লেপুটে গেয়েছে। অ্যাকন আসমানও লাগছে গোল, মাঠও লাগছে গোল। একটু ভয় লাগল, ক্যানে তা জানি না। খালি মনে হতে লাগল কুনো রাস্তাই আর শ্যাষ হবে না। কি করে কোথা শ্যাষ হবে কে বলতে পারবে? মনে হচে, ঘরবাড়ি পুকুরঘাট সবুজবন আর কি দেখতে পাওয়া যাবে! ইকথা মনে করে নিজের মনেই হাসলম। কতোবার ই পথ দিয়ে বাপের বাড়ি গেয়েছি। যতোদূরই হোক, পথ কি ফুরোয় নাই, মায়ের কাছে কি যাই নাই?

দোপর গড়িয়ে পেরায় বৈকালবেলায় একটো চটিতে পৌঁছুলম। আর গাঁ দূরে লয়। কিন্তুক চটিটো তেপান্তর মাঠের মাঝখানেই। ইদিকে-উদিকে দু-চারটো মেটেঘর। মোটে একটো-দুটো ভদ্রাসন। এমন জায়গায় কুনো গেরস্ত কি নিভ্ভয়ে থাকতে পারে? তবু এই তেপান্তরে বাস করছে দু-একটো পরিবার। আর মেটে ঘরগুলিন হচে দোকান— মুদির দোকান, হাঁড়িকুড়ির দোকান আর মিষ্টির দোকান। যতোবার আসি মিষ্টির দোকানে একবার গাড়ি থামে। ভাইবুনদের লেগে মিষ্টি লি, ছেলেপুলেরা খায়। মিষ্টি কি-ই বা আর পাওয়া যায়। রসগোল্লা, মন্ডা, জিবে-গজা, চিনির ছাঁচ, কদমা-বাতাসা এইসব। ছেনার মিষ্টি-রসগোল্লা আর মন্ডা খুব ভালো হয়। কুনো ভ্যাজাল থাকে না। উপয় থাকলে ময়রা লিশ্চয় ভ্যাজাল দিত, নিরুপায় হয়েই ভ্যাজাল দেয় না। ছেনা আর চিনি দিয়ে মিষ্টি, ভ্যাজালটো কি দেবে? খুব

বেশি হলে ছেনায় সুজি দিতে পারে। তা কতোটেই বা দিতে পারে আর সুজি তো খারাপ কিছু লয়। যাই হোক, ছেলেরা, গাড়োয়ান আর হলা বাগদি মিষ্টি খেলে। আমি রাস্তাঘাটে কিছু খাই না। ভাইবুনদের লেগে মিষ্টি নেওয়া হলো শালপাতার বড় বড় ঠোঙায়!

সাঁঝবেলায় মুখ-আঁধারি রেতে বাপের বাড়ি পৌঁছুলম। সাঁঝ বেলাটোর মুখে কুথাও যেয়ে পৌঁছুইতে আমার ভালো লাগে না। পিদিম ঘরে ঘরে, নাইলে হেরিকেন জ্বালাইচে, মিটমিট করে আলো জ্বলছে– কিছুই ভালো দেখা যেচে না, মনটো খারাপ লাগে, বৈকালি এসে পৌঁছুতে পারলে আমি ছেলেদুটিকে তাদের নানি-খালার কাছে রেখে পাড়া বেড়াইতে চলে য্যাতম, নাইলে পাড়ার লোকেরাই আসত বাড়িতে দেখা করতে– অ্যাকন আর তা হবার বাগ নাই।

বাড়িতে মা বাপজি ছাড়া এক ভাই, তিন বুন রয়েছে। সৎ-ভাইটো বেশ বড়সড়ো হয়েছে, দুটি বুনও অ্যানেকটো ডাগর হয়েচে। শুদু একটা বুন দুধের শিশু। আমার মা মরে গেলে কি হাল হয়েছিল ই সোংসারের– সব পেরায় ভেসে গেয়েছিল। সৎ-মা এসে আবার ভর-ভরন্ত সোনার সোংসার করেছে। শুদু একটো কথা আচ্চয্যি! বাপজি সি কালের হিসেবে বিদ্বেন লোক, বাংলা জানে, ফারসি জানে, ফারসি বয়েত পয্যন্ত লিখতে পারে, নিজে একটো শুভঙ্করি বই লিখেছে কিন্তুক ছেলেমেয়েদের ল্যাখাপড়ার দিকে ক্যানে তার মন নাই কে জানে! আমাকে নাহয় পাঠশালে পাঠায় নাই, মা মরেছে, ছোট ভাইটো কোলের, সোংসারে বেপয্যয় বেপদ, মেয়ের ল্যাখাপড়া না হয় না-ই হলো। তা বাদে মেয়েমানুষের আবার ল্যাখাপড়া কি, বারো হাত শাড়িতে মেয়েমানুষ লিকিনি ল্যাংটো, ইসব পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কুনোদিন তো জজ-ব্যালেস্টার হবে না, তাইলে তাদের আবার ল্যাখাপড়া শেখার কি দরকার? হ্যাঁ, বোঝলম ইকথা। কিন্তুক ভাইটো কি দোষ করলে? বড়টোর দায়ভার তো নিতে হয় নাই, আমার মামারাই সি ভার নিয়েচে। তাইলে ই ভাইটো ক্যানে ল্যাখাপড়া শিখবে

না? দেখলম সে আর স্কুলে যায় না। কুনোমতে পাঠশালের পড়া শ্যাষ করেছে। স্কুলে আর যায় নাই। তাকে শুদিয়ে জানতে পারলম, স্কুলে ভত্তি হতে টাকা লাগবে। বাপজি বলেছে টাকা আসবে কোথা থেকে! স্কুলে পড়ে কাজ নাই।

হঠাৎ একদিন ঠিক দোপরবেলায় ক-ক রোদে আমার ছোট ভাইটি এসে হাজির হলো। অ্যানেকদিন থেকে দেখি নাই। ইয়াকেই দু-বছরেরটি রেখে আমার মা দুনিয়া থেকে চলে গেয়েছিল। তাপর বেশিদিন আর বাপজির সোংসারে থাকতে হয় নাই তাকে। মামুরা এসে নিয়ে গেয়েছিল। তারাই তাকে বড় করবে, মানুষ করবে, যা যা করার সবই করবে। আপন লোকদের কাছেই গেল বটে ভাইটো কিন্তুক বাপজি ক্যানে ছেলে ছেড়ে দিলে, সি আমি ত্যাকনো বুঝি নাই, অ্যাকনো বুঝি নাই। অভাবের সোংসার লয়, কিছু লয়। লতুন সোংসার হয়েছে তাতেই বা কি, আমি বড় বুনটা তো আছি ভাইকে দেখার লেগে! তাইলে ছেলে দিয়ে দিলে ক্যানে? সে মামুদের কাছে চলে যাবার পরে আমার সাথে কমই দেখা হয়েছে, মামুদের গাঁয়ের পাঠশালে ভত্তি হয়েছিল। সেখানকার পড়া শ্যাষ হলে আমার শ্বশুরবাড়িতে কত্তার কাছে এয়েছিল। আমার কাছেই আসলে এয়েছিল। বললে, মামুরা তো আর পড়াইতে পারবে না। সে সোমায়ে উ গাঁয়ে বড় স্কুল ছিল না। ত্যাকনকার দিনে বড় স্কুল আর কটো ছিল? খুবই কম আর যে কটোই ছিল, অ্যানেক দূরে দূরে। সেই লেগে দূরের কুনো গাঁয়ে থাকা-খাওয়া থেকে স্কুলের মাইনে পয্যন্ত যি খরচ হবে তার জোগান দেবার খ্যামতা মামুদের নাই। তারা আর কিছু করতে পারবে না। ইসব কথা শুনে আমি কিন্তুক কিছুই বলি নাই। হোক মায়ের পেটের ভাই, তবু বাপের বাড়ির আত্মীয়। তার লেগে বলতে যেয়ে আমি ক্যানে শ্বশুরবাড়িতে দোষের ভাগী হব! শাশুড়ি-ননদ য্যাকন বেঁচে আছে। তা আমাকে কিন্তুক কিছুই বলতে হলো না। কত্তাই বললে, বেশি কথার লোক লয়, একটো কথাই বললে, আমি দেখছি।

তার পরের দিনই ভাইটিকে নিয়ে কত্তা বোরয়ে গেল আর সেইদিনই অ্যানেক রাতে একা ফিরে এসে বললে, ট্রেনে কাটোয়া যেয়ে সেখান থেকে দু-কোশ দূরের একটো গাঁয়ের এক নামজাদা ইশকুলে ওকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে আর এক মোকাদিম মোসলমানের বাড়িতে তার জায়গিরের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে। সে ঐ বাড়িতে থাকবে, খাবে, ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবে আর ইশকুলে নিজের পড়া পড়বে।

সেই থেকে সে ঐ ইশকুলেই পড়ছিল। কেমন আছে, কি খেচে আমি যি তার খুব খবর লেতম তা লয়। আমার শ্বশুরবাড়িতে সে আসত কমই। য্যাকন আসত সুবিদা-অসুবিদার কথা বলতেই আসত কত্তাকে। তাকে বাপের মতুনই মান্যি করত, ঠিক যেন বটবিরিক্ষের ছেঁয়ায় বসে আছে। ইশকুলের ছুটি হলে নানার বাড়িতেই চলে যেত বেশিরভাগ সোমায়– বলতে গেলে সিটোই তার নিজের বাড়ি। বাপজির কাছে বোধায় তেমন যেত না। সৎ-মা আছে বলে লয় কিন্তুক, বাপজির কারণেই মনে হয় তার উ বাড়ি যেতে মন করত না। সি যি মামুদের কাছে থাকে সিটি বাপজির পছন্দ লয়। সি যি এত কষ্ট করে ল্যাখাপড়া শিখচে সিটিও তার পছন্দ লয় অথচ নিজে কিছু করবে না তার লেগে।

তা সেই দোপরবেলা– কাকচিলের আওয়াজ নাই, আসমান থেকে আগুন ঝরছে, এমন সোমায় ভাইটি আমার বাড়ি ঢুকে ছামনে এসে দাঁড়ালে। অ্যানেকদিন দেখি নাই, হঠাৎ চিনতে পারলম না। কে এই ছেলেটি? গোরো ধপধপে, গোঁপদাড়ি অ্যাকনো হয় নাই, হবে-হবে করছে, কে গো এই ছেলেটি? তাপরেই তাকে চিনতে পারলম। দখিন-দুয়োরি উসারায় একটো মোড়ায় তাকে বসালম। মা এল, ভাইবুনেরা এল। মা আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে পাখার বাতাস করতে লাগল। বড় বুনটো শরবত করে আনলে। এই ভাই তো উদের সবারই বড়। শরবত-টরবত খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে সে যা বললে তাতে আমি

ভয় পেয়ে গেলম। তার ইশকুলের শ্যাষ ক্লাসের পড়া শ্যাষ, আর কমাস বাদে শ্যাষ পরীক্ষা। সি পরীক্ষা তো গাঁয়ের স্কুলে লয়, সি পরীক্ষা হবে কাটোয়া শহরে। অ্যানেক টাকা লাগবে। কে দেবে এই টাকা? মামুদের তো দুটো টাকা বার করারও খ্যামতা নাই। যি বাড়িতে থাকে, খায়– তারা তো আর টাকা দেবে না।

দামাদ-ভাই এত করেছে, যা করবার সব করেছে, তার কাছেই বা যাব কেমন করে। তাই বাপজির কাছে এয়েছি। বাড়িতে মরাই বাঁধা রয়েছে, একটা নয়, দু-দুটো– ক-মণ ধান বেচলেই তো পরীক্ষার ফি-র টাকা হয়ে যায়।

তা বেশ, বাপজি অ্যাকন বাড়িতে নাই, আসুক, দোপরের ভাত খা, বিছ্রাম কর, তারপর বলিস বাপজিকে।

আমার কথা শুনে সে জোরে মাথা নাড়লে। ভাত দোপরে সে খাবে না। বাপজিকে এগু বলে তাপর অন্য কাজ।

তাকে তো সবাই চেনে, কিছুতেই পয়সা খরচ করতে চায় না। যি লোকের এত বুদ্ধি, দুনিয়ার লোককে বুদ্ধি-ফুদ্ধি দেয়, টাকাপয়সা খরচের কথা উঠলেই সি লোকের বুদ্ধি কোথা যায় কে জানে! বাড়িসুদ্দু সবাই কাঁটা হয়ে থাকল, না জানি আজ কি অঘটন ঘটে।

খানিক বাদে বাপজি এল। ত্যাল মেখে গা ধুতে যাবে। অ্যামন সোমায় বড় ছেলে এসে ছামনে দাঁড়িয়ে মাথা হ্যাঁট করে বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। বাপজি তার দিকে তাকিয়ে ত্যাল মাখা বন্ধ করে ঠান্ডা গলায় শুদুলে, কিছু বলবে? কি বলবে বলো। এই কথা শুনে ভাইয়ের আমার গলা কাঁপতে লাগল, কথা ঠেকে ঠেকে যেতে লাগল। বহুত কষ্ট করে কুনোরকমে কথাগুলিন সে বললে। তাপর যেন তার সাহস এট্টু বাড়ল।

আমার পরীক্ষার ফল খুব ভালো হচ্ছে, এই শেষ পরীক্ষাতেও ফল ভালোই হবে। আমি কলেজে পড়ব, বি এ পাশ করব।

সব কথা শুনে বাপজি অ্যানেকক্ষণ চুপ করে থাকলে। মনে হলো

কুনো কথাই যেন সে শুনতে পায় নাই। ওমা, তাপর সে উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি থেকে গামছাটো তুলে কাঁধে ফেলে গা ধুতে যাবার লেগে উসারা থেকে নামতে নামতে বললে, ধান বেচা যাবে না। মরাইয়ে যে কটো ধান আছে তা সবারই মুখের গ্রাস। বেশি যা আছে, তা বেপদ-আপদের লেগে রাখতেই হবে। ধান বেচা যাবে না।

এই কথা বলে বাপজি শা-দিঘিতে গা ধুতে বেরিয়ে গেল। সে-ও গেল আর আমি দেখলম, ভাইয়ের আমার মুখটি লাল টুকটুকে হয়ে উঠল। কাঁদবার পাত্তর সে লয়, ঐ বাপেরই ছেলে তো, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে একপা-দু-পা করে এগ্‌নে পেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেচে, আমরা সবাই যেয়ে তাকে ধরলম। মা বললে, আর কিছু হোক আর না হোক, ভাতের ওপর রাগ করিস না, ভাত খেয়ে যা বাপ। মুখ ঘুরিয়ে ভাই ত্যাকন বললে, মা, তোমার ভাত হলে খেতম। এ যে আমার বাপের ভাত— যেদিন খাব জোর করে খাব, না হলে খাব না। এই বলে আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে চলে গেল। কিন্তুক বললে কেউ পেত্যয় যাবে না, গা ধুয়ে এসে সব শুনে বাপজি একটিও কথা না বলে খেতে বসলে আর রোজ যেমন খায়, তেমনিই খেলে। একটি ভাত যি কম খেলে তা লয়।

এই ঘটনার পরে দুটো দিনও পার হয় নাই, একদিন কত্তা এসে হাজির। বাপজি ত্যাকন বাড়িতেই ছিল। সোজা তার কাছে যেয়ে বললে, আপনার বড় ছেলের পরীক্ষার ফি-র টাকা লাগবে। নগদ টাকা আপনার কাছে নাই তা জানি। কিছু ধান বেচেই এই টাকা জোগাড় করতে হবে। বিপদ-আপদের কথা বলেছিলেন, ছেলের এইরকম বিপদের সময়েই তো এই ধান কাজে লাগবে।

কথা শুনে বাপজি চুপ করে রইল, মুনিষ বৈকালি আসবে মোকামে ধান বেচে বেলাবেলিই ফিরবে।

সিদিন দেখেছেলম, বাপের কথায় ছেলের মুখ কেমন রেঙেছিল, আজ দ্যাখলম জামাইয়ের কথায় শ্বশুরের মুখ কেমন রাঙা টুকটুকে

হলো। ই যি বাপজির ভায়ানক চাপা রাগ তা বুঝতে আমার বাকি থাকল না। কিন্তুক বাপজি একটি কথা বললে না– হ্যাঁ কি না একটি আওয়াজ বেরুল না তার মুখ থেকে।

বৈকালি লোক এল, মরাই ভাঙলে। গাঁয়ের কয়াল এয়েছিল, সে ধান মাপলে। কত্তা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে আর বাপজি দোপরে খেয়ে ঘরে ঢুকে ঘর আঁদার করে সেই যি শুয়ে থাকলে, একবার বেরিয়ে এল না। আমরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলম, কপাল পয্যন্ত লাজ কেড়ে সৎ-মা হেঁশেলের দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলে, সৎ-ভাই আর বুনগুনো ভয়ে কেমনধারা করে চাইতে লাগলে, কত্তা কিন্তুক কিছুই গেরাজ্যি করলে না।

গাড়ি বোঝাই করে য্যাখন ধান মোকামে বেচতে নিয়ে যেচে, কত্তাও ত্যাকন আর থাকলে না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। মা তাকে কিছুই বলতে পারলে না, রাতটো থেকে যেতে বলবে কি কিছু, সিকথা মুখ দিয়ে বার করতেই পারলে না। অ্যামন রাশভারি মানুষ ছিল উ। কত্তা য্যাকন চলেই গেল, মা ত্যাকন হেঁশেল থেকে বেরিয়ে বাপজির ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলে। আমিও কি মনে করে মায়ের পেচু পেচু আসছেলম। দরজা পয্যন্ত এয়েচি, কানে এল বাপজি বলছে, আমার মরাই ভেঙে আমারই ছেলেকে যখন সে পর করে দিলে, ওর ছেলেকেও আর বেশিদিন স্কুলে যেতে হবে না–

হায় কি বললে, হায় কি বললে, ওগো, হায় কি বললে– দড়াম করে আমি মাটিতে আছড়ে পড়লম, হায়, ই কি বললে? কই, আমার মানিকরা কই, আমার জাদুরা কই! ওমা, আমি এখুনি বাড়ি যাব, আমার বুকের ধন মানিকদের নিয়ে এখুনি বাড়ি যাব। ই বাড়িতে আর এক দণ্ড লয়। এই রেতেই যাব।

সেই রেতে কি আর আসা হয়? সারারাত কিছুই খ্যালম না, পানি পয্যন্ত লয়, কারও সঙ্গে একটি কথা বললম না, দু-চোখের পাতা একবার এক করলম না, দুই ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাতটো

কাটিয়ে সকালবেলাতেই শ্বশুরবাড়িতে ফিরে অ্যালম। মা ভাই বুন সব আসার সোমায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে, চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে কিন্তুক একটি কথা কেউ উশ্চারণ করতে পারলে না।

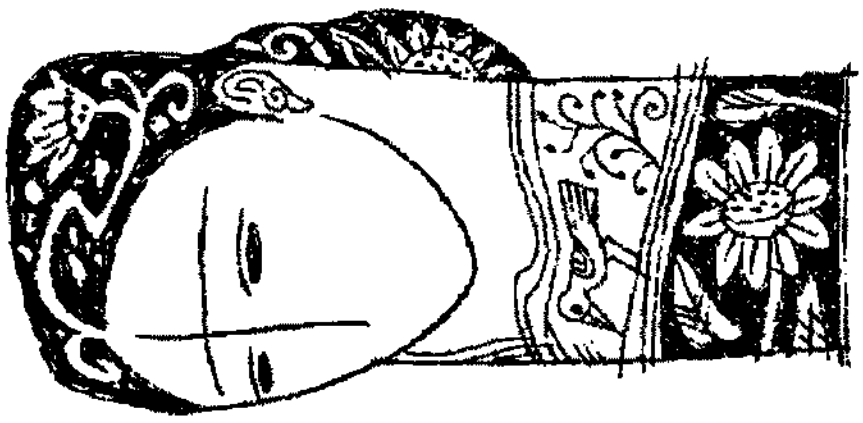

ছেলে চলে গেল শহরে

ফিরে এসে শ্বশুরবাড়িতে কাউকে কিন্তুক সিসব কথা কিছুই বলি নাই। শুদু বললম, ছেলেদের আর মন টিকছিল না, স্কুলও খুলবে তাই চলে অ্যালম। কত্তা কিছু বুঝেছিল কিনা জানি না। কিছুই শুদোয় নাই আমাকে। উ তো কিছু শুদোবার মানুষ লয়! শাশুড়ি-ননদও কোনো কথা বললে না।

বাড়ি এসে শোনলম, বড় খোঁকার গাঁয়ের স্কুলে ল্যাখাপড়া ভালো হচে না। উকে শহরের বড় স্কুলে নিয়ে যেয়ে ভত্তি করা হবে। আমার ছোট দ্যাওরটো পড়েছিল শহরের যি স্কুলে সিখানেই পড়তে যাবে খোঁকা। দ্যাওরের ত্যাকন স্কুলের পড়া শ্যাষ হয়েছে। সে আর আমার ছোট ভাইটি তো একসাথেই শ্যাষ পরীক্ষা দেবে। মেট্রিক না এনট্যান্স কি পরীক্ষা যেন। আর এই পরীক্ষার লেগেই আমার বাপের বাড়িতে এত ধুন্দুমার কাণ্ড হয়েছিল। সেই পরীক্ষা হয়ে গেলেই দ্যাওর চলে আসবে বাড়িতে। তা বাদে পাশ যেদি দিতে পারে, তাইলে কলেজে পড়বে। স্কুলের কাছে যে বোর্ডিংয়ে থাকত, সেই জায়গাটো খালি হচে। বড় খোঁকা সেইখানে থাকবে আর সেই স্কুলে পড়বে।

খরবটো শোনা অব্দি কি যি হতে লাগল বুকের মদ্যে! সি আর

কাকে বলব? পাখি এইবার বাসা ছেড়ে উড়ে যেচে। আর কি বাসায় ফিরবে মায়ের বুকের তলায়, আর কি নিশ্চিন্তে ঘুমুবে? কিন্তুক আমার বড় খোঁকা উড়বে কি, তার তো অ্যাকনো পাখাই হয় নাই। অত বড় ছেলে, অ্যাকনো খাইয়ে দিতে হয়। আমি না দিলেও দাদি, ফুফু, নাইলে কুনো চাচি খাইয়ে দেয়। আজকাল কারু কাচে খেতে চাইছে না কিন্তুক নিজে খেতে গেলে ফেলে ছড়িয়ে একাকার। উ ছেলে কি সত্যি বড় হয়েছে, কেউ কাছে ডাকলে একেবারে বুকের কাছে চলে যায়, কেউ অ্যাকটো ধমক দিলে মুখটো শুকিয়ে কেমন হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি কুনো কাজ করতে বললে এমন হাঁপুচাপু করে যি দেখলে মায়া হয়। ছেলে যেন দুনিয়ার সবার কাছে অপরাধী হয়ে আছে। মুখে কথা নাই, দু-একটো কথা যা বলে তা আবার শোনাই যায় না। ই ছেলে কি করে বিদ্যাশ-বিভুঁইয়ে থাকবে? মাথায় নোম্বা অ্যানেকটো হয়েছে বটে, দীঘল শরীল, কাঁচ-পরানি গায়ের রঙ, টানা দুটি চোখ যেন ঘুমিয়ে থাকার মতুন।

কেউ কি উকে বড় হতে দ্যাখে? একটু একটু করে কেমন বাড়ছে? পিতি রেতে চাঁদের বাড়ার মতুন। জামা-পেন্টুলুন ছোট হয়ে যেচে, খালি গায়ের পাঁজর বোঝা যেচে– ইসব কি কেউ দ্যাখে? আমি যি দেখি। দূর থেকে দেখি, কাছ থেকে দেখি। খোঁকা কুনোদিন জানতেই পারে না। উসারার এক কোণে জানেলার ধারে বসে একমনে বই পড়ছে, কাজ করতে করতে একবার একবার থেমে আমি একদিষ্টে খোঁকার মুখের দিকে দেখি। চোরের মতুন দেখি। যেই বই থেকে মুখ তুলে ইদিকপানে তাকিয়েছে, অমনি আমি যেন কতোই না কাজে মন দিয়েছি!

বড় খোঁকা য্যাতোদিন ছোট ছিল, কুনোদিন দেখি নাই যি কত্তা ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখলে। ছোট ছেলেমেয়ে, কি আমার কি অন্য মানুষের, সে কুনোদিন ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারত না। আমি মনে করতম, মানুষটো কি পাষাণ! তা সেই কত্তাই আমার কাছে একদিন ধরা পড়ে

গেল। দেখলম, আড়াল থেকে ছেলেকে দেখছে। সি যি এমনি দেখা লয়, তা আমি কত্তার দু-চোখের তাকানো দেখেই বোঝলম।

তা যাকগো, ইসব কথা আর বলে কি হবে। ছেলের শহরে যাবার দিন এগিয়ে এল। পরীক্ষা লিকিনি দ্যাওর আর আমার ভাই একসাথেই দেবে। আজকালেই বড় খোঁকাকে স্কুলে ভত্তি করে দিয়ে আসতে হবে। দেরি হলে হবে না।

যিদিন সকালে যাবে সিদিন আর হেঁটে ইস্টিশনে যাবে না। এমনিতে কত্তা হেঁটে যেয়েই ইস্টিশনে টেরেন ধরে, আজ ছেলে নিয়ে বিশেষ কাজে যেচে, সেই লেগে মোষের গাড়ি করে যাবে। ছেলের লতুন জামা-পন্টুলুন হয়েছে, সকালেই গা-ধোয়া হয়েছে, জামা-কাপড় পরা হলে, ওর বাপ মাথা আঁচুড়ে দিলে। আমার কি যি মন হতে লাগল ছেলের চোখে কাজল দিয়ে দি, তা ধমক খাবার ভয়ে সি কথা বলতেই পারলম না।

যাবার সময় হলে দাদি, ফুফু, চাচা, চাচিরা এল, সবাই খোঁকার মাথায় হাত দিলে, কপালে চুমু খেলে, দাদি-ফুফুর চোখে পানি এল কিন্তুক আমি কিছুই করতে পারলম না। বুকে কি যেন আটকে গেয়েছে। পাথর লিকিনি, কই কাঁদতেও যি পারচি না! চারদিকে কি হচে কিছুই বুঝতে পারচি না, সব ছেঁয়া ছেঁয়া। কত্তা খুব তাড়া দিতে লাগল। এও তার ছল। কেঁদেকেটে একাকার করে যাবার সোমায়টো না লষ্ট করে ফেলে কেউ, এই লেগে সে অমন তাড়া দেয়। খোঁকাকে নিয়ে সবাই ঘর থেকে বেরুবে, এমন সোমায় খোঁকা টুক করে আমার কাছে এল। একদম বুকের কাছে এসে বললে, মা যেচি। চোখের পানিতে সব এমন ছয়লাপ হয়ে গেল যি, হ্যাঁ বাপ, যাও, ই কথাটিও বলতে পারলম না।

গাড়ি খামার পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলে একটো তরাস এসে বুকে ঢুকল। কিসের যি তরাস তা জানি না। কিন্তুক শুনলে কেউ পেত্যয় যাবে না, সেই তরাস আমার সারা জেবনেও আর গেল না।

কত্তা ফিরে এল সেইদিনই অ্যানেক রেতে। এমন আঁদার রেতে ইস্টিশন থেকে এক কোশ পথ হেঁটে কেমন করে যি বাড়ি এল, সি সেই-ই জানে। রাস্তা নাই, মাঠঘাট ভেঙে আসতে হয়। সাপ-খোপে ভরা ই জায়গা। কিন্তু কুনো ভয়-ভিত ছিল না উ মানুষের। হেরিকেন নিয়ে কেউ এগিয়ে আনতেও তো যেতে পারত ইস্টিশনে! তা-ও কাউকে করতে দেবে না।

বড় খোঁকা সিদিনই স্কুলে ভত্তি হয়ে গেয়েছে। বোর্ডিংয়ে থাকার বেবস্থা-ও হয়েছে। বড় খোঁকার চাচা, আমার ছোট দ্যাওর, অ্যাকন-ও তো রয়েছে, তার পরীক্ষা শ্যাষ হয় নাই, শ্যাষ হলে তার জায়গাতেই থাকবে ছেলে– এইসব ঠিক করে এয়েছে কত্তা। দেখলম, তার মনে খুব আনন্দ। ছেলের ল্যাখাপড়ার ভালো বেবস্থা হয়েছে। সে একদিন নিশ্চয় জজ-ম্যাজিস্টেট হবে! ইদিকে আমি কি করি, কি করে থাকি, কি করে বাঁচি! সারা দিনে যেদি একবারও তার মুখটো দেখতে না পাই, তাইলে কি বাঁচতে পারি, হায়!

কেমন কপাল, ঠিক পরের দিনই দোপরের আগে লোক এসে খবর দিলে আমার ছোট ননদের সংকট-ব্যায়রাম। আবস্তা খুব খারাপ হয়েছে। এই খবর নিয়ে রাত থাকতে থাকতে গাঁ থেকে রওনা হয়েছিল লোক। পড়ি-মরি পাঁচ কোশ রাস্তা এসে খবরটো কুনো পেরকারে দিতে পারলে। আমার এই ছোট ননদটি যেমন সোন্দরী, তেমনি ভালোমানুষ। ভারি মিষ্টি স্বভাব আর কি সেবা যি করতে পারত মানুষের! সি আবস্তাপন্ন বড় ঘরেই পড়েছিল। আমার পরের খোঁকার জন্মোর দু-এক বছর আগেই তার একটি খোঁকা হয়েছে, আর এই বছরটাক আগে আরও একটি খোঁকা এয়েছে তার কোল জুড়ে। ভরা সুখের সোংসার– ইয়ার মদ্যে এই মরণ-অসুখের খবর!

খবর শুনে কত্তা কি যি অস্থির হয়ে পড়ল সি আর কি বলব। বড় বড় আপদ-বেপদেও যি লোক স্থির থাকে, মাহা ভয় পেলেও যি লোককে দেখে সবাই সাওস পায় সেই লোক কি যি খ্যাপাখেপি

করতে লাগল!

আমি এখুনি যাব, আমার ঘোড়া ঠিক করতে বলো, এক কাপড়ে যাব।

কথা বলতে বলতে কত্তা ছুটে বাড়ির মদ্যে ঢুকে মা-বুনকে শুদু যেচে এই কথাটি জানালে। শাশুড়ি ননদ পাথরের মতুন দাঁড়িয়ে থাকলে, ভাইরা যারা বাড়িতে ছিল, একটি কথাও কেউ বলতে পারলে না– কত্তা শুদু ধুতি-জামাটো বদলে আর মনে হলো বাক্‌সো খুলে য্যাতো জমা টাকা ছিল সব বার করে নিয়ে খামারে যেয়ে দাঁড়াইলে। ত্যাতোক্ষণে ঘোড়ায় জিন পরানো হয়ে গেয়েছে, মাহিন্দারটি লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর কুনো কথা না বলে কত্তা যেয়ে ঘোড়ায় উঠল। ঘরের ভেতর থেকে শুদু ঘোড়া ছোটার আওয়াজ প্যালম।

ওমা, ই কি কাণ্ড, সিদিনই রাত দোপরে দেখি কত্তাকে নিয়ে ঘোড়া ফিরে এয়েছে। খামারের দিকে পরচালির ছামনে ঘোড়াটো কখন দাঁড়ালে তা কিছুই বুঝতে পারি নাই। একবার যেন অ্যাকটো হিঁ হিঁ আওয়াজ প্যালম। দরজা খুলে বেরিয়ে আঁদারের মদ্যে দেখি, ঘোড়া কেমন ছটফট করচে আর তার পিঠে বসে মাতালের মতুন দুলছে অ্যাকটো মানুষ। সাথে সাথে আমি বুঝতে পেরেচি আমার সব্বোনাশ হয়েছে। ত্যাকন একবার এমন চেঁচিয়েছেলম যি বাড়ির সবাই হাউমাউ শোর করে জেগে উঠল। ঘরের হেরিকেন হাতে নিয়ে বাইরে এসে দেখি সবাই খামারে এসে গেয়েছে। ঘোড়া আর ঘোড়ার পিঠে সওয়ারি ত্যাকনো টলমল করে দুলছে। দ্যাওর-রা সব ছিল, ভাশুরও রয়েছে– সবাই ছুটে যেয়ে কত্তাকে ধরলে। ঘোড়া ত্যাকন হাঁটু দুমড়ে বসে পড়েছে। কত্তার জামা-কাপড় ছেঁড়া, সারা গায়ে ধুলো-কাদা, শরীরের নানা জায়গা ছিঁড়ে ফেটে গেয়েছে, সেইসব জায়গা থেকে রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। ঘোড়ার আবস্তা আরও কাহিল। তারও সারা গায়ে কাদা মাখা, ইখানে-ওখানে রোঁয়া উঠে গেয়েছে, রক্ত ঝরছে তারও দ্যাহ থেকে। তা-পরে যা ঘটল সি কথা মনে হলো অ্যাকনো আমার সারা গায়ে

কাঁটা দেয়, দমটো আটকে আসে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলম, বেশি সোমায় গেল না ছটফট করতে করতে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা তুলে ঘোড়াটা যেন কলজে ফেটে মরে গেল। কিন্তুক ত্যাকন তাকে নিয়ে কে ভাবে। কত্তাকে নিয়েই তো কান্নাকাটা পড়ে গেল।

কত্তা শ্যাষ পয্যন্ত সুস্থির হলো বটে কিন্তুক আজও জানি না কেমন করে এই মাহাবেপদ পার হয়েছেলম। যাবার পথে ঘোড়াকে একবার থামতে দেয় নাই কত্তা। সপাৎ সপাৎ করে খালি চাবুক মেরেছে, আর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, মাঠের ভেতর দিয়ে, আমবাগান কলাবাগানের মদ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে। থামতেও দেয় নাই, মাঠের পুকুরে পানি খেতেও দেয় নাই, একবার কুনো বটপাকুড়ের ছেঁয়ায় দাঁড়ায়ও নাই। এই করে ঠিক বৈকালবেলায় বুনের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে বড় দিঘির উঁচু পাড়ে যেয়ে সে দাঁড়ালে। বাড়িটোকে ওখান থেকে দেখা যায়। দোতলা মাঠকোটাটো-ও দেখা যেছিল। গাঁয়ের একমাত্র টিনের চালের বাড়ি। ঘোড়া থামিয়ে একদিষ্টে কত্তা চেয়েছিল জানের জান ছোট বুনের বাড়ির দিকে। ত্যাকন বহু লোক যেছিল সিদিকে। শুদু একজনা এয়েছিল কত্তার কাছে। কত্তা তাকে কিছুই শুদোয় নাই, তবু সে বলেছিল, উদিকে তাকিয়ে কি দেখছেন— উ বাড়ির বড় বউটি এই খানিক এগু মারা গেয়েছে।

কত্তা আমাকে পরে বলেছিল, লোকটোর একটো কথাও ত্যাকন সি বুঝতে পারে নাই। চুপ করে তার দিকে এমন করে চেয়েছিল যি, সে ভয় খেয়ে গেল আর যি কথা বলেছিল, সি কথাটো আরও একবার বলেছিল। কত্তা তেমনি করেই দাঁড়িয়ে। তা-বাদে কেমন করে কি কথা মাথায় ঢুকল সে বলতে পারবে না, শুদু একটো কথা মাথায় যেন চিরিক করে উঠল, ইখানে আর লয়, উ বাড়িতে যাব না, যাব না, হরগিজ যাব না, বুনের মরামুখ আমি দেখতে পারব না। ঘোড়ার মুখটি ফিরিয়ে চাবুক কষে তাকে ছুটিয়ে দিয়েছিল কত্তা।

এমন ঘটনা ঘটে গেল সোংসারে, তবু একটো দিন কি থেমে

থাকলে? দিন ঠিকই চলে গেল। মানুষের সয় না কি? সোমায়ে সবই সয়। দুনিয়াদারির দায় কি ঠেকানো যেচে? সেই কাজ করতে হবে, খেতে হবে, শুতে হবে, ঘুমুতে হবে– কোন্‌টো বাদ যেচে? শোক একটু সয়ে এলে মাস তিনেক বাদে কত্তা দুই ভাগ্নেকে ই সোংসারে চেয়ে নিয়ে এল। বুন গেয়েছে, গেয়েছে, তার তো আর কুনো চারা নাই। ভাগ্নেদুটির একটি পাঁচ বছরের আর একটি দ্যাড় বছরের। দুটিই খোঁকা। ফুটফুটে রাজপুত্তুরের মতোন এই দুই খোঁকাই হলো বুনের চেহ্ন এই দুনিয়ায়। চোখ-মুখ চেহারায় বুনের কথাটি মনে পড়ে। অ্যাকন থেকে ওরা ই বাড়িতেই মানুষ হবে। বড় হলে যা তাদের মন চায়, তারা তাই করবে। যেতে চাইলে নিজেদের সোংসারে ফিরে যাবে।

ছেলেদুটিকে আনতে তেমন কুনো বাধা হয় নাই। বিরাট আবস্তা হলেও বুনটির শ্বশুরবাড়িতে লোকজন তেমন নাই। ছোট ভাই নিঃসন্তান। জানাই গেয়েছে আর ছেলেপুলে হবে না। ইদিকে দুই সন্তান রেখে বড় বউ চলে গেয়েছে দুনিয়া ছেড়ে। লতুন করে আবার বিয়ে-থা সোংসার করার কুনো ইচ্ছা নাই বড় ভাইয়ের। তাইলে নাবালক ছেলেদুটিকে দেখে কে? কত্তা বাপ-চাচাকে এইসব বুঝিয়ে ভাগ্নে-দুটিকে এনে নিজের সোংসারের বিধবা-বুন, আমার মেজ ননদের কাছে ফেলে দিলে। বললে, এরাই এখন তোর দুই ছেলে। এদের তুই মানুষ কর। কথা শুনে বিধবা-বুন– কতো ভুক-পিয়াসি ছিল– ছেলেদুটিকে বুকে টেনে নিলে। ই বাড়ির আর সব ছেলেপুলের মতো তারাও বড় হতে লাগল।

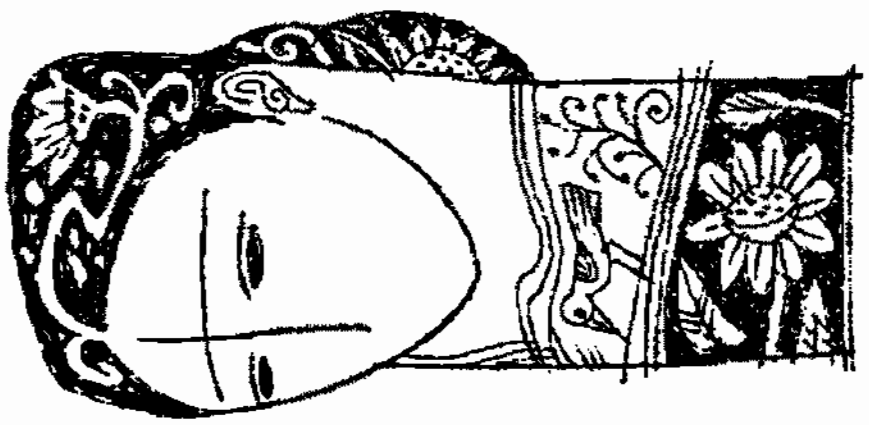

সব গোলমাল লেগে যেচে

সোয়ামি পুত্তুর ননদ শাশুড়ি দ্যাওর ভাশুর ইদের নিয়ে সোংসার করি। সেই ভোর ভোর ঝুঝকিবেলায় উঠি, সুয্যি ত্যাকনো দেখা দেয় নাই। সেই শুরু, সারা দিনে একবার কামাই নাই। কাজ কাজ। রেগেমেগে বলি রাবণের গুষ্টি। ঘর-দুয়োর পোষ্কার রাখো, কুটনো কোটো, বাটনা বাটো, রাজ্যের রাঁধন রাঁধো, চাকর মুনিষ মাহিন্দার সবাইকে খাওয়াও। ই আবার এক সুখও বটে! আমরা বউ-ঝিরা য্যাকন খেতে বসছি, সুয্যি ত্যাকন পাটে বসতে যেচে, রোদ লি লি করচে। এমনি করে দিন কাটে, দ্যাশ-দুনিয়ার আর কি খবর রাখব? নিজের দুটো ছেলের একটো শহরে বোডিংয়ে থাকে, তাকে ন-মাস ছ-মাসেও একবার দেখতে পাই না, আর একটো যে কখন খেচে, কখন ঘুমুইচে তার কিছুই জানি না, সি জানে তার ফুপু। বাড়িতে অ্যাকন ছেলেপুলে বেড়েচে। মনে হচে সেজ বউয়ের আবার ছেলেপুলে হবে। আমার ননদটির হাত এতদিন ফাঁকাই ছিল, তার কাজ ছিল হালকা। অ্যাকন আর তা লয়, তার বুনপোদুটো সোংসারে এয়েছে, আমার খোঁকা রয়েছে, সেজর খোঁকা রয়েছে– সব অ্যাকন ঐ ননদকেই দেখতে হবে। কেউ বসে নাই, সবারই কাজ।

সব কাজ সেরে য্যাকন শুতে যাই, কত্তা দ্যাশ-ঘরের কথা দু-চারটে বলে বটে, তার কিছুই বুঝতে পারি না। অক্ষর শিখেছেলম, বই পড়তে শিখেছেলম, বানান করে খবরের কাগজ পড়তে পারতম, বুঝতেও পারতম, অ্যাকন মনে হচে সব ভুলে গেয়েছি। মনে করেছেলম কত্তাকে একদিন শুদোব সেই কুন দ্যাশের খলিফার চাকরি অ্যাকনো আছে না গেয়েছে, সি আর শুদনো হয় নাই। বিছেনায় শুই আর মরার মতুন ঘুমিয়ে পড়ি। কখন শুদোব!

ইদিকে কত্তার গতিক সুবিধে মনে হচে না। পেরায় দিন শহরে যায়। ভোরবেলায় যায় আর এক দণ্ড রেতে ফেরে। গাঁয়ে খুব কমই

থাকে। ইশকুলে যাওয়া কি ছাড়লে? আর কত্তামার বাড়ি যি কমই যাওয়া হচে সি তো দেখাই যেচে। বাড়িতে আন্‌কা লোকজন আসা অ্যাকন অ্যানেক বেড়েছে। কত্তা আগে কথাবার্তা ত্যাতো বলত না, বরং কিছু শুদুলেই কেমন খেঁকিয়ে উঠত। অ্যাকন দেখছি নিজে থেকেই এটো-ওটো কথা বলে। যিদিন যিদিন লোক আসে বাড়িতে সিদিন শহরে যায় না। তাইলে লোকজন লিশ্চয় বলে-কয়েই আসে আর যারা আসে তারা যে-সে লোক লয়, তা তাদের চেহেরা, জামা কাপড়, পোশাকআশাক দেখেই বোঝা যায়। আড়াল থেকে অ্যানেকদিন দেখেচি, খাবার বানিয়ে কাউরির হাতে পাঠিয়ে দিতে যেয়ে চোখে পড়েছে উসব মানুষদের। হিঁদু ভদ্দরলোক তো আসেই, আজকাল দেখি যেন মোসলমান মিয়ে-মোকাদিম এট্টু বেশি বেশি আসছে। বড় বড় পাগড়ি দেখতে পাই, হেঁটো পয্যন্ত আলখেল্লা গায়ে দিয়ে আসে কেউ, কারু কারু নোম্বা দাড়ি, বাবরি চুল। কারা ইয়ারা? কি করছে, কাদের নিয়ে আছে কত্তা– এইসব কথা ভেবে ভেবে মরি।

একদিন হঠাৎ কত্তা আমাকে শুদুইলে, আচ্ছা, হিন্দু-মুসলমানে তফাত কি বলো তো শুনি। ই আবার কি কথা? ইসব তো কুনোদিন ভাবি নাই, ভাবতে হবে বলে কুনোদিন মনেও করি নাই। কত্তার কথা শুনে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলম। দেখি সে মিটি মিটি হাসছে। কত্তার ই রূপ তো কুনোদিন দেখি নাই। একটু পরে সে বললে, এত কষ্ট করে যে পড়তে লিখতে শিখলে তা দিয়ে কি তোমার কোনো কাজই হবে না?

কথা শুনে আমার রাগ-ও হলো দুঃখ-ও হলো। কি কথা বলছে এই মানুষ? সকাল থেকে রেতে বিছানায় শোয়া পয্যন্ত তার সোংসারের ঘানি টানছি, চোখে বেঁধেচি ঠুলি, কানে দিয়েচি তুলো, পিঠে বেঁধেচি কুলো, দোপরের খাওয়া খেতে বসি সাঁঝবেলায় আর সে কিনা বলে লেখাপড়া শিখে আমি কি করলম! রাগে আমি গুম মেরে থাকলম, অ্যাকটো কথা বললম না। একটু সোমায় যেতে কত্তা

বললে, হিন্দু-মুসলমান সব এক হয়ে এই একবারই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নেমেছিল। মোসলেম জাহানের খলিফাকে তাড়ানো যাবে না বলে কতো কি করেছিল! শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে জানো? ব্রিটিশদের কিছুই করতে হয় নাই। সে দেশের মুসলমানদের এক নেতাই খলিফাগিরি খতম করে দিয়েছে। এখন এ দেশের হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাই করুক সব বেকার। দাবিই তো আর কিছু নাই। সব ছত্রখান হয়ে গেল। আবার সেই হিন্দু-মুসলমানের নিজের নিজের দাবি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছে। তাতে তো বিদেশীদেরই পোয়াবারো। সেইজন্যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, হিন্দু-মুসলমানে তফাত কি? এইবার বুঝতে পেরেছ?

কত্তা তো শুদুইলে কিন্তুক আমি কি বলব কিছু খুঁজে পেচি না। সত্যি সত্যি, ই কথা নিয়ে কুনোদিন ভাবি নাই। তবে বলছে য্যাকন, ত্যাকন নাহয় এট্টু ভেবেই দেখি। ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদের গাঁয়ে মোসলমান ছিল বেশি, হিঁদু ছিল কম। আর আমার শ্বশুরবাড়ির এই গাঁয়ে হিঁদু বেশি, মোসলমান কম। ই হলো গাঁয়ে গাঁয়ে তফাত। তবে সেই তফাতের লেগে উ গাঁয়ে আমাদের কুনো অসুবিদা হয় নাই, ই গাঁয়েও কুনো অসুবিদা নাই। মারামারি হরহামেশা হিঁদুতে হিঁদুতে হচে, মোসলমানে মোসলমানে হচে, আবার হিঁদু-মোসলমানেও হচে।

মনে করে দেখলম, বিয়ের পরে কত্তামার কাছে গ্যালম। সি তো বড়লোক হিঁদুর বাড়ি। কত্তামা সারা গায়ে গয়না পরিয়ে দিলে। একবারও মনে হয় নাই হিঁদুতে গয়না পরিয়ে দিচে। মনে হয়েছিল ঠিক যেন আপন মেয়েবউকে জান ভরে মা গয়না পরাইচে। দ্যাখো দিকিনি, তেমন মনে না হলে কি গয়না গায়ে রাখতে পারতম? গা যি আগুনে পুড়ে যেত। আর যেদি বলো উ হচে বড়লোকের গুমর, তা হতেও পারে। সি তো বড়লোক মোসলমান মিয়ে মোকাদিমের গুমরও হতে পারে। তাপরে দেখছি, হিঁদু কামার কেস্তে কাটারি কুড়ুল বানিয়ে দিচে, লাঙলের ইশ, ফাল তৈরি করে দিচে, হিঁদু ছুতোর মিস্ত্রি

দরজা জানলা তৈরি করে দিচে, হিঁদু নাপিতবউ এসে দু-পা ভিজিয়ে কতো যত্ন করে হাত-পায়ের নোখ কেটে দিচে, হাড়িবউ এসে সোমায় সোমায় রাত জেগে সন্তান খালাস করে দিয়ে যেচে। সারা জেবন সে সন্তানের মায়ের মতুনই থেকে যেচে। কই হিঁদু বলে তো কিছুই আটকাইচে না, সব কাজই হচে। উদিকে মোসলমানরা চাষের কাজ করছে, মুনিষ খাটছে, মোসলমান রাজমিস্ত্রি স্কুল বোডিং বানাইচে, মোসলমান করাতিরা কাঠ চেরাই করচে, ঘর ছাইয়ে দিচে, সবাই সব কাজ করচে। তফাত কোথা হচে আমি বুঝতে পারচি না। তবে হ্যাঁ, কতকগুলিন কাজ মোসলমানরাই বেশি করে, কতগুলিন কাজ হিঁদুরা বেশি করে। ই গাঁয়েরই স্কুলে একজনাও মোসলমান মাস্টার নাই। ওস্তাদজি তো ইস্কুলের মাস্টার লয়। চাষাভুষো মুনিষ মোসলমানই বেশি। ক্যানে তা কি আর আমি জানি! যাদের ভদ্দরলোক বলে মোসলমানদের মদ্যে ই এলেকায় তারা এট্টু কম। আবার অন্য এলেকায় হয়তো শ্যাখ্ সৈয়দ পাঠান অ্যানেক আছে।

তা সি যা-ই হোক, হিঁদু-মোসলমানে তফাত আছে কি নাই তা নিয়ে এত ভাবনার কি দরকার? সি তো ধম্মে ধম্মে অ্যানেকই তফাত। কেরেস্তানদের সাথে হিঁদুদের তফাত নাই? কেরেস্তানদের সাথে মোসলমানদের নাই? বলে হিঁদুতে হিঁদুতে কতো তফাত তারই ঠিক নাই! মুসলমানে মুসলমানে কি তফাত নাই? এক সোংসারে একজনার সাথে আর একজনার কতো তফাত। উসব নিয়ে ভেবে লাভ আছে?

আমি কিন্তুক কত্তাকে ইসব কথা একটো-ও বলি নাই। আমি চুপ করে ভাবছেলম— দেখি সে যেদি কুনো কথা বলে। বললে শেষ পয্যন্ত।

হিন্দু-মুসলমান এখন নিজের নিজের হিসেব নিয়েই আছে। খালি হিসেব কষচে। হিন্দু-মুসলমান একবার এক হয়েছিল তুর্কির খলিফার দাবিতে। সে দেশের মানুষ নিজেরাই খলিফাগিরি বন্ধ করে দিয়েছে। বাস— হিন্দু-মুসলমান আর একসাথে থাকার দরকার কি? একটা বড় দাঙ্গা পর্যন্ত হয়ে গেল সেদিন। ব্রিটিশরা এখন খালি ফাঁদ পাতছে,

খালি ফাঁদ পাতছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কেমন করে কিসব ভাগাভাগি হবে তার লিস্টি বার করেছে।

আমি খুব ভয় পেয়ে গ্যালম। ইসব নিয়ে কত্তা তো আগে কুনোদিন কথা বলে নাই। তবে কি সে অ্যাকন থেকে উসব নিয়েই থাকবে? আমার যেমন ভয় হলো, তেমনি রাগও হলো। এট্টু দাঁড়িয়েচে সোংসার, জমি-জোমা হয়েছে, ঘরবাড়ি সহায় জন মুনিষ রাখাল হয়েছে, নিজের হাতে আর কাউকে কিছু করতে হয় না, খাওয়া-পরার অভাব নাই। মনের মদ্যে চিন্তা নাই— অ্যাকন এট্টু দ্যাশদুনিয়া নিয়ে থাকলে ক্ষেতি কি? এই হলো কত্তার মনের ভাব। কিন্তুক আমি ভাবি কি দরকার ইসবের? জেবন সব্বারই নিজের নিজের, নিজের ছেলে-পুলে, মা, বোন-ভাই-বেরাদর নিয়ে সোংসার। তার বাইরে যাবার কি দরকার? কে কিসের পিতিকার করতে পারে বলো দিকিনি! ই গাঁয়ের জমিদার ছিল রায়েরা, তারা অ্যাকন ভিক্ষে করছে আর আমরা কিনে নিয়েছি তাদের জমি। তারা হিঁদু, আমরা মোসলমান। কত রকম হিঁদু আছে, কত রকম মোসলমান আছে। ক্যানে ইসব ভাবতে হবে? বিটিশরা অ্যাকন আছে, চেরকাল ছিল না, আবার চেরকাল থাকবেও না।

আমি এ কথাগুলিনই বললম। কথা শুনে কত্তা আমার মুখের দিকে একদিষ্টে তাকিয়ে থাকলে বটে, কিন্তুক পষ্ট বুঝতে পারলম, তার মন আমার কথার দিকে নাই। কি যি সে ভাবছে, সেই জানে। আমি আবার বললম, উসব কথা ক্যানে বলছ?

তুমি তো সংসার করছ, না কি? কেউ তোমাকে বারণ করছে না। ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি এইসব নিয়ে তোমার সংসার। সব ঠিক, তবে তোমার সংসারই কি সব? আর কিছু নাই? সংসারের বাইরে গাঁ আছে— একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার লাখ লাখ— তেমনি আছে তোমার দেশ, হাজার দেশ, সারা দুনিয়া। দুনিয়ায় কতো মানুষ! সবাই যদি শুধু নিজের নিজের কথা ভাবত, তাহলে দুনিয়ায় আর মানুষ থাকত না, মারামারি কাটাকাটি করে সব মারা পড়ত।

ভালো বুঝতে পারছেলম না কত্তার কথা। কিন্তুক তার পরের কথা কটি জানের ভেতরে যেয়ে লাগল।

কাগজে কাগজে বেরিয়েছে, নিজে তো আর দেখি নাই, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঘরবাড়ি মা-বাপ ছেড়ে চলে এসেছে, ইংরেজ না তাড়িয়ে আর ঘরে ফিরবে না। দ্যাখো, তারা কিছুই চায় না, চায় শুধু জান দিতে, রক্ত দিতে। তাতে হয়তো ব্রিটিশের কিছুই হবে না। সব তারা জানে, জানে তাদের জেল হবে, জরিমানা হবে, ফাঁসি হবে। তা হোক, ফাঁসির দড়ি কষ্ট করে গলায় পরিয়ে দিতেও হবে না, নিজেরাই গলায় পরিয়ে নেবে। এসব কথার কথা নয়, এসব হচ্ছে। কি করে সম্ভব বলতে পারো পনেরো-ষোলো বছরের একটি মেয়ে নিজের হাতে বন্দুক চালিয়ে ইংরেজ খতম করলে, তারপর ধরা পড়তে যাচ্ছে দেখে কঠিন বিষ খেয়ে সাথে সাথে মরে গেল। কতো বয়েস এই মেয়ের? ধরো তোমার বড় খোকার বয়েসি।

খোঁকার কথা শুনে এতক্ষণ বাদে জানটো আমার ধড়াস করে উঠল। কত্তাকে কি আজ ভূতে পেলে? তাড়াতাড়ি করে আমি বললম, আর কথা বোলো না। আমার সব গোলমাল হয়ে যেচে। অ্যানেক দিন ছেলের খোঁজখবর পাই না। কালই একবার যেয়ে খবর নিয়ে এসো।

এতক্ষণে কত্তা হাসতে হাসতে বললে, যাব যাব। আমার কথা শুনে তুমি মনে কোরো না আমি ঘর-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে না জানি কিসব করব ঠিক করেছি, মোটেই তা নয়। যাই-ই করি, আমি নিজে কোথায় আছি, নিজের ভালো-মন্দ না বুঝে কিছু করব না।

খোঁকা ভালো আছে তবে সোময়টো খারাপ

আমার কথাটো রাখলে। কত্তা পরের দিনই শহরে গেল খোঁকার খবর আনতে। কাল রেতে খোঁকার কথা মনে হবার পর থেকে আমার বুকের ভিতর কি যি করছিল সি আমিই জানি। এই একটো জায়গায় খেয়াল করি, কত্তা আমার মনের কথাটো ঠিকই বুঝতে পারে। রাগ-ঝাল যা-ই করুক, কথা শুনে কখনো কখনো মনে হবে, বুঝিন্ মানুষ লয়, পাষাণ– কিন্তুক আসল কাজটো শ্যাষ পয্যন্ত ঠিকই করবে।

কত্তা গেল সকালে আর ফিরে এল সাঁঝের টেরেনে। এবার দেখি, মুখে তার হাসি ধরছে না। পেথমে সে খবর দিলে বড় খোঁকা ভালোই আছে। আর বেশি কিছু বললে না। তাপর রেতে য্যাকন সোমায় হলো কত্তা বললে, খোকার কাছে যখুনই যাই, কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে যাই সে তো তুমি জানো। এবার আর তেমন কিছু না নিয়ে শহরের দোকান থেকে এক হাঁড়ি মেঠাই কিনে নিয়ে গেলাম। খোকাকে দেখে ভালো লাগল। বোধ হয় নিজের যত্ন নিজে নিতে একটু শিখেছে। হাফ-প্যান্ট আর হাফ-শার্ট পরে আছে, সে দুটি বেশ পরিষ্কার। মনে হয় সেদিনই কাচা। কিন্তু কেচে দেবে কে? তাহলে কি সে নিজেই কেচে নিয়েছে! নিজের হাতে কোনো কাজ তো তোমরা ওকে করতে দাও নাই– ছেলেকে অকম্মা করে রেখেছ। সেই ছেলে শহরে গিয়ে নিজের কাজ নিজে করছে এ কি কম আনন্দের কথা! খোকার টেরি-কাটা ছিমছাম চেহারা দেখে খুব ভালো লাগল। আবার একথাও মনে হলো ছেলে বড় হলেই আলাদা মানুষ– সে কি তখন আর বাপ-মায়ের থাকে? খোকাও বড় হচ্ছে, চুপ করে থাকলে কেমন গম্ভীর লাগছে।

মেঠাইয়ের হাঁড়ি তার হাতে দিয়ে বললাম, খেয়ো যেন, না খেলে তোমার মা বাড়িতে বসেই জানতে পারবে। মেঠাই তো, ঠিকমতো রাখলে দু-একদিন তা থাকবে। আমার কথায় সে মাথা হেলিয়ে বললে,

খাব। জানি তো ওকে, মুখে কথা খুব কম, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারে না। যাই হোক, আর দু-একটি কথা বলে চলে এলাম, বাইরে এসে খানিক দূরে গিয়েই মনে হলো, এই যাঃ, ভুলে গেলাম খোকার হাতে তো কিছু টাকা দিয়ে আসা হলো না! জানি টাকা সে নিজের জন্য কিছুই খরচ করবে না। তবু বাড়ি থেকে দূরে একা থাকে, ওর ছোট চাচা এখন থাকে না– কখন কি লাগে না লাগে এইসব ভেবে কটি টাকা দিতে আবার খোকার বোর্ডিংয়ে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি ঘরে সি এক লন্ডভন্ড কাণ্ড। সারা বোর্ডিংয়ের সব কটি ছেলে এসে ঢুকেছে খোকার ঘরে। চৌকির ওপর মেঠাইয়ের হাঁড়িটা খোলা– এক-একটি ছেলে আসছে, থাবা দিয়ে মেঠাই নিয়ে মুখে ভরছে, কতক খাচ্ছে, কতক পড়ছে। সে কি হুল্লোড়, সবাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘর জুড়ে আর এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার খোকা এইসব দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে। সে নিজে কিন্তু তখনো মিষ্টিতে হাত দেয় নাই। বন্ধুরা আনন্দ করে এই মেঠাই খাচ্ছে। তাতেই তার সুখ।

আমি ঘরে ঢুকতেই সবাই একদম চুপ, যেন পাথর হয়ে গিয়েছে আর তোমার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে মুখ ভয়ে নীল। আমার দিকে সে তাকিয়ে আছে, তার দুই চোখে যেন পলক পড়ছে না। জানো, খোকার ঐ চাউনিটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, সাথে সাথে আমার মনে হলো, আর ভাবনা নাই, ছেলে মানুষ হতে পেরেছে। ওর কাছ থেকে দুনিয়ার কোনো মানুষের কখনো কোনো ক্ষতি হবে না। বি.এ. এম.এ. পাশ দিক আর না দিক।

তাড়াতাড়ি করে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম, মাথায় হাত দিয়ে বললাম, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। ভুল তো আমারই হয়েছে, আগে ওরাই খাবে। আমারই বলে যাওয়া উচিত ছিল সবাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে আগে খাওয়াতে। তারপরে তো তুমি খাবে। তুমিই ঠিক করেছ, আমার ভুল হয়েছিল। আমি এই কথা বলতেই কি যে একটি

হাসি ফুটে উঠল খোকার মুখে সে আর কি বলব! সব ছেলে তখন খোকাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে– মিষ্টির হাঁড়ি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। শেষে একটি ছেলে এগিয়ে এসে এক থাবা মিষ্টি নিয়ে খোকার মুখে তুলে দিলে। আমিও আর দেরি না করে চলে এলাম। এই হলো যেয়ে তোমার খোকার গপ্পো।

কথা শুনে আমার ভাবনা গেল বটে কিন্তুক ই কেমন ছেলে তা নিয়ে আবার ভাবতে বসি। ই তো কিছুই নিজের লেগে রাখবে না, সব দিয়ে দেবে! তাই যেদি সে সারা জেবন করে, তাতে নিন্দে হবে না বরং লোক তার মায়েরই গুণগান করবে এমন ছেলে প্যাটে ধরেছি বলে। কিন্তুক অ্যাকন সে কি যি করে বসে তা কি করে জানব? কত্তা আর কবার যায়? বরং আমার ভাশুর আর ল-দ্যাওরই বেশি যায় খোঁকার কাছে এটো-ওটো নিয়ে। ভাশুরের ছেলেপুলে নাই, দ্যাওরের এখনো বিয়ে-থা হয় নাই, তারা পেরায়ই যেচে ছেলের কাছে। যা-ই নিয়ে যাক, খাবার কি পরার জিনিশ– সিসব তাহলে সে কিছুই নিজের লেগে রাখে না! এইসব কথা ভেবে আমার ভারি দোনোমোনো হতে লাগল। একবার মনে হচে এতটো ভালো লয়, শুদু কি জিনিসপত্তরই দেবে, শ্যায পয্যন্ত ছেলে সব্বস্ব দিয়ে দেবে! সেই যি সিদিন রেতে কত্তা বললে খোঁকারই বয়েসি কে অ্যাকটো মেয়ে কোথা বন্দুক চালিয়ে বিটিশ মারতে মারতে ধরা পড়ে যেছিল বলে কঠিন বিষ খেয়ে মরেছিল, আমার খালি থেকে থেকে সেই কথা মনে পড়তে লাগল। কি কাল এল মা? দ্যাশ, দ্যাশের লোক চালাইছে, না বিদেশীরা চালাইছে, তা তো ঘরের ভেতর থেকে কিছু বুঝতে পারি না। কে চালালে ভালো হয় আর কে চালালে মন্দ হয়, সি পাল্টাপাল্টি না চালাইলে বুঝবই বা কেমন করে? কত্তা য্যাকন বলে, তোমার সোংসার তুমি না চালিয়ে আর একজনা ফোপরদালালি করে চালিয়ে দিলে তুমি কি মানবে? ত্যাকন মনে হয়, তাই তো, একবেলা খেচি, আধবেলা খেচি, নিজের খেচি– আর একজনা দরদ দেখিয়ে কোর্মা-পোলাও

দিলেই কি ভালো লাগবে? সি কোর্মা-পোলাও কি বিষ-বিষ লাগবে না? আমার হয়ে আর একজনা আমার ছেলেকে ভালোবাসলে কি আমার জান ভরবে? লোকে বলে না– সেই যি ভিখ্ করার নাম করে ডানবুড়ি বাড়িতে ঢুকে লোভ করে ছেলের দিকে চায়, ভিখ্ নিয়ে চাইতে চাইতে চলেও যায় কিন্তুক তার পর থেকেই ডাগর-ডোগর ছেলে দিনদিন যি কেমন শুকিয়ে যেচে? ডানের চোখ পড়েছে আর কি রক্ষা আছে? ছেলে শুকুইচে, পেত্যেকদিন শুকুইচে, শুকিয়ে বাঁশপাতা হেন, শ্যাষে বিছেনার সাথে মিশে একদিন দুনিয়া থেকে চলে গেল। ডানের চোখ এমনি, মিছে মায়ের চোখে তাকাইলে কি হবে? ত্যাকন মনে পড়ল দ্যাশের দিকে বিদ্যাশিদের বিলাতিদের তাকানো তাহলে ডানের তাকানো! কত্তার কাছে শুনেছেলম, জানকে জান মনে করে নাই, কতো লোক– সায়েব মারতে গেয়েছে, সায়েব হয়তো মরেছে, হয়তো মরে নাই– নিজের নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছে যেন খোলামকুচি। উদিকে যি সায়েব মরেছে কি লোভে সি সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে ই দ্যাশে এয়েছে তা কে বলবে? তা সি-ও তো কুনো না কুনো মায়ের পুত, সেই মা-ও তো একদিন জানবে যি তার বুকখালি হয়েছে!

যিদিন কত্তা আমাদের সবারই লেগে খুব মোটা কাপড় এনে দিলে পরার জন্যে, সিদিন ভারি অবাক হয়েছেলম। খুব দামি কাপড় বাড়িতে আনা হতো তা লয়, তবে ওরই মদ্যে এট্টু হালকা-মিহি সুতোর শাড়ি আমরা পরতম। কিন্তুক ই যি ভারী চব্বর, ভিজলে যি গায়ে নিয়ে টানতেই পারব না! কেউ লিকিন আর বিদ্যাশের কুনো জিনিশ ব্যাভার করবে না। কতো জায়গায় বিটিশদের জিনিশ ডাঁই করে পুড়িয়ে ফেলছে। এরা বেনে বেসাতির জাত, শ্যাষ পয্যন্ত সব কিছুই উদের ব্যাবসা। সেই ব্যাবসা জব্দ করতে হবে বলে উদের জিনিশ আর কেউ কিনছে না। দিশি জিনিশ খাব, দিশি জিনিশ পরব। মোটা ভাত, মোটা কাপড়। সেই লেগেই এই কাপড়। এই আমাদের পরতে হবে। তা

পরছি সেই কাপড়, কত্তারাও পরছে মোটা খদ্দর। তাই বলে বাড়িতে আর চরকায় সুতো কাটতে পারি নাই। যাকগো, কতো হুজুগ দেখলম এই বয়সে।

মাঝে মাঝে মনে করতম, সবকিছু তো আমার লয়, কুনো কুনোটি আমার। সব্বার ছেলে তো আমার লয়, আমারটোই শুদু আমার। আজকাল পেরায়ই মনে হচে কুনো কিছুই শুদু আমার লয়। আমার ছেলেটিও আমার শুদু লয়। ঐ যি মেয়েটি ধরা পড়ার পর মানের ভয়ে কঠিন বিষ খেয়ে মরল, ঐ মেয়েটি কার? উ কি শুদু ওর বাপ-মায়ের? উ কি আমারও মেয়ে লয়? উ আমার হলে দোষ কি। উকেই যেদি জিগ্‌গাসা করা হতো, তুমি মেয়েটি কার গো, তাইলে সি মেয়ে কি জবাব দিত? মরবার আগে সি কি বলত, কারু মেয়ে সি লয়, সি ই দ্যাশের সব মানুষের মেয়ে– সি সারা পিথিমির মেয়ে!

ভাবতে ভাবতে কোথা থেকে কোথা চলে অ্যালম, আমার গা শিউরে উঠল। অ্যাতো অস্থির লাগছে ক্যানে? সবকিছু অস্থির। আমাদের গাঁয়ের স্কুলের ছেলেরাও লিকিনি দুদিন পড়া ছেড়ে বেরিয়ে গেয়েছে। দ্যাশে অ্যাকন রাজার আইন না মানা চলছে। স্কুলের কতোটুকুন কতোটুকুন ছেলে– তারাও আইন মানছে না। তাইলে তো শহরেও ইসব হচে। কই কত্তা তো কিছু বললে না। খোঁকা কি তাইলে আবার– কতো কি ভাবলম। একবার ভাবলম, খোঁকা এইটুকুন ছেলে, শান্ত– ঠান্ডা। উ আবার কি করতে যাবে? আবার ভাবলম, করলে করুকগো, উ নিয়ে ভাবতে যাই ক্যানে?

তা বললেই কি ভাবনা যায়? দ্যাওর আর ভাইটি অ্যাকন আর শহরে থাকে না। আর ল্যাখাপড়া হলো না তাদের। দ্যাওর বললে, তার আর পড়ায় মন যেচে না, একটো চাকরি-বাকরি পেলে বরং কত্তার পাশে দাঁড়াতে পারবে। সারা জেবন ভাই কি সোংসারের বোঝাই শুদু বইবে! সে আর তা হতে দেবে না। এইসব বলে সে বাড়িতে অ্যাকন বসে আছে। দ্যাওরের এই কথা, কিন্তুক ছোট ভাইটির

খুব ইচ্ছা আরও পড়া। তার মাথা ভালো, পড়লে অনেক ওপরে উঠতে পারত। তা হলে হবে কি– খরচ জোগাবে কে? একবার তো এই নিয়ে বাপের সাথে হুলুস্থূল কাণ্ড হয়েছিল। আর দরকার নাই। তাই সে কত্তার কাছে এসে বললে, কলেজে আর সি ভত্তি হবে না– একটো কুনো চাকরি-বাকরি হয় কিনা চেষ্টা করবে। সি-ও অ্যাকন মামার বাড়িতে ফিরে গেয়েছে।

ঠিক এই সোমায়েই একদিন খবর এল– যা ভয় করেছেলম, তাই– খোঁকা স্কুলের আর সব ছেলেদের সাথে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আইন মানবে না বলে কিসব করতে গিয়েছিল রাস্তায়, সিখান থেকে তাদের দলসুদ্দু ধরে জেলে নিয়ে গেয়েছে!

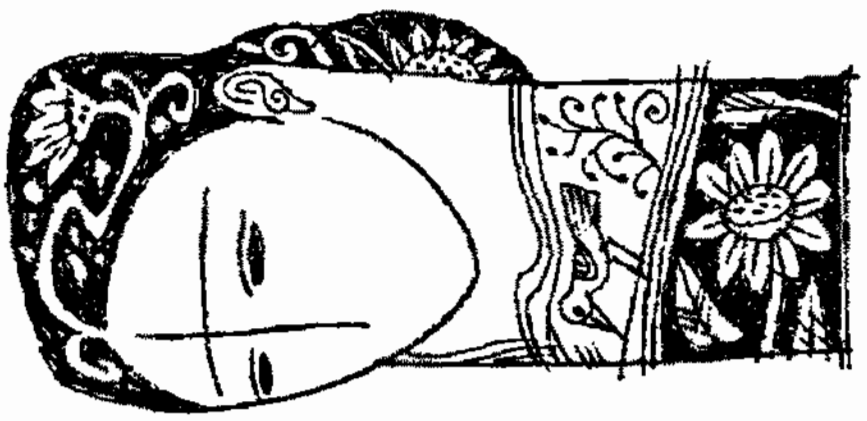

ছেলে আনো বাড়িতে, আর পড়তে হবে না

এত কথা ভাবলম কিন্তুক যে-ই শোনলম বড় খোঁকাকে ধরে জেলে নিয়ে গেয়েছে, অমনি সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ছেলেকে জেলে নিয়ে গেয়েছে, দড়ি দিয়ে বেঁধেছে, না শেকল দিয়ে বেঁধেছে– লাঠির বাড়ি মেরে টানতে টানতে নিয়ে গেয়েছে– উ ছেলে কুনোদিন কারু হাতে মার খায় নাই, কেউ ওর গায়ে হাত দেয় নাই কুনোদিন, সেই ছেলে পুলিশের লাঠির বাড়ি খেচে– কি জানি, সারাদিন উপোস করে আছে না কি, ভোক্ সহ্য করতে পারে না সি তো আমি জানি, কেউ হয়তো এট্টু খাবার দেয় নাই তাকে– তবু মুখ ফুটে তো একটি কথা সি বলবে না কখনো– এইসব হক না-হক কথা খালি বুকের

মদ্যে উথোল-পাতাল করতে লাগল আর খানিক বাদে বাদে দোম যেন আটকে যেতে লাগল। আমি কেবলই বলতে লাগলম, আমার ছেলে এনে দাও, যেমন করে পারো আমার ছেলে এনে দাও। যেন ছেলে বলতে আমার একটিই। ইদিকে পরের খোঁকাটি আট বছরের হয়েছে, চাঁদের মতুন একটি মেয়েও হয়েছে– অ্যাকন ছ-মাসের– সিসব কথা মনে হলো না। উরা যি ছামনেই রয়েছে, তাই খেয়াল হচে না। খালি মনে হচে, আমার নাড়িছেঁড়া ধনটিই আমার কাছে নাই– আমার কেউ নাই, আমার বিশ্ব-ভোবন আঁদার।

তবে কত্তা গেয়েছে, আমি একটু নিশ্চিন্তি। উ লোক সামান্য লয়, উ মানুষ বটবিরিক্ষি, তামাম মানুষকে ছেঁয়া দিতে পারে। ঠিক তা-ই হলো। তিমি-সাঁঝের বেলা খোঁকাকে নিয়ে ফিরলে কত্তা। অন্য অন্য দিন সে ফিরে নিজের বাইরের ঘরেই থাকে, আমরাই পা-ধোয়ার পানি, শরবত নিয়ে যাই। আর খুব কিছু বেপার হলে সে বাড়ির ভেতর মা-বুনের কাছে আসে। আজ সে তা-ই করলে, ছেলেকে নিয়ে সোজা বাড়ির ভেতরে এসে মায়ের কাছে বড় খোঁকাকে ঠেলে দিয়ে বললে, ছেলে যে পথে যাচ্ছে এই বয়েস থেকে, কেন যাচ্ছে, কি করতে যাচ্ছে– এইসব কথা ওর কাছ থেকেই শোনো। তারপর তুমিই ঠিক করো, ওকে বারণ করবে কি করবে না। নেহাত কম বয়েস, তাই দয়া করে এবার ছেড়ে দিলে– দু-বছর জেলও দিতে পারত। ব্রিটিশদের রাজত্ব, বড় কঠিন শাসন মা। এই শাসন এখন দেশের লোকও আর মানতে চাইছে না– ঘর-সংসার বাপ-মা ভাই-বোন লেখাপড়া ছেড়ে দলে দলে সব বেরিয়ে আসছে– এরই মতন খোকা সব, কিছুই মানছে না, কারুর বারণ শুনছে না, ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে যাচ্ছে। কি এখন বলবে বলো দিকিন। আইন তো ছাড় কথা– এখানে বোমা ফাটাচ্ছে, ওখানে সায়েব মারছে আর যতো জেল হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে, ততো তাদের রাগ বাড়ছে। আগুন জ্বলছে দেশে, কি করা যাবে বলো তো? গিন্নি দেখি চুপ করে আছে, তার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে বেধবা ননদটি। কেউ কুনো কথা বলছে

না। বড় খোঁকা কত্তার পাশে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে, তার একটো হাত কত্তার হাতে ধরা। আমি আর থাকতে পারলম না, ছুটে যেয়ে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা-গরম, জ্বর এয়েছে। আমি চেঁচিয়ে ওঠলম, ই কি, ই-যি অ্যানেক জ্বর! বাপ না ছাই, কত্তা এই ছেলেকে শহর থেকে নিয়ে এয়েছে, কতোবার গায়ে-পিঠে হাত পড়েছে, ছেলের জ্বর সি কিছুই ট্যার পায় নাই।

আমার চিচ্‌কার শুনে গিন্নি এগিয়ে এসে খোঁকার কপালে হাত রাখলে। সে তো অস্থির হবার মানুষ লয়, য্যাতো বেপদই হোক, মাথা তার ঠান্ডা। কপালে একবার, বুকে একবার হাত দিয়ে গিন্নি আমার দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁ, জ্বর অনেক। তা এত হ্যাঙ্গামা-হুজ্জুতে জ্বর আসবে না! কেন ভাই, এসবের মধ্যে থাকছ তুমি? তা যাক, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এয়েছে, জ্বর নিয়ে ভাবতে হবে না, আপনা-আপনিই চলে যাবে। যাও, মেজ বউ, উত্তর-দুয়োরি ঘরে বিছেনা করে দাও।

সাঁঝবেলার আঁদারে সব ভূতের মতুন দাঁড়িয়ে আছে। পিদিম কি লম্ফ কিছুই ত্যাকনো জ্বালানো হয় নাই। তখন-তখুনি বিছেনা করব কি— আগে একটো রেড়ির ত্যালের পিদিম জ্বালিয়ে উত্তর-দুয়োরি ঘরে ঢোকলম। এমন লাগচে ক্যানে মা! এত আঁদার লাগচে ক্যানে। ঘরের এক কোণে পিদিমটো রাখলম— সারা ঘর যেমনকার তেমনি আঁদার। শুদু পিদিমটো মিটমিট করে জ্বলতে লাগল এক কোণে। খুঁজে খুঁজে বারুণ আনলম, তিমি-সাঁঝে ঝাঁট দিতে নাই। তবু ঘরটো একবার ঝাঁট দেলম, খেজুর পাতার নকশা করা শেতল পাটিটো পাতলম, তাপর হাতের আন্দাজে খুঁজে খুঁজে সিন্দুকের ভেতর থেকে সুজনিটো বার করে পাটির ওপর পাতলম— আহা ত্যাকনো জানি না, জাদু আমার কি কষ্ট করে ঘরের ভেতরে আঁদারের মদ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যি ছেলে সহজে নিজের কষ্টের কথা বলে না, সেই ছেলে য্যাকন বললে, মা, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, ত্যাঁকন আমার হুঁশ হলো। এই যি বাপ, এই হয়ে গেল— বলে তাড়াতাড়ি করে আমি খোঁকাকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতে দিতে

বললম, হ্যাঁ বাপ, পুলিশ কি তুকে মেরেছে? আমার কথা শুনে খোঁকা হাসলে, আবছা আঁদারে তার হাসিটি আমি দেখতে প্যালম না। ঐরকম করে হাসতে হাসতেই সে বললে, না না, গায়ে হাত দেবে কেন? গায়ে হাত দেয় নাই। এক পুলিশের অফিসার আমাকে বললে, তাড়াতাড়ি ছাড়া যদি পাও, ঘরের ছেলে ঘরে যাও– এ পথে থাকলে মরবে– যারা তোমাদের এসব কাজে লাগাচ্ছে তাদের কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে তোমরাই মারা যাবে।

খোঁকাকে বিছেনায় শুইয়ে পিদিমটো এনে তার মাথার কাছে রাখতে যেয়ে দেখলম, চোখদুটি তার লাল টকটকে। কপালে হাত দিয়ে দেখলম, জ্বর হু হু করে বাড়ছে। গিন্নি এসে সব দেখেশুনে বললে, খোঁকার মাথাটো একবার ঠান্ডা পানিতে ধুইয়ে দাও মেজ বউ, দিয়ে খানিকক্ষণ কপালে জলপটি দাও। তাইলে জ্বর কমে যাবে।

তা-ই করলম। চাচারা সব এল-গেল, কতো কথা বললে খোঁকাকে, কতো আদর করে কতো কথা বললে, বারে বারে গিন্নি আর বুবু এসে খোঁকার কাছে বসলে। তা-বাদে বাড়ির সব লোকদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আমাকে গিন্নি কতোবার বললে রেতের ভাত খেতে! আমি খোঁকার শিয়র থেকে নড়লম না, জলপটি দিতে দিতে আমার কতোবার ঝিমুনি এল, ঝুঁকে ঝুঁকে পড়তে লাগলম, তবু খোঁকার কাছ থেকে যেতে পারলম না। অ্যানেক রেতে মনে হলো, জ্বরটো যেন এটু কম হয়ে এয়েছে। খোঁকা আর ত্যাতোটো অস্থিরও করছে না। একটু বাদে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সকালবেলায় মনে হলো জ্বরটো আর নাই, ছেলেকেও অ্যানেকটো চনমনে লাগছে! কাল রেতে কিছুই খায় নাই। তাকে ধরে আস্তে আস্তে পিঁড়েয় নিয়ে বসিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে দেলম। কাল রেতে ছেলের লাল টকটকে চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেয়েছেলম। অ্যাকন দেখলম, মুখচোখ শুকিয়ে গেয়েছে বটে, তবে চোখের সেই লাল টকটকে ভাবটো আর নাই।

লিশ্চিন্ত হয়ে আছি– যাকগো, জ্বরটো খারাপ জ্বর লয়। ত্যাকনকার ডাক্তার-বদ্যি খুব কম, লোকে সহজে তাদের ডাকতে যেত না। আর ডাকতে চাইলেই বা পাবে কোথা। পাশ করা কুনো ডাক্তার দশ গাঁয়ে খুঁজলেও পাওয়া যেত না, দু-একজনা যা থাকত সি শহরে। গাঁয়ের মানুষ কি তাদের কাছে যেতে পারে? ই গাঁয়ে উ গাঁয়ে হয়তো বদ্যি দু-একজনা ছিল, ডাক্তার বোধায় একটোও লয়। কেউ হয়তো কুনোদিন কুনো ডাক্তারের কাছে দিনকতক ছিল, এটো-ওটো নাড়াচাড়া করেছে, কষ্টমষ্ট করে ইঞ্জিশন ফুঁড়তে পারে, নাইলে দু-দাগ মিকচার বানিয়ে দিতে পারে– সে-ই হলো ডাক্তার। তা ইসব ডাক্তারও কি সব গাঁয়ে আছে? তা নাই। আমার বাপের গাঁয়ে কুনো ডাক্তার-কবরেজ ছিল না। তিন কোশ দূরের গাঁয়ে একজনা ছিল, সকালে তাকে ডাকতে গেলে বৈকালি বা সাঁঝবেলায় একটো বুড়ো ঘোড়ায় চেপে হটর হটর করে সে আসত। তা সে-ই হলো যেয়ে বড় ডাক্তার। আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁ ইদিক থেকে খুব ভালো। আছে একজনা অ্যালাপ্যাথি, পাশ-টাশ দেয় নাই, তবে ফুঁড়তে পারে, বড়ি-মিকচার দিতে পারে। আর একজন হলো হেমাপ্যাথি, শিশিতে পানি ভরে দু-ফোঁটা করে ওষুধ দিত। এক-আধ আনা পয়সা কেউ তাকে দিত, কেউ দিত না। ইদিকে অসুখ-বিসুখ রাতদিন লেগে আছে, কে আর অত ডাক্তারের কাছে যায় জ্বরজ্বারি নিয়ে? দু-চার দিন বাদে আপনিই চলে যাবে। সর্দি-কাশিতে জ্বর, ফোঁড়ার তাড়সে জ্বর, বদহজমে প্যাটে যন্তন্না, উসব কিছু ধত্যবের লয়, গা-গরম। তবে কঠিন কিছু হলে কি আর করবে মানুষ, রুগির ঘরে যেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত। অসুখ-বিসুখ হামেশা হচে, আপনা-আপনি সেরেও যেচে, আবার মরেও যেচে অ্যানেক মানুষ।

অসুখ কঠিন না সহজ, বোঝবার বাগ ছিল না সি-সময়ে। বড় খোঁকা সকালে কিছু খেলে না। বললে মুখে মজা নাই। অত জ্বর ছিল রেতে, মুখে কি মজা থাকে? তবু সকালে খই-মুড়কি খেলে,

দোপরবেলায় ভাতও দুটি খেলে। আমি লিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজকম্ম করছি, বাড়ির আর সবাইও লিশ্চিন্ত– সাঁঝবেলার খানিক এগু ঘরে যেয়ে দেখি, খোঁকা বিছেনায় শুয়ে আছে। বললম, এই অবেলায় শুয়ে ক্যানে খোঁকা, একটু উঠে হেঁটে বেড়াও– বলতে বলতে দেখি, বলব কি, তার মুখের দিকে চাওয়া যেচে না, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে– ছেলে খুব হাঁসফাঁস করছে। ঠিক, অ্যানেক জ্বর গায়ে। আবার ক্যানে জ্বর এল– মনে একটু ভাবনা হলো, বাড়ির সবাইকে জানালম। খবর পেয়ে কত্তা জ্বরকাঠি নিয়ে ঘরে এল। বগলের তলায় জ্বরকাঠি দিয়ে দেখলে, হ্যাঁ অ্যানেক জ্বর।

এই যি জ্বর এল আর ছাড়লে না। সকালবেলাটোয় কম, মনে হতো বুঝিন গেয়েছে, পেথম দিন যেমন মনে হয়েছিল। কিন্তুক ঐ জ্বরকাঠি দিতেই দেখা যেত জ্বর আছে, ছাড়ে নাই। তিন-চার দিন এই রকম গেল, সকালে কম, রেতে অ্যানেক জ্বর। খাওয়ারও রুচি নাই, তা-বাদে, এই কদিন পাইখানা বন্ধ ছিল, একদিন খুব শক্ত পাইখানা হলো, তাপর ঘন ঘন লরম বাজ্যি আর প্যাটে যন্তন্না। কত্তা গাঁয়ের অ্যালাপ্যাথি ডাক্তারকেই আগে ডাকলে।

জ্বরটো যাচ্ছে না কেন, তিন-চার দিন হয়ে গেল– কত্তা শুদুইলে ডাক্তারকে। লাঙলা চাষার মতুন চেহারা ডাক্তারের, দেখলে পছন্দ হয় না। তা মিছে লয়, নিজের হাতে চাষবাস করে ডাক্তার, দরকার হলে লাঙলের মুটোও ধরে। দুই পায়ের আঙুলে হাজা, হাতের আঙুলগুলিনও এই মোটা মোটা! কি করে পছন্দ হবে এমন ডাক্তার? খানিকক্ষণ সে খোঁকার নাড়ি টিপে চোক বুজে থাকলে, তারপর বললে, জিভ বার করে অ্যা অ্যা করো। সব দেখে শুনে শ্যাষে বললে, হ্যাঁ জ্বর আছে– কিসের জ্বর তা তো এখন বলতে পারা যাচ্ছে না– জিবে ময়লা পড়ে রয়েছে। যা-ই হোক, টাইফয়েড সন্দেহ করছি– আর দু-চার দিন যাক, রোগ ঠিক বেরিয়ে পড়বে। ওষুধপত্তর কিছু দিচ্ছি। শক্ত খাবার একদম বন্ধ, সাগু-বার্লি খাবে, তাতে দুধ দেওয়া

চলবে না, জল দিয়ে রান্না করতে হবে। ডাবের জলটা খেতে পারবে আর বেদানার রস। এইরকম চলুক।

এইসব বলে চার আনা ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেল। কথা শুনে কত্তা লিশ্চিন্ত হতে পারলে না, হেমাপ্যাথি ডাক্তারটি বন্ধু লোক, তাকে ডেকে নিয়ে এল। ই ডাক্তারের পরনে একটো হেঁটো ধুতি, কাঁধে একটো মোটা চাদর। সি যি কতো কথা শুদুইলে তার আর অন্ত নাই। অত কথার জবাব খোঁকা আর কি দেবে? ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা শোনছেলম। কত্তাই সব কথার জবাব দিচে, শেষে সে বললে, তোমার কি মনে হচ্ছে? ডাক্তার বললে, সর্বাংশে কিছু নয়– আমি তিনটি পুরিয়া দেব– বাস, আর কিছু লাগবে না।

ঐরকম করে কথা বললে কি কিছু বোঝা যায়! আমি কিছু বুঝতে পারলম না। আরও দুটো দিন গেল কিন্তুক জ্বর একবারও ছাড়লে না। সকালের দিকটোয় একটু কম থাকে, গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে মনে হয়, জ্বর নাই আর জ্বরকাঠি বগলে দিলেই দেখা যায় এট্টু জ্বর লেগেই আছে। ক্যানে জানি না, আমার মন খুব কু ডাক ডাকতে লাগল। কিন্তুক কাকে কি বলব– বেশি কিছু বলতে গেলেই লোকে বলবে মেতর-বউ বাড়াবাড়ি করছে। অসুখ-বিসুখ যি মানুষের গা-সওয়া। সবাই জানে অসুখ আছে চিকিচ্ছে নাই–সেই লেগে অসুখে কেউ গা করত না। বলত উ কিছু লয়, গা-গরম, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। ভালো কি আর হতো? হাজার কিসিমের রোগ-বালাইয়ে হর-হামেশা লোক মরত। কতোরকম অসুখই না ছিল– ঝি-বউদের সূতিকা রোগ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পুঁয়ে-লাগা রোগ– দিন দিন শুকিয়ে যেচে, শুকিয়ে যেচে, শেষে একদিন মরে গেল, আর একটো রোগ হুপিং কাশি, বাবা রে কি কাশি, কাশতে কাশতে চোখে রক্ত পয্যন্ত জমে যেত, তাপর বড়দের হাঁপানির ব্যায়রাম– ইসব রোগের কুনো চিকিচ্ছে ত্যাকন হতো না। ওগুনো যেন রোগই লয়। দু-একটো মরে গেলেও কুনো শিক্ষে নাই। তেমনি বাতাস লেগে মওত, বাণ মেরে মানুষ মারা

ইসবও ছিল। আর ছিল দুটি অসুখ– সি হলে কেউ চিকিচ্ছে করাত না, কুনো চিকিচ্ছে ছিলও না। একটি হলো কুট– হাতে-পায়ে কুট– ই ভালো হবার লয়, কুনো চিকিচ্ছে নাই। সবচাইতে খারাপ শাপ হচে তোর মুখে কুট হোক। আর একটো হচে ক্ষয়-কাশি, উ হলে মওত আসবেই, চিকিচ্ছে কিছুই নাই। সব শ্যাষে আর ছিল দুটি রোগ– হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ত। একটি হলো নামুনে-কলেরা আর একটি গুটি-বসন্ত। এই দুটি রোগ আপনা-আপনি হতো না। দুই হারামজাদি মাগী এক গাঁ থেকে আর গাঁয়ে নিয়ে যেত। এক মাগীর নাম মা-শেতলা, আর এক মাগী ওলা-বিবি। একজনা বসন্তের, আর একজনা নামুনের, একজনা হিঁদু, আর একজনা মোসলমান। দুজনায় মিলে কি মাহা-কাজই না করত! ত্যাখন আর হিঁদু-মোসলমান বাছত না। এক-একটো গাঁয়ে দশ-পনেরোদিন থাকত। কতো বংশ যি নিব্বংশ হতো! বিরান হয়ে যেত গাঁ-কে গাঁ। তাপরে আর একটি গাঁয়ে যেত। এই দুটি মাহামারী রোগ এলে লোকে চিকিচ্ছে আর কি করাবে– দু-হাতে মাথা চাপড়াত।

আমিও খোঁকার অসুখটোকে মনে করেছেলম এমনি জ্বর। দু-দিন বাদেই সেরে যাবে। অ্যাকনো তা-ই মনে হচে। যি রোগের কথা ঐ হেঁটো-ধুতি পরা বামুনটো বলে গেল, সি রোগ আমার ছেলের হতে যাবে ক্যানে? কার কাছে কি দোষ আমি করেছি, কার কি শাপ আমি কুড়িয়েছি যি আমার বড় খোঁকার উ রোগ হতে যাবে? উ কি য্যাকন-ত্যাকন যার-তার হয়? জাতসাপের কামড়ের মতুন উ হলো কালরোগ। পাড়াগাঁয়েরও সব লোক জানে সান্নিপাতিক জ্বর হলে রুগি বাঁচে না। ঐ একজ্বরী সান্নিপাতিক এমনি জ্বর যি একনাগাড়ে একুশ দিন, না-হয় আটাশ দিন, না-হয় ছাপ্পান্ন দিন গায়ে লেগে থাকবে, কিছুতেই ছাড়বে না– শত ওষুধ-পত্তরে কুনো কাজ হবে না। ঐ মেয়াদের মদ্যে রুগি মরে গেল তো গেল, মেয়াদ পয্যন্ত যেদি বেঁচে থাকে তো সুস্থ হবে বটে কিন্তুক একটি অঙ্গ– হয় একটি চোখ, না-হয়

একটি হাত কিংবা একটি পা লষ্ট হবেই হবে। এমনি কঠিন রোগ! আমার ছেলের কি সেই রোগ হয়েছে? তা ক্যানে হবে? এই দিন-দুনিয়ার সব মানুষ ভালো থাকুক– সব মায়ের পুত!

কিন্তুক সাত দিন পেরিয়ে গেল, ছেলের জ্বর ক্যানে যেচে না? প্যাটটোও খারাপ হলো, তলপেটে দরদও খুব। কত্তা বরং একবার শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসুক। আমি আর থির থাকতে পারচি না।

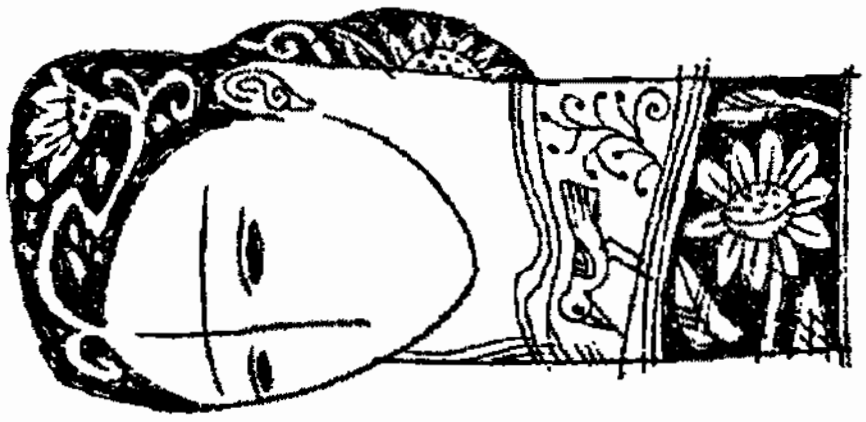

যা ভয় করেছেলম তা-ই হলো, ই সান্নিপাতিক জ্বর

কি করে শহর থেকে বড় ডাক্তার আনা সোম্ভাব হলো, আমি জানি না। বোধায় জমিই খানিকটো বেচতে হলো। দ্যাওর-রা সব ছেঁকে ধরলে কত্তাকে। গিন্নি আর ননদও দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলে তাকে। ছেলেই যদি চলে গেল, সম্পত্তি ধুয়ে কি পানি খাবে কত্তা? ছোট দ্যাওর তো কেঁদেই ফেললে। গলা তুলে একটি কথা কুনোদিন সে বলে না কত্তার কাছে, সিদিন কাঁদতে কাঁদতে বললে, দু-দিনের মধ্যে শহর থেকে বড় ডাক্তার যদি তুমি না আনো, আমি বিষ খাব বলে দিচ্ছি, এই সংসারের ভাত আমার হারাম হয়ে যাবে।

যা-ই হোক, পরের দিন বৈকালির টেরেনে ডাক্তার এল। ইস্টেশনে মোষের গাড়ি গেয়েছিল, কত্তা ডাক্তারকে নিয়ে বেলা থাকতে থাকতেই বাড়ি এল। হাত-মুখ ধোবে না, কিছু খাবে না, হ্যাট-কোট পরা ডাক্তার সোজা রুগির ঘরে চলে এল। ঘরের বাইরের উসারা থেকে আমরা সব দেখছি। ডাক্তারের বয়েস খুব বেশি লয়, সোন্দর মুখ, ফরশা চেহারা।

অনেক রকম করে রুগি দেখলে, তাপর দেখা হয়ে গেলে এমন চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকলে যি সি দেখে আমার হাত-পা প্যাটের ভেতর সেঁদিয়ে যেতে লাগল। হ্যাঁ, ই সান্নিপাতিক জ্বরই বটে– এই কথাটি য্যাকন সি উশ্চারণ করলে, মনে হলো আমার কলজেয় যেন একটো কালসাপ ছুবলে দিলে। তাইলে গাঁয়ের অ্যালাপ্যাথি ডাক্তার যা সন্দ করছিল, তা-ই ঠিক? কি হবে অ্যাকন? ই রোগের কি চিকিচ্ছে নাই? শোনলম, ঘরের ভেতর ডাক্তার বলছে, সান্নিপাতিক জ্বরের কুনো চিকিচ্ছে নাই, ই কথা ঠিক লয়। মেয়াদি জ্বর তো– একুশ দিন, আটাশ দিন, কুনো কুনো সোমায় ছাপ্পান্ন দিনও ই জ্বর থাকে, তাপরে ছেড়ে যায়।

জ্বরের মেয়াদের সমায়টায় আমরা দেখি রুগির দেহে যেন শক্তি থাকে– জ্বরটা সহ্য করতে পারে। সবচেয়ে দরকার হলো যত্ন আর সেবা। এই দুটোই হলো আসল ওষুধ। মুশকিল হচ্ছে, নাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। হজম করার ক্ষমতা থাকে না, নাড়িতে দগদগে ঘা তো! আবার শক্ত খাবার কিংবা পুষ্টিকর খাবারও কিছু দেওয়া যায় না।

ওষুধ যা দেবার আমি দিচ্ছি, ক'রকম বড়ি থাকবে, মিকশ্চার থাকবে। রুগিকে আপনারা ডাবের জল দেবেন। জল দিয়ে রান্না করা সাগু-বার্লি দেবেন– কখনো বেদানার রস দেবেন, তবে বেশি নয়, পেট খারাপ হয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে দেবেন।

এইসব বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে ডাক্তার বললে, রুগির ঘর একবারে আলাদা হবে, যখন-তখন কেউ ঘরে ঢুকবে না। ঘরে বেশি আলো থাকবে না, আবার হাওয়া চলাচল যেন থাকে, দেখবেন– বলতে বলতে ডাক্তার ঘরের বাইরে এসে সবাইকে সাথে নিয়ে চলে গেল। ত্যাকন গিন্নি আমাকে ডেকে বললে, মানুষের সোংসারে ঝড়-বিষ্টি আপদ-বেপদ আসবেই। চিরকাল কারু সুখেও যায় না, দুখেও যায় না। শোনো মেজ বউ, ছেলের দায়িত্ব তোমার আর মহুদার। ঘর-সোংসারের কাজ যা পারবে করবে, না পারলে করবে না।

এইসব দায়িত্ব নিয়ে লেলম আমি আর আমার বেধবা ননদ।

উত্তর-দুয়োরি ঘরটোই বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘর। কারুকাজ করা মেহেগোনি-কাঠের একটি দরজা আর ঐ উত্তরেই একটি বড় জানেলা। ঘরের ভেতরটো একটু আঁদার-আঁদার— পুবে জানেলা নাই। দক্ষিণে টানা দেয়াল, কুনো জানেলা নাই, পশ্চিমেও নাই। তবু এই ঘরটিই সবচাইতে ভালো। সেইখানে লতুন করে বিছেনা পাতলম, সব জোগাড়যন্তর করলম। ফল-পাকুড় ছেলে যা যা খেতে পারে সব আনা হলো। বেদানা-নাশপাতি, নেবু— এইসব ফল এল, ডাবের পাহাড় জমল। সারা বাড়িতে সাড়া-শব্দ নাই, কেউ কথাবার্তা বলতে চায় না। দু-একটো কথা বলে ফিসফিস করে, ছেলেমেয়েরা পয্যন্ত কাঁদতে ভয় পেচে। বাড়িতে অ্যাকন ছেলেমেয়ে তো খুব কম লয়, আমার দুটি— পরের খোঁকা আর মেয়েটি, সেজ বউয়ের দুটি খোঁকা আর ভাগ্নেদুটি আছেই। কখনো কখনো কোলের খুঁকি কিংবা সেজ-র ছোট খোঁকাটি চিচ্‌কার করে কেঁদে উঠলে চমকে উঠি। দোপরবেলায় সব শুনশান, বাড়ির লোকজন সব ঘরে, কারু মুখে রা নাই। কানে আসত কা কা কাকের ডাক— মনে হতো যেন ই জগতের লয়, অন্য কুনো দুনিয়া থেকে কাক ডেকে যেচে। কুরুর কুরুর করে ঘুঘু ডাকত, তাও মনে হতো অন্য কুনো জগৎ থেকে ডাকছে। গা ত্যাকন শিউরে উঠত, মনে হতো এখুনি একবার খোঁকাকে দেখে আসি। মা নাই, এই ফাঁকে কে না জানি কি করছে! মা হাজির থাকলে আজরাইলও কিছু করতে পারবে না ছেলের। ছুটে চলে য্যাতম রুগির ঘরে। আঁদার ঘরে হঠাৎ ঠাওর হতো না খোঁকা কুন্‌খানে আছে। তাপর আঁদার চোখে সয়ে এলে দেখতে প্যাতম ঘরের এক কোণে বিছেনায় শুয়ে আছে খোঁকা। বিছেনায় যেন মিশে গেয়েছে ছেলে, মুখ শুকনো, শুদু চোখদুটি টকটক করছে। কিছু খাবে বাপ? না। মাথা টিপে দেব? না। যা শুদুই তাতেই না। কাউকে তো কুনোদিন বেস্ত করতে শেখে নাই। নিজের লেগে কিছুই যি চায় না সে। তবু মাথায় হাত দি। জ্বর অল্পই, কিন্তুক এট্টু না এট্টু লেগেই আছে।

এমনি করে একটি একটি দিন পার হতে লাগল। অ্যাকটো করে দিন

যেচে, না অ্যাকটো করে যুগ কেটে যেচে। সকালে সুয্যি উঠে দিন শুরু হলে মনে হচে, এই দিন আর শ্যাষ হবে না, সুয্যি আর ডুববে না। আবার সাঁঝবেলায় আঁদার নেমে রাত অরম্ব হলে মনে হচে, ই রাত বোধায় আর কাটবে না।

সকাল দোপর রেতে রাঁধা আছে, খাওয়া আছে। বাড়ির লোক আসচে-যেচে, খেচে— সবই করছে। জন-মুনিষরাও কাজকম্ম করতে যেচে। তবু মনে হচে সব চুপ, সব থম মেরে আছে। বাড়িতে হাসি নাই, গান নাই, কথা নাই। বাপ-চাচাদের দেখে মনে হচে তারা যি জানে ধরে বেঁচে আছে, ই বড্ড শরমের কথা। মনে হচে কতো অপরাদই তারা করছে, লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে অ্যাকনো বেঁচে আছে! বংশের বড় ছেলে, ষোলো বছর চলছে, মানুষের মতুন মানুষ হয়ে গেয়েছে, সি ছেলে মরণরোগে পড়ে আছে, তাইলে তারা ক্যানে বেঁচে থাকবে? খানিক বাদে বাদে একজনা করে খোঁকার বিছেনার কাচে আসছে, চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে থাকছে, তাপর কথাটি না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেচে। অ্যাকন দেখছি, ই-বাড়ি উ-বাড়ি থেকেও লোক আসচে খোঁকাকে দেখতে। হিঁদুপাড়া থেকেও লোক আসচে। শুদু যি কত্তাকে তারা চেনে, মান্যিগন্যি করে, সেই লেগেই যি আসচে তা তো লয়, আমার উ ছেলে সারা গাঁয়ের পিয়, সেই লেগেই তারা সব না এসে পারছে না। একদিন কত্তামা-ও পালকি করে এসে দেখে গেল। য্যাতো লোক আসে, ত্যাতো আমার কলজে খামচে খামচে ধরে। তাইলে কি খোঁকা আমার ই দুনিয়ায় থাকবে না? ই তাইলে কি মিত্যুরোগ— ই কি হলো গো! আবার এক-এক সোমায় ভাবি, আমি মা, আমি বাঘিনি, কই, কে নিবে— নিয়ে যাক তো আমার ছেলে আমার ছামনে থেকে!

চিকিচ্ছের কামাই নাই। গাঁয়ের অ্যালাপ্যাথি ডাক্তার পেত্যেক দিনই আসে। তার কাছ থেকে শুনে কত্তা একদিন-দুদিন বাদে বাদে শহরে যায়, বড় ডাক্তারকে জানায় আর ওষুধ-পথ্য নিয়ে বাড়ি আসে। খোঁকা আর ওষুধ খেতে চায় না, পথ্যও কিছু খেতে চায় না। পথ্যই বা কি? ডাবের

পানি, সাগু বার্লি ইসব কি কেউ দিনের পর দিন খেতে পারে! দিনদিন ছেলে শুকিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেন বাঁশপাতা, বিছেনার সাথে মিশে গেয়েছে। অ্যাকন আর উঠে বসতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না। পায়খানা-পেশাব খুব কম হয়ে গেল, কিছুই খাওয়া নাই তো, হবে কোথা থেকে? বেশিরভাগ সোমায় চোখ বন্ধ করে রাখে, মনে হয় যেন চোখের পাতা খোলারও খ্যামতা নাই। সারা দিন-রাত ছেলের মাথার কাছে বসে থাকি আর আকাশ-পাতাল ভাবি। তবে কি তাকাবে না— তবে কি থাকবে না? যেদি নাই-ই থাকে, তাইলে আমি বাঁচব কি করে? য্যাতোই বাঁচতে চাই, কি করে বাঁচব? নিজের জান তো তুশ্চু, তামাম দুনিয়া দিলে যেদি খোঁকা বাঁচে, তাইলে তা-ই হোক। আমি বিরলে বসে বাছার মুখ নিরখি—

একুশ দিনের দিন আমার হঠাৎ মনে হলো কত্তা যেন কেমন হয়ে যেচে। শহরে যাবার কথা ছিল, সিদিন সে আর শহরে গেল না, কারও সাওস হলো না তার কাছে যেয়ে একটি কতা বলে। খানিকটো বেলা হলে সে নিজে যেয়ে হেমাপ্যাথি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। হেঁটো-ধুতি পরা, চাদর-গায়ে সেই বন্ধু ডাক্তারটি রুগির ঘরে এসে দাঁড়াইলে।

তুমি বলেছিলে এ কোনো রোগই নয়, দুটো পুরিয়া দিলেই জ্বর পালাবে। আমি সব ওষুধ বন্ধ করে দিচ্ছি, দাও তোমার পুরিয়া। আমি দু-দিন দেখব, জ্বর যদি না ছাড়ে, খুন করব তোমাকে।

কত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেয়ে গ্যালম। ই কেমন মুখের চেহারা! হেমাপ্যাথি ডাক্তারও বোধায় ভয় পেয়ে গেল। সে বললে, এসব কি কথা বলচ— রোগব্যাধি নিয়ে এমন কথা কি বলতে আছে। যা-ই হোক, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, তবু ওষুধ আমি দিচ্ছি। অন্য কোনো ওষুধ বন্ধ করতে হবে না— একসাথেই সব চলুক।

সেই কথামতো সিদিন থেকে অ্যালাপ্যাথির সাথে হেমাপ্যাথিও চলতে লাগল।

এত কিছুর মদ্যে এক মাহা আশ্চর্য হচে আমাদের গিন্নি। সারা বাড়ির এই-আবস্তায় কারুরি মাথা ঠিক নাই— কেউ অস্থির, কেউ পাথর, হাঁ-চা

নাই, গোটা গাঁ যেন পেমাদ গুনছে– ইয়ারই মদ্যে আমাদের গিন্নি যেমনকার তেমনি, সেই পোষ্কার মোটা ধুতিটি পরনে, কপাল পয্যন্ত ঘোমটা। খালি পা, তবু দু-পায়ে এক কণা ধুলো নাই। ঘড়ির কাঁটার মতুন নিজের কাজগুলিন করে যেচে। সিদিন এই পেথম দেখলম, কত্তাকে কাছে ডেকে তার মাথায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললে, খোদার ওপর ভরসা রাখো বাবা!

কত্তা কুনো কথা বললে না, শুদু মায়ের মুখের দিকে কেমন করে একবার তাকাইলে, তাপর মাথা হেঁট করেই সিখান থেকে চলে গেল। খোদার ওপর ভরসা যিদিক দিয়েই রাখি না ক্যানে, অ্যাকন আমি জানি, আশা নাই, আর আশা নাই। আমার বুকের ভেতরে তাকিয়ে দেখি, সিখানে কুনো আশা নাই। খোঁকা কি নিজেও সি কথা জানতে পেরেছে? সব খাওয়া ছেড়েছে সে। মাঝে-সাঝে এট্টু পানি চেয়ে খায়, মুখে চাইতে পারে না, চোখের চাউনিতে চায়। ডাবের পানি দিতে গেলে মাথা নাড়ে, শুদু পানিই খাবে। তার মুখের কথা শুনতে গেলে কান পাততে হয় মুখের কাছে। বুকের দু-পাশের পাঁজর একটি একটি করে গোনা যায়, মুখখানি এইটুকুনি, শুদু ডাগর দুটি চোখের চাউনি আগের মতুনই আছে বরং তার রোশনাই যেন আরও বেড়েছে। না, আশা আর করব না। যেদি তাকে যেতেই হয়, তাইলে আর এত কষ্ট ক্যানে তার, তাড়াতাড়িই নিয়ে যাক তাকে আল্লা– আমি আর সইতে পারছি না, পারছি না।

একদিন এই দুনিয়াতেই দেখলম যে বেহেস্তের ছবি– সি কুনোদিন ভুলব না। খোঁকার অসুখ সারা সোংসারকে অচল করে দিয়েছে। বাড়িতে যি আরও ছেলেমেয়ে আছে সব ভুলে গেয়েছি আমরা। যারা এট্টু বড় হয়েছে, তারা ভয়ে কথা বলে না, রাগ করে না, বায়না করে না। কিন্তুক কি করে ভুলে গিয়েছেলম যি বাড়িতে আমার একটি ছ-মাসের মেয়ে আছে? সি মেয়ে কার কাছে থাকে, কি খায়, কখন ঘুমোয় সি যেন দেখেও দেখতে পাই না আমি। কখনো এসে জড়িয়ে ধরে। বুকে মুখ রাখে। আমার খেয়াল-ও থাকে না। সিদিন বৈকালবেলায় রুগির ঘরে ঢুকতে

যেয়ে দেখি, আমার খুঁকি কখন হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকেচে। অ্যাকন থপ থপ করে একটি-দুটি পা ফেলে হাঁটতে শিখেছে, আবার তাড়াতাড়ি করতে গেলে সাথে সাথে বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়াও জানে, এমনি চালাক। তা ঘরে ঢুকে দেখি, খুঁকি বড় খোঁকার মাথার কাছে খানিকটো উবুড় হয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত দিয়ে তার মুখে-চোখে থাপড়াইছে আর হি হি করে হাসছে। খানিকক্ষণ থাপড় মারছে, আবার চুল ধরে টানছে আর হেসেই যেচে। আমি ভাবছি, না জানি খোঁকার চোখে খুঁকির আঙুল ঢুকে যাবে না কি, না কি নোখের আঁচড় লাগবে– কিন্তুক আমি এগুইতে পারলম না। সিখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলম– খোঁকা হাসছে, খোঁকা কথা বলছে। খোঁকার ঐ হাসি কতোদিন দেখি নাই, যেন আর জন্মে দেখেছেলম খোঁকা হাসছে আর বলছে, বুবু আর মেরো না, আর মেরো না, উঃ খুব লাগছে– য্যাতো সে এইরকম বলছে, খুঁকি ততোই খুশি হয়ে হাসছে আর ভাইকে থাপড়াইছে। খোঁকা আমাকে দেখে নাই, সে বলে যেছে, বুবু, দাঁড়াও, আমার অসুখ করেছে তো, ভালো হই, তোমাকে কতো জায়গায় নিয়ে যাব, তোমাকে কতো কি এনে দেব, কতো খেলনা, কতো খাবার দেব–

আমি একঠাঁই দাঁড়িয়ে দেখছি, এই ঘরে সুয্যির আলো আসে না। অ্যাকন দেখছি সারা ঘরে আলো। বছরের এই সোমায়টোই উত্তরের জানেলা দিয়ে সামান্য এট্টু রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়ে, তাতেই যেন সারা ঘর আলো। আমি ত্যাকন এগিয়ে যেয়ে খুঁকিকে কোলে তুলে লেলম। আমাকে দেখে লাজুক হাসি হেসে খোঁকা বললে, দ্যাখো মা, বুড়ি আমাকে কেমন করে মারছে, উঠতে বলছে। চোখ ভরা পানি নিয়ে আমি তাকে একটি কথাও বলতে পারলম না।

দু-দিন কি তিন দিন পর, একুশ দিন পার হয়েছে ত্যাকন, তবে আটাশ দিন হয় নাই, সকাল থেকেই রুগির আবস্তা খুব খারাপ। সিদিন তাকে কুনো খাবার খাওয়ানো গেল না, ওষুধও খাওয়ানো গেল না। ডাকলে সাড়া নাই, চোখও খুলছে না। সিদিন বাড়ির সব কাজকম্ম বন্ধ রইল।

রাঁধা-বাড়ার কাজেও কেউ গেল না। দেখলম গিন্নিও এসে ছেলের শিয়রের কাছে ননদের পাশে বসল। আমি খোঁকার বালিশটোকে সরিয়ে তার মাথা কোলে নিয়ে বসলম।

আর আমি উঠব না। আর বুঝতে বাকি নাই সে আর থাকবে না। গত দু-দিন থেকেই সিকথা বুঝতে পারছি। চোখে আর পানি নাই যি কাঁদি, চোখ যেন গলে গেয়েছে, কিছুই ভালো দেখতে পেচি না। না, আর পানি নাই, না, আর কাঁদব না। অ্যাকন যেদি কাঁদি, খোঁকা চলে গেলে কি করব? ত্যাকন যি চোখ ফেটে রক্ত ঝরবে গো! তাই লেগে দু-ফোঁটা পানি যেদি থাকে তো থাকুক।

বুঝতে পারছি আজ উ যাবে। সারা গাঁ-ও কি তাই জানে? তা নাইলে এত লোক আসছে কোথা থেকে? ঘর ভরে গেল, এগ্নে ভরে গেল। কিন্তুক সবাইকে দেখছি, কত্তাকে তো কোথাও দেখছি না। তবে কি সে বাড়িতেই নাই? কত্তামার দুই ছেলেকেও দেখছি, সে তাইলে কোথা গেল?

বেলা বাড়ছে, রোদ চড়ছে, ঘরের ভেতর গুমোট গরম, কে ঘরের মানুষদের সরতে বলে? খোঁকার যি অ্যাকন এট্টু বাতাস দরকার। দ্যাওরদের কেউ বোধায় বুঝতে পেরেচে, সে সবাইকে সরিয়ে দিলে— কিন্তুক একজন সরছে তো আরও তিনজনা ঘরে ঢুকছে।

দোপরটো যি কেমন করে পেরুইলো তা বলতে পারব না। সিদিন দোপরটোই আজরাইল হয়ে এয়েছিল। বুকের ওপর সেই যি বসল আর সরলে না। গোটা জেবন পেরিয়ে যেচে, তবু দোপরটো যেচে না। তবু এক সোমায় সুয্যি পচ্চিমে নামতে লাগল, রোদের ত্যাজ এট্টু মরে এল, আর মনে হতে লাগল দোপরটাও বুক থেকে নেমে যেচে। ত্যাকন আমার মনে শান্তি। খোঁকার তাইলে যাবার সোমায় আসছে। অ্যাকন আর অস্থির হতে নাই। সে শান্তিতে যাক। শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলম, অ্যামন মায়ায় ছেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন মওত-ও সেই চাউনি দেখতে পেচে। যে নিশ্বেস নিতে

এত কষ্ট হচিল খোঁকার, সেই নিশ্বেসও যেন সহজ হয়ে এল। খুব আস্তে আস্তে ফিসফিস করে গিন্নি আমাকে বলছে, মেজ বউ, ছেলের মুখে একটু পানি দাও। কি যি হলো আমার, ক্যানে গো, যাদু কি চলে যেচে? বলে এমন চেঁচিয়ে ওঠলম যি ঘরসুদ্দ লোক চমকে উঠল। গিন্নি আমাকে বললে, চুপ চুপ, ও কি করছ– খোঁকার মুখে পানি দাও। এখন নয়, কাঁদার অনেক সোমায় পাবে।

আমি ত্যাকন বড় কাঁসার চামচে পানি ঢাললম, খোঁকার মুখ একটু হাঁ করিয়ে পানি দেলম। হ্যাঁ, সবটুকু পানি খেলে সে, আর এক চামচ ঢেলে ফের দিতে গেলম, ইবার কতক খেলে আর কতক কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

একদম শেষ সোমায়টো আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। কুনোদিন মনে থাকল না। খুব জোরে হিঁড়ুরে উঠে একবার কি নিশ্বেস নিয়েছিল? কেউ যেন শুনতে না পায়, শুদু আমি শুনি এমনি করে কি বলেছিল, মা যাই? কিছুতেই মনে পড়ে না। আমার কোলে ছিল মাথা, শুদু দেখলম, কাত হয়ে কোল থেকে গড়িয়ে পড়ল। ঐ শেষ। খোঁকা চলে গেল! বেলা ত্যাখনো খানিকটো ছিল। সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল বাড়িতে।

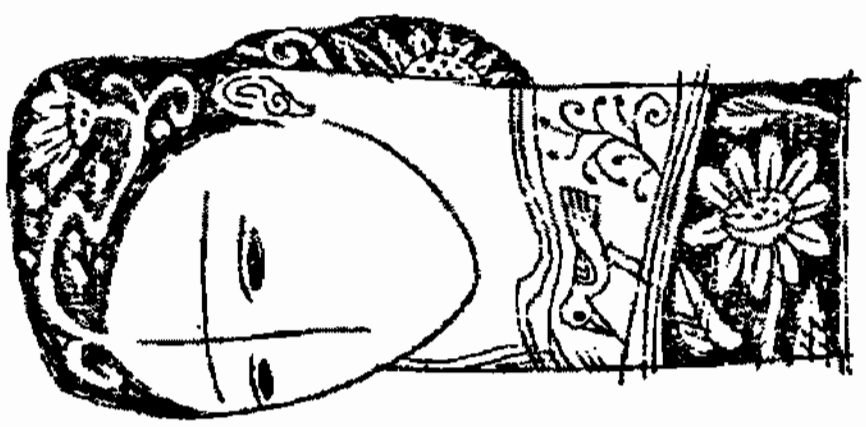

সারা জাহান খাঁ খাঁ– হায়রে শোধ তোলা

যিসব গাঁয়ে আমাদের আত্মীয়কুটুম জ্ঞাতিগুষ্টি থাকত, সেই রেতেই সিসব গাঁয়ে খবর দিতে লোক চলে গেল। গরমকালের দিনে লাশ বেশি সোমায় থাকবে না, য্যাতো তাড়াতাড়ি মাটি হয়ে যায় ত্যাতোই ভালো। যা গরম, মনে হচে কাল সকাল পয্যন্ত লাশ থাকে কি না সন্দ। কিন্তুক আত্মীয়কুটুম এসে না দেখলে তো মাটি দেওয়া যাবে না। তাতে খুব নিন্দে হবে। এত বড় একটো সব্বোনাশ হয়ে গেল, সেটো কিছু লয়। কিন্তুক খবর না পেলে, লাশের দাফনের সোমায় এসে হাজির হতে না পারলে নিন্দেয় কান পাতা যাবে না। দোপর পয্যন্ত লাশ রাখতেই হবে, তাতে লাশ গলুক পচুক, যা-ই হোক।

উত্তর-দুয়োরি ঘরেই রয়েছে খোঁকার লাশ একটো চাদরে ঢাকা। অ্যাকন আর ওখানে থেকে আমি কি করব? য্যাতোক্ষণ সে ছিল, আমি তো তার কাছেই ছেলম, কোথাও যাই নাই। অ্যাকন আর সে নাই– যে আছে সে তো লাশ। উ নিয়ে আর আমি কি করব? শরীল শুকিয়ে কঙ্কাল, সেই কঙ্কালটো চামড়া-ঢাকা পড়ে আছে। খানিক বাদে ঐ চামড়া ফুলে ঢোল হবে, রসানি গড়িয়ে পড়বে সারা শরীল থেকে, দুগ্‌গন্ধ ছড়াবে। লাশ বলতে তো এই! সব লাশই ঐরকম, গলে-পচে হেজে থাকে কবরের ভেতর। কবর না দিলে ঘরেও তা-ই হবে। উয়ার সাথে আমার সোনার যাদু বড় খোঁকার কি সম্পক্ক? আর আমি দেখতে চাই না। তার সোনার মুত্তি আমার মনেই থাক।

তবে কেঁদেছেলম বৈকি। চোখের পানি তো কবেই শুকিয়েচে। কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙে গেল কিন্তুক চোখে যি আর পানি নাই! সবাই কাঁদছিল, আমিও কাঁদছেলম। বাড়িতে কাল রেতে খাওয়া-দাওয়া হয় নাই, সব বন্ধ ছিল। ই বাড়ি উ বাড়ির বউ-ঝিরা এসে চিনি নাইলে গুড়ের শরবত এক ঢোক করে সবাইকে খাইয়েছে। ঘরের ভেতর অতো লোক– কতো আর খাওয়াবে? মাঝরেতের পর লোক অ্যানেক কমে গেল। তবে

গিন্নি ত্যাকন আর ঘরে নাই। ননদ-দ্যাওর-জায়েরা আছে। কাঁদন ত্যাকন আর নাই। হেরিকেনের কাঁচে এমন ধুমো জমেছে যি ঘরে আলো পেরায় নাই বললেই চলে। ত্যাকন আমার বুকের ভেতরটো পাষাণ। আমি সেই আলোয় দেখলম ছায়াবাজি। কতোবার খোঁকা এল গেল, কতো কি করলে, গলা জড়িয়ে ধরলে, তার মুখে আমি চুমো খ্যালম। দেয়ালে আমি সব দেখছি।

আত্মীয়কুটুম দোপরের আগেই এসে পৌঁছুল। লাশ লাওয়ানো ধোয়ানো হলো। সবাই বললে, তেমন লিকিন খারাপ হয় নাই লাশ। সব বেবস্থা হয়ে গেলে আর একবার সবাইকে ডাকলে শ্যাষবারের মতুন মুখ দেখাবার লেগে। দেখলম বটে সবারি সাথে। খোঁকার মুখ আর কি আমার দেখবার দরকার আছে? উ মুখ যি আমি চোখ বুজে য্যাকন খুশি ত্যাকন দেখতে পারি। অ্যাকন ঐ লষ্ট হওয়া মুখ দেখে আমার কি হবে? তবু বললম, যাও বাপ, যেছো যাও, কিন্তুক মায়ের কাছ থেকে আর কোথা যাবে? যেখানেই থাকো মা ডাকলেই আসতে হবে।

দাফন করে সবাই ফিরে আসতে আসতে দোপর গড়িয়ে গেল। তাপর খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে দিনই পেরায় ফুরিয়ে এল। সবাই এসে বাড়ির ভেতরে উত্তরের ঘরের উসারায় বসেছে। আত্মীয়কুটুম এয়েছে, লতুন মা তার ছেলেমেয়ে সবাইকে এনেছে। নানার বাড়ি থেকে আমার ছোট ভাইটি, মামুরা, খালারা সব এয়েছে। কত্তারও যিখানে য্যাতো আত্মীয়গুষ্টি ছিল, কেউ বাদ যায় নাই, সবাই হাজির। আর এয়েছে আমার বাপজি। বাপজি বাড়ি ছেড়ে কোথাও বড় একটো যেত না, একটু অ্যাকলযেঁড়ে ঘরকুনোই ছিল মানুষটো। আমার বিয়ের পরে একবার কি হয়তো দু-বার মেয়ের বাড়ি এয়েছে— তার বেশি হবে না। তবে ই বাড়িতে যা ঘটে গেল, তাতে কি বাপজি না এসে পারে? নাতিটিকে যি বড্ড ভালোবাসত! এই গত ক-বছর বাপের বাড়ি যেতে পারি নাই, তার এগু ফি বছরই গেয়েছেলম। বড় খোঁকা সবারই জান কেড়ে নিত— অমন চুপচাপ রাশভারি নানাও তার খুব বশ হয়েছিল।

সেই আমার বাপজি এয়েছে, আমাকে অ্যাকনো একটো কথা বলে নাই, বলতে পারে নাই। উত্তর-দুয়োরি ঘরের পিঁড়ের পচ্চিমধারে চুপ করে বসে রয়েছে। কাঁদতে তো পারে না মানুষটো, পব্বতের মতুন বসে আছে। শাদা গায়ের রঙ— মুখে চাপ দাড়ি, পরনে শাদা লুঙ্গি আর শাদা পিরেন।

কত্তা ত্যাকন ছিল না। কোথা থেকে এল বাড়ির ভেতরে। ই কদিন যি মানুষটোকে দেখে ভয় পেয়েছেলম, অ্যাকন দেখলম সে আবার সেই আগের মানুষ। শোক-তাপ যেন কিছুই নাই। বাড়ির উঠনে দাঁড়িয়ে সে একবার সবাইকে দেখলে। তাপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল বাপজির কাছে। বাপজি বটগাছের মতুন বসে আর কত্তা দাঁড়িয়েছে তার ছামনে।

সে ছিল আপনার যোগ্য নাতি, আপনি বলেছিলেন আপনার ছেলেকে আপনার কাছ থেকে পর করে দিচ্ছি বলে আমার ছেলেকেও বেশি দিন স্কুলে যেতে হবে না। আপনার নাতি আপনার কথার মান রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আপনার কথাকে সে মিছে হতে দেয় নাই।

হায়, কি বললে, হায় কি বললে, ওগো হায় কি বললে— আসমান থেকে যেন বাজ পড়ল আর যে যিখানে ছিল সাথে সাথে পাথর হয়ে গেল। কত্তার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছি, তাকিয়ে রয়েছি, যেন যুগ কেটে গেল। তাপর গুড়গুড় করে একটো আওয়াজ উঠল, যেন মাটির তলা থেকে আসছে। আমি শুনছি, সেই আওয়াজ হুঁ হুঁ, হো হো, ও হো হো করে বাপজির বুকের ভেতরটো খান খান করে ভেঙে দিয়ে পেলয় বেগে বেরিয়ে আসছে। অতো বড় পব্বতের মতো মানুষটো উসারা থেকে গড়িয়ে উঠনের ওপর যেয়ে পড়ল।

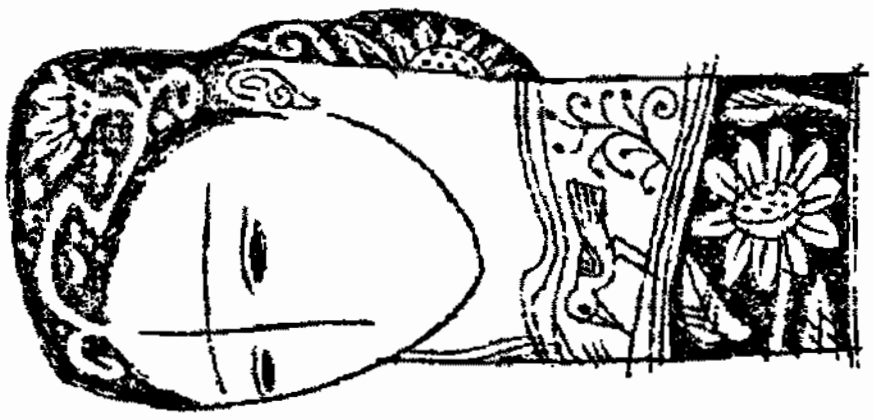

সোংসার কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না

আমার বড় খোঁকা চলে গেল। দুনিয়াদারিতে আর আমার মন নাই— নাই নাই নাই— তবু কি মওত এল? সোংসার কি ক্ষ্যামা দিলে? ছুটি কি প্যালম? বড় খোঁকা গেল তো পরের খোঁকাটি বড় খোঁকার জায়গায় চলে এল। কবে এল তা জানিও না। দেখতে দেখতে সে-ও বড় হয়ে গেল। মোটেই বড় খোঁকার মতুন লয়, গড়ন-পেটন একদম আলাদা। তারও খুব রূপ। কাঁচা সোনার মতুন গায়ের রঙ। এতদিন কিছুই খেয়াল করি নাই, একদিন হঠাৎ দেখি ওমা, ও-ও তো বারো-তেরো বছরের ছেলে হয়ে গেয়েছে। তাপর, মেয়েটি বাড়ির পেথম মেয়ে, সি-ও তিন-চার বছরের হয়ে গেল। মাজা-মাজা রঙ, আঁকা-আঁকা চোখমুখ, এইটুকুনি কপাল, মাথাভত্তি এলোমেলো কালো চুল— ওমা, আমার কি হবে মা— গা থেকে যেন ননী গলচে! অ্যাকন এদের নিয়ে কি করব? পোড়া সোংসার কি জিনিস কে বলতে পারে বলো! শুদু কি তাই? সোংসার ইদিকে আপনা-আপনি বড় হচে। তা সোংসার বড় হবে কি ছোট হবে তাতে তো কারুর হাত নাই। ছেলেমেয়ে কম হোক, বেশি হোক, সবই আল্লার ইচ্ছায়। অ্যাকন যেমন নিজের ইচ্ছায়, তেমন লয়। আট-দশ-বারো-তেরোটা করে ছেলেময়ে হচে, কিছুই করার নাই। আল্লা দিচে তা কে কি করবে? খেতে না পেয়ে, রোগে ভুগে কুকুর-বেড়ালের ছানার মতুন এন্ডি-গেন্ডিগুনো মরে যেচে। ফল পাকার পরে যেমন কলাগাছ মরে, তেমনি করে এঁদুরি-পেঁদুরি ছেলেমেয়ে প্যাটে ধরতে ধরতে মা-গাছটো মরে যেচে। ছেলে হতে যেয়ে মরছে, কি অন্য অসুখে মরছে, কিছুই করার নাই— দুখ-দরদও কিছু নাই। পুরুষমানুষ আবার একটো বিয়ে করে আনছে— আবার এক পাল জম্মাইচে। ই বাড়িতেও তাই হলো। সেজ বউয়ের দুটি খোঁকা, ঐ দুটি খোঁকাকে রেখে সে একদিন চোখ বুজলে। কি রোগ তার হয়েছিল তা কেউ বলতে পারলে না। চিকিচ্ছে আর কি হবে?

গাঁয়ের ডাক্তার ওষুধ দিলে, টোটকা-মোটকা যে যেমন পারলে দিতে কসুর করলে না। ঝাড়ফুঁক পানিপড়া কিছুই বাদ পড়ল না। তা, সেজ বউ বেশি সোমায় নিলে না। কুনো কিছু গেরাহ্যি না করে সে সব ফেলে চলে গেল। খোঁকাদুটিকে অ্যাকন কে দেখে– এই কথা বলে সেজ দ্যাওর ছ-মাস যেতে না যেতে আবার একটি কচি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনলে। যে দুই দ্যাওরের বিয়ে বাকি ছিল এইবার তাদেরও বিয়ে হলো আর বিয়ের পর বেশিদিন যেতে না যেতে তাদেরও ছেলেপুলে আসতে শুরু হলো। সোংসারে কখনো কখনো একজনা-দুজনা করে কমছে বটে কিন্তুক বাড়ছে অনেক বেশি। হাতে-পায়ে গলায়-মাথায় লেয়ালির দড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে যেচে।

কিন্তুক যাই হোক আর তাই হোক, কত্তার খেয়াল সব দিকে। আগের মতুন অ্যাকন আর তাকে সবকিছু নিজেকে দেখতে হয় না, সোংসারের দায়দায়িত্ব এমন করে সে ভাগ করে দিয়েছে যে সব আপন মনেই ঠিকঠাক চলছে, পান থেকে চুন খসবার জো থাকছে না। সবাই নিজের নিজের কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। সেজ দ্যাওর এট্টু আবরের মতুন, ঠিক গোঁয়ারগোবিন্দ লয়, তবে নিজের বুদ্ধিতে কিছু করার ক্ষ্যামতা তার নাই। সোজা মানুষ, কারুর সাথে লাগল তো মারামারি করে নিজে জখম হলো, কি আর কাউকে জখম করে ফেললে। চাষবাস, আবাদের দায়দায়িত্ব ছিল এই সেজ ভাইয়ের ঘাড়ে। মাঝে মাঝে এর তার সাথে গোলমাল-ফ্যাসাদ করে ফেললেও সবকিছু দেখা-শোনাটা সে ভালোই করত। তবে খুব বুদ্ধি ছিল ল-দ্যাওরের, সে দেখতে যেমন সুপুরুষ ছিল, বুদ্ধিসুদ্ধিও তেমনি ভালো ছিল আর কাজে-কম্মেও ছিল চালাক। জমির খবর, আবাদের খবর, ফসলের খবর তার চেয়ে ভালো ই গাঁ তো ই গাঁ, আশপাশের চৌদ্দ গাঁয়ের কেউ ভালো জানত না। সেজকে বুদ্ধি পরামশ্য সব তার কাছেই নিতে হতো।

রাতদিন টেনে করে শহরে যেতে হতো বলে কত্তা ইস্টিশনের কাছে– এক কোশ দূরে ছিল ইস্টিশন– দু-বিঘে জমি কিনে সিখানে একটো ভিটে আর বেরাট একটো মুদিখানার দোকান করা হলো। গঞ্জে একটো বাড়িও হলো, ব্যাবসার লেগে একটো দোকানও হলো। কত্তা এই কাজটো দেখার ভার দিলে ভাশুর আর ল-দ্যাওরের ওপর। নামেই থাকল বড় কত্তা, আসল দায়িত্ব ল-দ্যাওরকেই নিতে হলো। আমি য্যাকন বিয়ে হয়ে ই বাড়িতে আসি, এই মানুষটি ত্যাকন একেবারেই ছেলেমানুষ। আমার চেয়েও বয়েসে ক-বছরের ছোট তো! বড় খোঁকা য্যাতোদিন বেঁচে ছিল, সে ছিল এই দ্যাওরের চোখের মণি। সে চলে গেলে তার বুকে যি কেমন বেজেছিল তা আমি জানি। তারপর থেকে এমন করে সে ব্যাভার করত যেন সেই আমার বড় খোঁকা। অ্যাকন যি তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকনও সে তেমনিই আছে।

এই সিদিন ছোট দ্যাওরের-ও বিয়ে হয়ে গেল। উ আর কিছুতেই কলেজে ল্যাখাপড়া করলে না। কত্তা কতো বুজুইলে–সে খালি কাঁদতে লাগলে, বড় খোঁকাই চলে গেয়েছে, আর কিসের ল্যাখাপড়া! চাকরি-বাকরি একটো খুঁজে নিয়ে কত্তার পাশে দাঁড়ানো দরকার। তা বিয়ের আগেই চাকরি একটো পেলে সে। কত্তা আর আপত্তি করলে না। শহরে বাসা করে দিয়ে ছোট বউকে সেখানে পাঠিয়ে দিলে। আমাকে বললে, এই প্রথম গাঁ ছেড়ে শহরে বাড়ির একজন বসবাস করবে। তা করতে হবে না? চিরকাল কি সবাই কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকবে? দুনিয়াটাকে দেখে-শুনে নিতে হবে না?

সোংসার যাকে বলে ভরা-ভত্তি। চাষের জমি একশো বিঘের ওপর। চারজনা কাজের মুনিষ সারা বছর আছে। সোম্‌বছরের রাখাল আছে। একটো গোয়ালে গরু-ছাগলের জায়গা হয় না, আর একটো করতে হয়েছে। বাড়ি সব সোমায় গমগম করছে।

তবে যতো বড়ই হোক সোংসার, গিন্নি কিন্তুক সেই আমাদের শাশুড়ি। কত্তা সেই যি বলেছে, মা, সব হবে তোমার হুকুমে– সেই

কথাটির নড়চড় হবার উপয় নাই। আমি জানি, এতটো বয়েস হয়ে গেল– অ্যাকনো যেদি গিন্নির কথার এতটুকুনি অগেরাজ্যি করি, নতিজার অবদি থাকবে না। কত্তা ঠিক হাত ধরে বাড়ির বাইরে দিয়ে আসবে। ভিন্ ভিন্ গাঁ থেকে লতুন বউ-ঝিরা আসছে। তারাও ছেলেপুলের মা হয়ে যেচে, তবু তাদের কেউ যেদি গিন্নির ছামনে হাতের বালা ঘোরাইছে, একটু ঠোসক কি গরব দেখাইছে, কত্তা ঠিক তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

অ্যাকন আমার মনে হয়, কত্তার সারা জেবনের কাজ যেন আগের থেকে বাঁধা। বেঁধেছে সে নিজেই, কারু কথা শুনে লয়। কারু কথা শোনার লোক সে লয়। বোধায় পেথমেই ঠিক করে নিয়েছিল, বাপ মরার পরে ভাইবুনদের কেউ যেন বুঝতে না পারে যি বাপ মরেছে, মা যেন না মনে করতে পারে যি, বাপ চলে যাবার পরে এতিম ছেলেমেয়েগুনো পানিতে ভেসে যাবে আর লোকের দয়ায় বেঁচে থাকবে। আরও একটো কথা কত্তা ভেবে রেখেছিল যি, সোংসার যতো খুশি বড় হোক, বরং য্যাতো বড় হবে ত্যাতোই ভালো– সবাই একসাথে থাকবে, লোকজনে আত্মীয়কুটুমে বাড়ি সব সোমায় গমগম করবে। কিন্তুক সে নিজে থাকবে দূরে, নিজে থাকবে একা। সত্যিই, কিছুতেই বাড়ির ভেতর আসত না। মা ডেকে পাঠাইলে আসত, খুব বড় বেপদ-আপদ, রোগ-শোক বা খুশির খবরে আসত, আবার খানিকক্ষণ বাদেই চলে যেত তার বাইরের ঘরে। বাইরের ঘরে, মানে বৈঠকখানা নয়, দলিজ তো আলাদা, বাড়িরই একটো ঘর এট্টু অ্যাকানে ছিল, কত্তা সেই ঘরে থাকত, শুত। এই ঘরেরই বাইরের দিকে একটো পরচালি ছিল, সেখানে চেয়ার পেতে বসে থাকত বেরাট খামারের দিকে মুখ করে। সি জায়গাটো খুব ঠান্ডা ছেঁয়া, কুনো মানুষজন সিদিকে যেত না, বোধায় গরুছাগলও সিদিকে যেতে ভয় করত।

এত বড় সোংসারের কত্তা, বাড়ির ভেতরে এত লোক, এত কাচ্চা-বাচ্চার চ্যাঁ ভ্যাঁ– কত্তা নিজেই এত বড় সোংসার গড়েছে, তবু

সে নিজে থাকত দূরে। মানুষজন তেমন পছন্দ করত না। মজা-ফুত্তি করে অনেক মানুষের সাথে তাকে কুনোদিন গল্প-গুজব করতে দেখি নাই। তার ছামনে গেলেই, সে যে-ই হোক, তার পা কাঁপত, কথা আটকে যেত। পথেঘাটে, বাড়ির ছেলেই হোক আর পাড়ার ছেলেমেয়েই হোক, কত্তাকে দেখলেই ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। কিন্তুক কত্তা ঘরের কিংবা বাইরের কুনো ছোট ছেলেমেয়েকে বকেছে বলে আজ পয্যন্ত মনে করতে পারি না। এমনিই রাশভারি মানুষ ছিল সে। ঐ যি ঘরে থাকত, সকালে দোপরে রেতে তার খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হতো ঐ ঘরে। তার খাবার সামান্য, এই এতটুকু, কিন্তু সে যা বলে দিত তাই রাঁধতে হতো। এইসব লেগে মনে হতো কত্তার সবকিছুই আগে থেকে বাঁধা। সোংসারের সব বিলি-বেবস্থা করে দিয়ে, যার যেমন কাজ তাকে তেমন ভার দিয়ে কত্তা য্যাকন দেখলে আর কুনো গোলমাল হবে না, সোংসার ঠিকমতো চলবে, ত্যাকনই সোংসার থেকে দূরে গেল। মন দিলে সারা এলেকার মানুষের কাজে।

তা অ্যাকন মনে হয় বৈকি যি কত্তা আর একটি জিনিশ চাইত— সেই জিনিশটি হলো খ্যামতা। সোংসারের খ্যামতা তো সে পেয়েই ছিল, তা নিয়ে কারু কুনো কথা ছিল না। তার সোংসারের বাইরেও খ্যামতা পাবার লেগে সে জেনে হোক না জেনে হোক, আমি ঠিক বুঝতে পারি, অ্যানেকদিন থেকে অ্যানেক চেষ্টাই করছিল। যি মানুষ কুনো কথা বলতেই চাইত না, আমি ইস্ত্রী বলে আমারও কুনো আলেদা খাতির ছিল না, সেই মানুষ মন-মেজাজ ভালো থাকলে আমাকেও দু-একটো না বলে পারত না। বাইরের কতো আন্‌কা লোক কবে থেকে বাড়িতে আসে, কি কাজে কত্তা পেরায় পেত্যেকদিন গাঁয়ের বাইরে যায় আবার সাঁঝবেলায় ফিরে আসে, বাড়িতে কতো কাগজ-বই আসে, দ্যাশের ভেতরে কতো কি হচে তা নিয়ে কত্তা আজকাল কথা দু-একটো বলে। ইসব কথায় ত্যাকন তেমন কিছু মনে হতো না। কিন্তুক একদিন রেতে কত্তা আমাকে যখন বললে সাতটো গাঁ নিয়ে

যি ইউনিন, সেই ইউনিন নিয়ে সে নিব্বাচন করবে, ত্যাকন মুখ ফুটে বলেই ফেললম।

তোমার বুজিন অ্যাকন খুব খ্যামতার পেয়োজন? দ্যাশে কতো রকম হানাহানি হচে, তুমিই তো বলো, হিঁদু-মোসলমানে হানাহানি, বিটিশ তাড়ানোর লেগে হানাহানি– সব জায়গায় হানাহানি। গাঁ-ঘরও বাদ যেচে না। এই হানাহানিতে তুমিও ঢুকবে? খ্যামতার লেগে?

ক্ষমতার জন্যে কি লোকে ক্ষমতা চায়– আমার কথা শুনে কত্তা রাগলে না,– ক্ষমতা চায় কিছু কাজ করার জন্যে। ক্ষমতা পেলেই তবে কিছু করা যায়– নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া যায়– আবার দেশের কাজও করা যায়। ক্ষমতা না পেলে কিছুই করা যায় না। নিজেরও না, পরেরও না। শোনো! হানাহানি কিছু হবে না, আর যদি হয় তো হবে। ইউনিয়ন নির্বাচন আমাকে করতে হবে। ক্ষমতা পেলে নিজের জন্যে কিছু করব না, শুধু দেশের কাজই করব, এই কথাটি আমাকে বলতে হবে বটে তবে তা সত্যি নয়। দুটিই করতে হবে– নিজের জন্যে কিছু করব, দেশের মানুষের জন্যেও কিছু করব। তোমাকে বলি, যদি একটা নিজের কাজ করি, দশটা সমাজের কাজ করব। কথার কথা বলছি না, যা বলছি তাই করব।

এই কত্তা লোকটিকে আমি য্যাতোদূর চিনি– আমার ছেলেমেয়ের বাপ, বাড়ির কত্তা বলে লয়– অন্য একটো লোক মনে করেই বলছি, এই লোকটিকে বিশ্বেস করা যায়। ওর যি কথা সেই কাজ। তা নাইলে কেউ বলতে পারে, খ্যামতা পেলে নিজের লেগেও কিছু করব, পরের লেগেও করব? এমন হিশেব করে কেউ বলতে পারে নিজের একটো করলে দ্যাশের দশটো কাজ করবে?

আমি জানি উ যেদি জানে মরেও যায়, তবু তা-ই করবে। উ কি কম কঠিন পাষাণ! সারা তল্লাটের লোককেও উ বোধায় বিশ্বেস করাতে পেরেছিল ই কথা। ইটি হিঁদুদের এলেকা, সাত গাঁয়ের মদ্যে মাত্তর একটি ছোট গাঁ মোসলমানদের, আর দুটি গাঁয়ে দু-চার ঘর

আছে, বাকি সবই হিঁদু। কত্তার বিরুদ্দে নিব্বাচনে দাঁড়িয়েছিল সব বাঘা বাঘা হিঁদু। সব হেরে গেল তার কাছে। কতো কথাই না বললে তার লেগে! উ মোসলমান, ভিন্ জাত, উ হিঁদুদের মাথায় পা দিয়ে শাসন করবে। ই হিঁদুদের এলেকা, কতো বামুন-বদ্যি ইখানে বাস করে, কতো শিক্ষিত হিঁদু ই তল্লাটে রয়েছে, সব বাদ দিয়ে একটো মোসলমানকে ইউনিনের পেসিডেন করতে হবে ক্যানে? কতো কথাই না বললে! কিন্তুক কিছুতেই কিছু হলো না। হিঁদুরা, কত্তার শত্তুর হিঁদুদের কথা ঘাড়াইলে না। কত্তাই জিতলে। কত্তা জিতলে যি আনন্দ -ফুত্তি হতে লাগল তাতে ভালোই বোঝলম, কত্তা হিঁদু-মোসলমান সক্কলেরই নয়নমণি। তাপরেও মানুষের ভ্যাদ পাওয়া কি কঠিন দ্যাখো! কত্তামার সেই ছেলেদুটি, সেই দুটিকে তো কত্তাই নিজের হাতে মানুষ করেছে, তারা তার আপন ভাইদের বাড়া, কি না করেছে কত্তা তাদের লেগে আর তারাও কত্তাকে দাদা বলতে অজ্ঞান, আমাকেও বউদিদি বউদিদি করে এমন সোম্মান করে অথচ কত্তা একদিন ভোটের সোমায় কোন্ গাঁ থেকে অ্যানেক রেতে ফিরে এমন একটো কথা বললে যি আমার মুখের রা-কথা বন্ধ হয়ে গেল।

পাশের গাঁয়ের ভদ্দরলোকদের সাথে কথা বলতে বলতে অ্যানেকটো রাত হয়েছে। ফেরার সোমায় সঙ্গে যারা ছিল— গাঁয়ের হিঁদু-মোসলমান দু-রকম মানুষই ছিল— তারা সব নিজের নিজের বাড়ির দিকে গেলে হিঁদুপাড়া দিয়ে কত্তা একাই আসছিল। আঁদার তেঁতুলতলাটো পেরুতে যেতেই দেখতে পেলে কে একজনা জুবুথুবু হয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়-ডর বলে কুনোকিছু তো কত্তার কুনোদিন নাই। কে রে ওখানে— বলে কত্তা তার কাছে যেতেই দেখতে পেলে কামারপাড়ার মদন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। এখানে তুই কি করছিস রে— বলতেই মদন তেমনি কাঁপতে কাঁপতেই কত্তার পায়ের কাছে বসে পড়ল। চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল এই বড় পাঁটা কাটার এক চকচকে খাঁড়া। মদন, একি রে— আমি একথা

বলতেই কালিপ্রসাদের নাম করে বললে, ছোড়দা আমাকে বললে আপনি যখন তেঁতুলতলা দিয়ে বাড়ি যাবেন, তখন চোখ বুঝে আপনার ঘাড়ে যেন একটা কোপ বসিয়ে দি।

তা কোপ বসাতে পারলি না তো? যা বাড়ি যা।

কি পাপ আমি করতে যাচ্ছিলাম, আমার যে নরকেও জায়গা হবে না। মদন হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

যা বাড়ি যা, শুধু শুধু কখনো খাঁড়া বার করিস না।

কত্তা জিতলে কিন্তুক বাড়িতে কুনো হৈ চৈ হলো না। একবার শুদু সে বাড়িতে মা আর বুনের কাছে এল। মা বলে একবার শুদু দাঁড়াইলে, আর কিছু বললে না। গিন্নিও একটো কথাই বললে, বাবা, আমার সব আশা পুরেছে, আর কিছু চাই না।

বাড়িতে একটু জাঁকজমক, একটু বড়লোকি ঠাট-ঠমক হলো বৈকি। ঘোড়াটো বদলানো হলো, যেটো ছিল সেটো বিক্রি করে লতুন ভালো জেতের বড় একটো ঘোড়া কেনা হলো। পালকিটো লতুন করে ছাওয়ানো, রঙ করা হলো। গরুর গাড়ির ছইটোকেও আবার রঙ করা হলো, নাঙল বোধায় আর একটো বাড়ল, হাতির মতুন আরও এক জোড়া মোষ এল বাড়িতে। ঘর-দুয়োর সব ল্যাপা-মোছা হলো, খামারের ঘাস লতা-পাতা পোঙ্কার করা হলো। দলিজ ঘরটোকে সাফ-সুতোর করে লতুন করে সাজানো হলো। খামার থেকে দলিজে ওঠার সিঁড়িটো রাজমিস্ত্রি এনে পাকা করা হলো। দলিজ ঘরের মাটির দেয়ালের পেছন দিকটো যাতে পানির ছাঁটে লষ্ট না হয়, সেই লেগে লতুন করে আলকাতরা ল্যাপা হলো। তাপর এল অ্যানেকগুলিন কাঠের চেয়ার আর টেবিল। পাড়াগাঁয়ে উসব ত্যাকন কে দেখেছে? সারা গাঁ খুঁজলে একটো-দুটো দবজ শালকাঠের চেয়ার হয়তো মিলত, টেবিল আর কোথা? কিন্তুক আমাদের দলিজটিকে চেয়ার টেবিলে সাজাতেই হলো কত্তাকে। এটি যি অ্যাকন কোট হবে। তাই নানা আসবাব আসছে– আপিসের কতোরকম জিনিশপত্তর কতোরকম

কাগজখাতা। সবশ্যাষে এল একটি একনলা বন্দুক। এই জিনিশটি য্যাকন এল, একমাত্তর তখুনি দেখলম গিন্নি আপত্তি করলে। কেন বাবা— মানুষ মারার এই অস্তরটি আনতে গেলে? কত্তা তার জবাবে বললে, মানুষ মারার জন্য নয়, মানুষের ধন-প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই এটি কেনা হলো মা। এখন থেকে তোমার ছেলের দায়িত্ব শুধু তোমার সংসারটিই নয়, বহু সংসারের দায়িত্বই এখন তার। তাছাড়া— আরও কি একটো কথা কত্তা বলতে গিয়েও বললে না।

যা বলছেলম, একটু বেশি জাঁকজমক, একটু বড়লোকি হলে আর কি করা যাবে? ধনে-জনে ফলে-ফসলে ফেটে পড়ছে সোংসার। হবে না-ই বা ক্যানে? দিনকে তো একবার দোপর হতেই হয়, চড়তে চড়তে সুয্যিকে একবার উঠতে হয় আসমানের মাথায়। এ-ই লিয়ম। ই সোংসারের অ্যাকন তা-ই।

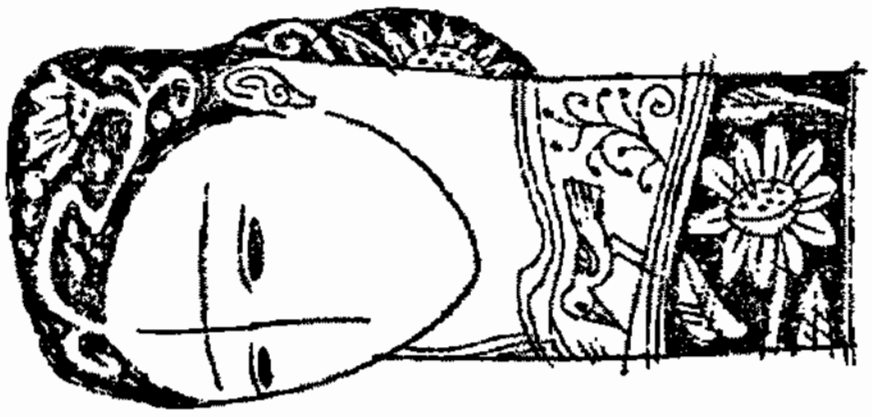

কতো লোকের কতো বিচের, কতো বিধেন

কোট বসত রোববারে। যতোদূর মনে হচে রোববারেই কত্তার আদালত বসত। রোববার ছুটির দিন বটে, গাঁয়ের ইশকুলেও ছুটি হতো ঐদিনে শহর-গঞ্জের মতুনই। কিন্তুক ইশকুলটো বাদ দিলে গাঁয়ে আবার ছুটি কি! সেই লেগে মনে হচে দলিজে কোট বসত রোববার-দিন। দলিজঘরের ভেতরে-বাইরের দুই উসারায়, নামোয় খামারে লোকজন গমগম গিসগিস করত। সাত গাঁয়ের লোক ঐদিন তাদের য্যাতো নালিশ-ফরিয়াদ নিয়ে আসত।

বাড়ির বউ-ঝিদের বাইরে আসার লিয়ম ছিল না। পুরুষদের কাজ আলেদা, মেয়েদের কাজ আলেদা। মেয়েরা দিনে-রেতে বাইরে যাবে না, পায়খানা-পেশাবের বেগও ধরে রাখতে হবে। কেউ শুদুবে না তো বটেই, পুরুষরা বোধায় জানেও না যি মেয়েদের ঐসব দরকার আছে। রাত হলে চোরের মতুন বাড়ির আশপাশে, পুকুরঘাটের ধারে বউ-ঝিরা চলে যেত। কারুর ছামনে উ কথা তোলাও শরমের কথা। সারাদিন বাড়িতে থাকো, চোখে ঠুলি লাগিয়ে একই জায়গায় হাজার বার পাক মারো, গুষ্টির লেগে রাঁধো, ছেলেমেয়েকে দশবার বুকের দুধ খাওয়াও, গভ্‌ভো থাকলে চোখ-কান বুজে বয়ে বেড়াও! মিয়ে-মোকাদিমদের বাড়িতে এই ছিল লিয়ম। তা বলে গরিব সাধারণ আবস্তার মোসলমানদের লেগে ই লিয়ম লয়, সিখানে ঘর-বার সমান। পর্দাপুশিদার বালাই নাই। সে যা-ই হোক, উয়ারই মদ্যে ই সোংসারটো একটু আলেদা ছিল আর আমি তো অ্যানেক পুরনো বউ-মানুষ, আমি নাচদুয়োরের কাছে যেয়ে বাড়ির পুরনো পাঁচিলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে খামারের দিকে অ্যানেক সোমায় তাকিয়ে থাকতম।

আজও দেখছেলম, আশপাশের গাঁয়ের ভদ্দরলোকেরা সব এয়েছে ক্ষারে কাচা ধুতিজামা পরে। হিঁদু-মোসলমান বেশির ভাগেরই এই পোশাক। মোসলমানদের কেউ কেউ তহ্‌বন পরেও এয়েছে। গরিব মানুষদের ক্ষারও জোটে নাই— শস্তা সাজিমাটিতে ধোয়া জামাকাপড় পরে এয়েছে তারা। তবে নালিশ করার লেগে বাদী-ফরিয়াদি যারা এয়েচে তাদের পেরায় সবারই খালি গা। দলিজের ভেতর-উসারায়, যেখানে চেয়ার-টেবিল পাতা আছে, সেখানে কোট বসেছে। লোকের ভিড়ে কিছুই দেখা যায় না। কোটের আর সব মেম্বররা সেখানে চেয়ারে বসে আছে, বিচের চলছে। কত্তা একদিন বলেছিল, ইখানে আর বিচের কি হবে? খুন-জখম ভায়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ডাকাতি-রাহাজানির বিচের ইখানে হয় না। ওসব আমরা সদরে মহকুমায় পাঠিয়ে দিই। ছোটখাটো নালিশ ফরিয়াদ নিয়ে যাতে লোকে শুধু শুধু শহরে না যায়, হয়রানি

না হয়, টাকাপয়সা খুইয়ে না আসে, এখানে শুধু সেইসবই বিচের করি। দু-পাঁচ টাকা জরিমানা করতে আর এক দিনের জেল দিতে পারি আমি। একটু মিলিয়ে-মিটিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ, বুঝেছ? এলেকায় যাতে শান্তি থাকে।

তা নালিশ-ফরিয়াদের কথা শুনলে হাসিও লাগে বটে! কে কাকে কাঠ-পিঁপড়ের গত্তর ওপর ঠেসে ধরেছে, পিঁপড়ের কামড়ের বিষে বেচারার জ্বর এসে গেয়েছে, কে মসিদে হাত দিয়ে মিছে কথা বলে পাওনা টাকা দেয় নাই– কোন্ বুড়ি বুঝিন মা-কালীর থানে এক ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলে ভাত দেয় না বলে নালিশ করেছে– তা মা-কালী বেবস্থা করে নাই বলে কোটে এয়েছে কেস্ করতে। এমনি সব নানা কথা নিয়ে মামলা। মাঠ থেকে ধানের আঁটি চুরি, মরাই থেকে এক-আধ মণ ধান বার করে নেওয়া, হোক মোটা ছেঁড়া শাড়ি, শুকুইতে দেওয়া ছিল, সেই শাড়িটো চুরি করা– এইসব লিকিনি নালিশ!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলম, লতুন ঘোড়াটো নিয়ে এল হাড়িপাড়ার সইস। ঘোড়ার হাঁটা দেখলে বিশ্বেস হয় না ঐ ঘোড়াই অমন টগবগ করে ছোটে। হটর হটর করে ঘোড়ার শুদু হাঁটা দেখলে ঘোড়াকে ঘোড়া বলেই মনে হয় না, মনে হয় অন্য কুনো জন্তু। ঘোড়াটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল সইস। ইখানে আনলে ক্যানে? বোধায় সবাইকে একবার দেখাইতে চাইছে। হাঁ করে সব দেখছেও বটে। ঠিক বুঝতে পারছি না এত দূর থেকে, তবু মনে হচে চাষাভুষোদের মদ্যে থেকে দু-একজনা ঘোড়ার বেশি কাছে এগিয়ে গেলে বাগদিপাড়ার দফাদার তাকে হাতে ধরে সরিয়ে দিচে। দফাদার এমনিতে ত্যানা পরে থাকে আর অ্যাকন তার সরকারি পোশাকের কি বাহার! নীল জামা, হাফ প্যান্ট– সি এমনি মোটা যি ইহজন্মে ছিঁড়তে পারবে না। সেই জামার ওপরে পেতলের ঝকঝকে তকমা আঁটা। বাউরিদের একজনা জমাদারও আছে। তারও ঐ পোশাক। এমনিতে গরিব মানুষ তারা— যেমন

গরিব, তেমনি বেচারা, সাত চড়ে রা কাড়ে না, গায়ে আবার অসুরের মতুন বল— অ্যাকন এই পোশাক পরে তাদেরও যেন গরবে মাটিতে পা পড়ছে না।

এই সোমায় বেরাট একটো কাজ হতে যেচে শোনলম। সি কাজটো কত্তা যেদি করতে পারে, তাইলে এলেকার লোকে তাকে দু-হাত তুলে দোয়া-আশীব্বাদ করবে। সেই কবে থেকে টেরেন চালু হয়েছে। য্যাকন ইচ্ছা লোকে জেলা শহরে, মহকুমা শহরে যেতে পারে। দিনে দিনে যেতে পারে, আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তুক ই গাঁ থেকে এক কোশ দূরের ইস্টিশনে যাবার কুনো রাস্তা নাই। মাঠজুড়ে শুধু ধানের জমি। ধান আর ধান, আর কিছু নাই, গাছপালাও পেরায় কিছু নাই। সেইসব জমির আল ধরে, কখনো বা শুকনো ড্যাঙার ওপর দিয়ে সাপ-খোপ ভরা কাঁটা-জঙ্গল মাড়িয়ে তবে ইস্টিশনে যেয়ে টেরেন ধরতে হয়। বর্ষাকালে মানুষের কষ্টের অবধি থাকে না। ত্যাকন আল-রাস্তার কুনো চেন্নও থাকে না। কাদায় পানিতে নাকাল হয়ে কি কষ্টই না হয় মানুষের ইস্টিশনে পৌঁছুইতে। গরু-মোষের গাড়িও ত্যাকন অচল হয়ে যায়। শোনলম, অ্যাকন লিকিনি ইউনিন বোড থেকে সড়ক করে দেবে। কাঁচা সড়কই হচে বটে, কুনো একদিন হয়তো পাকা হবে। শুধু ই গাঁ থেকে ইস্টিশনে যাবার লেগেই এই এক কোশ সড়ক হচে না, তা যেদি হয়, তাইলে কত্তার দুর্নামের অন্ত থাকবে না। সড়ক হবে মোট পাঁচ কোশ। ইউনিনের সাতটো গাঁকেই ই রাস্তার সুবিধা দিতে হবে। পুবের গাঁগুনোর একটো থেকে ই রাস্তা বেরিয়ে আরও দু-তিনটো গাঁয়ের পাশ দিয়ে আমাদের গাঁয়ের একবারে ভেতরে এসে ঢুকবে। রাস্তা উদিকে চার কোশ, ইদিকে এক কোশ।

রাস্তা হবে, না রাস্তা হবে— যে শুনছে সেই খুশি! কত্তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। ত্যাকনো জানি না ইয়ার মদ্যে আবার এক বেপার আছে। কত্তা বলতেই বোঝলম। কত্তা একদিন বললে, রাস্তা তো হবে, কিন্তু জমি নষ্ট হবে অনেক। ডাঙা-ডোবা যা রাস্তার মধ্যে

পড়বে তা বাদ দাও, চাষের জমি কতো নষ্ট হবে তা কি বুঝতে পারছ? এত জমি কে দেবে?

তাই তো বটে, কত্তা য্যাকন এই পাঁচ কোশ সয়রানের লেগে কতো ধানের জমি লাগবে, তার হিসেব দিলে, ত্যাকন আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়। যাদের জমি যাবে সরকার তাদের ক্ষেতি পুষিয়ে টাকাপয়সা কিছু দেবে। কত্তা বললে সরকারের কথা ছাড়ো। সারা দেশের কতো বিরাট বিরাট ব্যাপার নিয়ে সরকারের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। সরকারের কথা হলো, নিজের নিজের এলেকায় তোমাদের রাজা করে দিয়েছি, যা করবে নিজেরা টাকা-পয়সা জোগাড় করেই করবে। তা সরকার একদম কিছু দেবে না, তা নয়। যাদের যাদের জমি নেওয়া হবে, তাদের সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এই শুরু হলো। রাতদিন লোক আসছে। বড়লোক ছোটলোক মানামানি নাই। কি? না, তার জমিটো বাদ দিয়ে রাস্তা এট্টু সরিয়ে করতে হবে। গরিব কুনো চাষি এসে বলছে, তার মোটে দু-বিঘে জমি, রাস্তাতে চলে যেচে দশ কাঠা, তাইলে সে কি করে বাঁচবে। এই জমিটুকু ছাড়া তার আর কিছু নাই– ঐ জমিটুকুনি থেকে যে ধান সি পায়, তাই দিয়ে ভাত-কাপড়, ত্যাল, নুন, ডাল, কেরাসিন সব জোগাড় করতে হয়। দশ কাঠা গেলে সে ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোস করে মরবে। এইরকম কথা নিয়ে কতো গরিব চাষাভুষো যি পেত্যেক দিন আসছে তার হিসেব নাই। উদিকে বড়লোক যারা তাদেরও আসার কামাই নাই। তাদেরও ঐ একই আবদার, তাদের জমি থেকে রাস্তা সরিয়ে নিতে হবে।

এই এদের নিয়েই বিপদ বেশি বুঝলে? গরিবদের তাড়িয়ে দিলেই হলো। যা, যা দিকিনি এখান থেকে, স্টেশনে যাবার রাস্তা হতে হবে, সে রাস্তা কি আসমান থেকে আসবে? রাস্তা হবে– গ্যাঁট গ্যাঁট করে হেঁটে বাবুর মতো স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবি, তার জন্য একটু স্বার্থত্যাগ করবি না? যা, ম্যাপ হয়ে গিয়েছে, সে আর কেউ বদলাতে পারবে

না, ক্ষতিপূরণটা যাতে ঠিক হয় দেখব, যা। গরিব চাষিদের ইসব কথা বলে আটকাতে পারা যায়, বড় বড় জমিঅলাদের কি বলবে? এক কাঠা জমি গেলে গরিবের যতো না গায়ে লাগে, এদের লাগে তার দশগুণ। সব রাঘব বোয়াল আবার কি রকম গুণধর— জমি বাঁচাবার জন্যে পয়সা খরচ করতেও রাজি। পারলে গভমেন্টকেও ঘুষ দেয়।

আমি জানি, কত্তা পারত সিধে রাস্তা করতে। আর য্যাতোটো সম্ভব গরিবের জমি বাঁচাবার লেগেই চেষ্টা করবে। শ্যাষ পয্যন্ত কি হলো জানি না। রাস্তা হতে সোমায় অ্যানেকটোই লাগল, চার-পাঁচ বছর পেরায়।

রাস্তা কত্তা কিছুতেই সিধে করতে পারবে না। অবশ্যি সি একা তো আর রাস্তা করে নাই, আরও সব মেম্বররা ছিল, ম্যালা ওপরঅলা ছিল। তবু রাস্তা তো তার এলেকাতেই হচে, তার দায়িত্বই বেশি। কত্তা কখনো কখনো বলত, মুখটা ত্যাকন একটু খুশিতে ভরা, ওমুক খুব গরিব মানুষ— বেচারার মোটে দেড় বিঘে জমি, চাষবাসের শেষ দিনে গাঁয়ের লোক ব্যাগারে তার জমিটুকু আবাদ করে দেয়। সেজন্যে সারা মরশুম সে নিজেই ব্যাগার খাটে। তার ঐটুকু জমির তিন কাঠা রাস্তায় চলে যাচ্ছিল, কি করব, কোনোরকমে জমিটুকু বাঁচিয়ে দিলাম বটে, রাস্তা কিন্তু ঐ জায়গাটায় ত্যারাব্যাঁকা হয়ে গেল। দু-এক জায়গায় বড়লোকদের চাপেও ওরকম করতে হয়েছে। নাঃ, যেমন রাস্তা হবে মনে করেছিলাম, তেমন হবে না।

হবে হবে, হচে হচে করে রাস্তা হতে বেশ ক-বছর লেগে গেল। তাপর শোনলম, জেলার বড় সায়েব আসবে। বিদিশি বিটিশ শাদা সায়েব— সেই সায়েব এসে ফিতে কাটবে, তাপরে সবার লেগে রাস্তা খুলে দেবে। আমাদের জান ভয়ে কোণে কোণে লুকুইতে লাগল য্যাকন শোনলম সায়েব গাড়ি নিয়ে লতুন রাস্তা দিয়ে সোজা আমাদের বাড়িতেই আসবে, তাপর যিখানে ফিতে কাটার বেবস্থা হয়েছে সিখানে যেয়ে যা করবার করবে। সায়েবরা কেমন মানুষ, কি খায়, কি করে

কিছুই জানি না। আমরা তো কুন্ ছার, কত্তারাই তার কুনো কথা বুঝতে পারবে না। একটো কথা তাকে বলতেও পারবে না। ইসব কথা কত্তাকে বলতে গেলম, তা সে রেগে ধমকে দিলে। এসব তোমাদের ভাবতে হবে না। বাড়ির কোনো খাবার সায়েব খাবে না। যেমন আসবে তেমনি সোজা গিয়ে চেয়ারে বসবে, কাগজপত্তরে সই করবে। খামারে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে– পাঁচ মিনিট, বড়জোর দশ মিনিট, তার বেশি সায়েব এখানে থাকবেই না। আমরা সদর থেকে দার্জিলিং-চা, বিলিতি বিস্কুট এইসব এনে রাখব, যদি কিছু খায় তখন দেখা যাবে।

সায়েব যিদিন আসবে সিদিন সারা গাঁয়ে উচ্ছব। আধাবেলায় আসবে সে। সিদিন গাঁয়েব সব্বাই সকালবেলাতেই গা ধুয়ে যার যেমন ভালো জামাকাপড় আছে তাই পরে ঘরের-মাঠের কাজকম্ম বাদ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সায়েব আসে। হিঁদুদের সব এয়োতিরা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে চুল আঁচুড়ে নিজের নিজের বাড়ির দুয়োর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলে, মোসলমান বাড়ির বউ-ঝিরাও দেউড়ি দুয়োরের আড়ালে-আবডালে দাঁড়িয়ে রইলে সায়েব এলে দেখবে বলে। ঐসব দিকে সায়েবের গাড়ি হয়তো যাবেই না তবু সব দাঁড়িয়ে রইলে আর সারা'গাঁয়ের হিঁদু মোসলমান পুরুষমানুষদের পেরায় সবাই আমাদের দলিজের ছামনে খামারবাড়ির মাঠে এসে জমায়েত হলো।

ইশকুলেও সিদিন ছুটি দেওয়া হয়েছেল। মাস্টাররা সব ফরশা জামাকাপড় পরে এয়েছে। বোডের মেম্বর, আদালতের কেরানিবাবুরা, গাঁয়ের আর ভদ্দরলোকদের কেউ আসার বাকি নাই, সবাই হাজির। শুধু আমাদের বউ-ঝিদেরই একটুও বেরুনোর হুকুম নাই। এমনকি বেশি উঁকি-ঝুঁকি মারলেও গিন্নি রাগ করবে।

কেউ বললে না, তবু জানতে পারলম সায়েব কখন এল। সব যেন কেমন হয়ে গেল, পাখি ডাকতে ভুলে গেল, ছেলে কাঁদতে ভুলে গেল, কি জানি, বাতাস দিতেও যেন ভুলে গেল। সব চুপচাপ। কি? না সায়েব এয়েছে! আমি কত্তার ঘরে যেয়ে পরচালির দিকের দরজাটো

খুলে দেখি খামার দলিজে লোকে লোকারণ্য। এক পাশে ধুলোয় ঢাকা একটো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লাল পাগড়ি পরা কটো সেপাইও রয়েছে ইদিক-উদিক আর দলিজে লোকজন সবাই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একজনা একটো চেয়ারে বসে আছে। লাল টকটকে এক সায়েব। সায়েবকে পোষ্কার দেখতে পেচি না বটে, কিন্তুক অতগুলো মানুষের মধ্যে ঐ একজনাকেই শুদু চোখে পড়ছে। কি তার গায়ের রঙ, কি তার পোশাক-আশাক। সায়েব থুতনিতে দু-হাত দিয়ে বসে আছে এইটুকুন শুদু দেখতে পেচি। কি যেন শুনছে। ত্যাকন দেখতে প্যালম খাটো ধুতি আর মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি পরা, গলায় উড়নি জড়ানো এক ভদ্দরলোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন একটো পড়ছে। লোকটোর চোখে চশমা, তবু পড়ার কাগজটো ধরে আছে মুখের ওপর আর কি জোরে জোরে যি পড়ছে সি কি বলব– মনে হচে যেন যাত্রা করছে। কথা কিছু কিছু শুনতে পেচি বটে। কিন্তু বুঝতে পারলম না কিছুই। কত্তার কাছে পরে শুনেছেলম, বুঝব কি, সি তো বাংলা কথা লয়, সায়েবদের নিজেদের কথা, ইঞ্জিরি।

তা বেশিক্ষণ্ হলো না ইসব। একটু বাদেই উঠে পড়ল সায়েব, গাড়িতে যেয়ে উঠল। গাড়ি ভোঁ করে খামার থেকে বেরিয়ে গেল আর বললে কি লোকে পেত্যয় যাবে যি এক লহমার মদ্যে অত বড় খামার দলিজ একদম ফাঁকা। যি যেমন করে পারলে দৌড়ুইলে গাড়ির পেচু পেচু। কত্তাকেও দেখলম নিজের দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। কত্তা কিন্তুক তেমন সাজগোজ করে নাই, বাড়ির বাইরে গেলে যেমন পোশাকে থাকে, তেমনিই। পরনের ধুতিটো তার বরাবরই এট্টু দামি, উড়ুনি অবশ্য একটো নিয়েছে আজ। এলেকার য্যাতো বড় বড় সব লোক আজ সঙ্গেই আছে। পাশের গাঁয়ের গোঁসাই আছে, এমন দিনেও কিন্তুক খালি গায়ে। একটো চাদর শুধু জড়ানো, কপালে চন্দনের ফোঁটা, তিলক কাটা। গাঁয়ের ভশ্চাজ্যি, পাঠক, পাল, খান, নন্দী– এরা তো আছেই। মিয়ে-মোকাদিম ইদিকে কম, তা-ও দু-তিনজনা এয়েছে

আজকের দিনে।

রাস্তা চালু হয়ে যাবার পর আমি একদিন আবদার ধরলম রাস্তা দেখতে যাব। কত্তা কিন্তুক এরকম আবদারের মান রাখত। মোষের গাড়ি এল, ইস্টিশন পয্যন্ত যেয়ে আবার ফিরে আসা হবে। বউদের আর কেউ যেতে চায় না। কত্তা মাকে শুদুলে, গিন্নি যাবে কি না। এট্টু হেসে আমার শাশুড়ি বললে, রাস্তায় আমার আর দরকার নাই বাবা, রাস্তা ধরে এখন আর কোথাও যাবার নাই। যে কদিন আছি সব রাস্তা আমার এই বাড়িতে। তোমরা যাও।

পুবদিকের গাঁগুনো থেকে রাস্তা এসে গাঁয়ে ঢুকেছে বটে তবে সি রাস্তা কিন্তুক গাঁয়ের ভেতরে এসে মিলেছে গাঁয়েরই মাঝখানের পুরনো রাস্তায়। গাঁয়ের ভেতরে ই রাস্তা তো চেরকালই ব্যবহার হচে। তাই গাঁয়ের ভেতরে আর লতুন সড়কের কুনো কথা নাই। কিন্তুক গাঁ থেকে বেরিয়েই দেখলম লতুন রাস্তা বড্ডা অ্যাঁকাব্যাঁকা। গোড়াতেই এত অ্যাঁকাব্যাঁকা ক্যানে শুদুলে কত্তা বললে, ধরো, মহারাজার দিঘির দক্ষিণ পাড় এই পাওয়া গেল, কারুর জমি আর মারা গেল না। রাস্তা এখান থেকেই যদি সোজা করি, প্রথমে এই বড় ভাগাড়টা যাবে, তখন গাঁয়ের মরা গরু-মোষ ফেলবে কোথা লোকে? তারপর যাবে গরু-মোষ চরার এই বিরাট পগার। তারপর যাবে ছেলে-ছোকরাদের এই পেল্লাই খেলার মাঠ। এতো বড় মাঠ আশেপাশের কোনো গাঁয়ে নাই, মহারাজার সম্পত্তি, ইস্কুলের জন্যে দেওয়া, ভাগ করলে তিনটে মাঠ হবে খেলার। এই মাঠ কি নষ্ট করা যায়। যাক না, রাস্তা একটু ঘুরে! গাঁয়ের লোকের এতো কি আর তাড়া।

সত্যিই এতো জায়গা ছেড়ে দেওয়ার লেগে রাস্তা অ্যানেক ঘুর হয়েছে, কুটুর কুটুর করে গাড়ি যেচে তো যেচেই। কেউ যেদি হেঁটে ইস্টিশনে যেতে চায়, তাইলে আদ্দেক সোমায়ে যেতে পারবে। লোকে কি আর শোনে? বর্ষাকালটা বাদ দিয়ে সারা খরানির সোমায়ে ভাগাড়ের ওপর দিয়ে, পগার দিয়ে, খেলার মাঠ ধরেই সবাই গাড়ি

নিয়ে যাতায়াত করত। শুদু কি তাই? লতুন সয়রানের অ্যানেক জায়গাতেই দেখলম যা-তা ঘুরুনি হয়েচে। ডাইনে ঘুরল তো ক-পা যেয়ে বাঁয়ে ঘুরল। তাপর আবার ডাইনে ঘুরল। কত্তা হেসে বললে, এসব বেশিরভাগই হয়েছে গরিবের জমি বাঁচানোর জন্যে।

বড়লোকের জমি বাঁচানোর লেগে এরকম ঘুর কি একটোও হয় নাই?

তা কি আর না হয়েছে?

হ্যাঁ, লোকে অবিশ্যি বলতে পারে রাস্তা ছিল না, রাস্তা হয়েছে, লোকের চলাচলের সুবিধে হবে– এই পর্যন্ত। এত ঢোল পিটোবার কি আছে তা নিয়ে? লোকের চাষের জমি নিয়ে আবার সেই জমিরই দু-পাশের মাটি নিয়ে কুলি-মজুর লাগিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। উঁচু মাটির সরান, দু-পাশে তার লম্বা খালের মতো নালা, সেখানে চাষের কাজ কিছু হবে না। ক্ষতি তো মানুষের হয়েছেই। তবু বলা যায়, ক্ষতির চাইতে লাভই বেশি হয়েছে। তাই বলে ততো বাহাদুরির কিছু নাই। আমিও তাই বলি– বাহাদুরির কিছু নাই– কাজটা করার দরকার ছিল, আমি না করলে একদিন না একদিন আর কেউ করত। করতে হতোই একদিন, কপালগুণে আমার ওপরেই পড়ল দায়িত্ব। এ নিয়ে বুক ফুলিয়ে আমার বলার কিছু নাই। এমন করে কথা কত্তার মুখে কুনোদিন শুনি নাই। সে কথা বলেই যেচে।

আমি ভাবি অন্য কথা। একজন মানুষ দুনিয়ায় আর কদিন থাকে? কিন্তু মানুষ চিরকাল থাকবে। একজন একজন করে ধরলে কোনো মানুষই বেশি দিন দুনিয়ায় নাই তবু দুনিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ায় মানুষ থাকবে। এই যে রাস্তা হলো, ধরো আমার অছিলাতেই হলো, আমার লোভলালসা যা-ই থাকুক, হলো তো রাস্তা, না কি? আমি দুদিন বাদে দুনিয়া ছেড়ে গেলেও এই রাস্তা থাকবে। কতোদিন থাকবে? আমি বলছি বহুকাল থাকবে, আর নষ্ট হবে না। রাস্তা হয়তো অন্য-রকম হবে, পাকা হবে, কতো গাড়িঘোড়া চলবে, আমার

তিনপুরুষ চারপুরুষ পরের মানুষেরা এই রাস্তা দিয়েই চলাচল করবে। কারুর মনে থাকবে না আমার নাম, আমাদের কারুর নাম। তবু রাস্তাটা থাকবে। এই মনে হলে মনে হয় আমিই চিরকাল থাকলাম।

কথাগুলি যা সে বললে সোজা কথাতেই বললে। সবকথা বুঝতে না পারলেও কিছু তো বোঝলম। যা বোঝলম তাতে আমার গা কিরকম করতে লাগল। কত্তা কেমন লোক? উকে কি আমি চিনি! উ যেদি সব সোমায়ে এমনি করে কথা বলত, তাইলে আমি হয়তো ওর সাথে ঘর করতে পারতম না, খুব ভয় হতো। কিন্তুক তা লয়, ইরকম কথা সে আর কবার বলেছে?

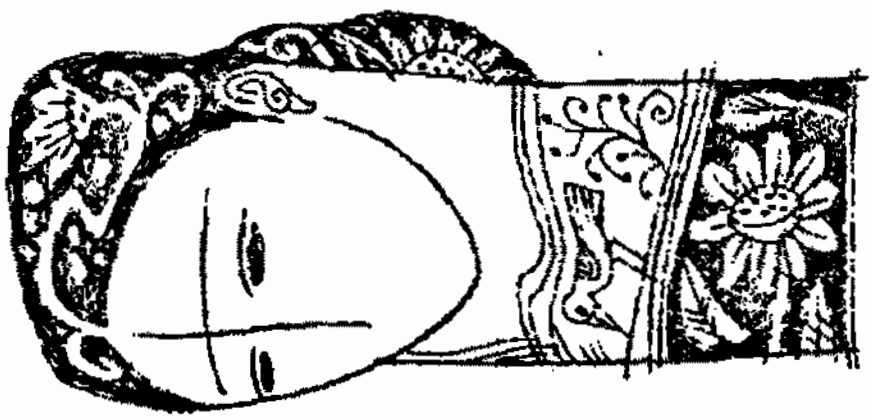

পিথিমির পের্‌জা আর কতো বাড়াব

এবারের সন্তানটি পেটে নিয়ে আমি খুব পেরেশান। কি আর বলব! নিজের ওপরেই নিজের রাগ হয়। কতো মনে হয় আর চাই না, আর বোঝা বইতে পারি না, কিন্তু জন্মের পরে তার শুদু মুখটি দেখা বাকি! কার কারসাজি জানি না, একবার যেই মুখটির ওপর চোখ পড়ল, একদিকে সারা দুনিয়া আর একদিকে ঐ নাড়িছেঁড়া সন্তান। কিন্তুক য্যাতো দিন জন্ম না হচে, পেটের ভারে সমদম, খালি মনে হয় আর দরকার নাই, আর কতো পেটে ধরতে হবে! নিস্তার কি কুনোদিন মিলবে না?

বাড়ির ছেলেমেয়েদের আর কতো হিশেব দোব! আমার দুটি আর একটি এল বলে। ল-বউ, ছোট বউয়ের একটি একটি খোঁকা হয়েছে।

সেজ বউ দুটি খোঁকা রেখে চোখ বুজেছিল তবে বছর দুই আগে তার ছোটটি দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে চলে গেয়েছে। আট-ল বছরের হয়েছিল। একদিন দোপরবেলায় দুবার শুকনো বমি হলো, মুখ হয়ে গেল নীলবন্ন। তার মা নাই, লতুন মা কেবল ঘরে এয়েছে। সব কাজ বাদ দিয়ে সেই ছেলের সেবা গিন্নি একা করলে। আমার ননদকেও কাছে আসতে দিলে না। শাশুড়ি বুঝলে, এই মা-হারানো ছেলেটিকে তাকেই দেখতে হবে। অবশ্যি বেশি সোমায় লাগল না, দু-তিন দিনের মধ্যেই সে চলে গেল। এক-একজনার অমনি কপাল হয়, দুনিয়ায় আসে, কেউ তাকায় না, দেখে না, আদর-ভালোবাসাও তেমন জোটে না। তাপর হুট করে একদিন চলে যায়। চলে যাওয়াটোও তেমন কেউ খেয়াল করে না। ঐ ছেলেও অমনি কপাল করে এয়েছিল।

যাকগো, ত্যাকন আমি খুব পেরেশান, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। ভোগাবে মনে হচে পেটের এই সন্তানটি। এই সোমায় একদিন দোপরবেলায় হিঁদুপাড়ায় লাগল আগুন। এই এলেকায় আগুন লাগাটো যি কি বেপার তা মানুষে চিন্তা করতে পারবে না। শুকনোর সোমায়, ঝাড়া পনেরো দিন আসমান থেকে আগুন ঝরছে। দু-একটো বাদে সব বাড়িরই মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। খুব কম, একটি-দুটি বাড়ির চাল টিনের। তা মাটির বাড়ির বাহার কম হয় না, ই দ্যাশে এমন মাটি পাওয়া যায় যি তা দিয়ে ঘরের ভেতরের দেয়ালে চুনকামের কাজও হয়। আমাদেরই কটো ঘরের দেয়াল এমনি চুনকাম করা আছে। আর বাড়ির বাইরের দেয়ালগুনোয় মাটির মিহিন কাজ করে আলকাতরা লেপে এমন করা হয় যি শতেক বর্ষাতেও কিছু হয় না। কিন্তুক এত সৌন্দর্য হলে কি হবে, চাল যি সব খড়ের! কতো বাহার করে ছাঁচ কাটা! শালকাঠ, তালগাছের কাঁড়ি, বাঁশ– এইসব দিয়ে চালের তলার কাঠামো এমন দবজ করে তৈরি যি বোশেখ জষ্টি আশিন কাত্তিকের ঝড়েও কিছু হবে না। কিন্তুক আগুনের কাছে সব জব্দ। আগুন লাগলেই মনে হয় সারা বাড়ি যেন ঠিক বারুদের গাদা। সিদিন দোপরে

কোথা থেকে আগুন ধরল কে জানে? কামারশালা থেকে, না মোড়লবাড়ির চুলো থেকে, নাকি অন্য কুনো বাড়ি থেকে, নাকি আপনাআপনিই লাগল কেউ বলতে পারলে না। উত্তরপাড়ায় লাগল আর লহমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এগুইতে লাগল দখিন-পুব দিকে। ই তল্লাটে গাঁয়ের রাস্তার দু-পাশে একটোর পর একটো বাড়ি, চালে চালে লাগানো। ঠিক শহরের মতুন। খুব কাছে কাছে বাড়ি, দু-বাড়ির মাঝে একটোই পাঁচির কিংবা কুনো পাঁচিরই নাই। আগুন যি লাগল, ধুঁয়োইল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তা কি কেউ দেখতে পেলে? দোপরবেলার আগুন কেউ দেখতে পায় না। শাদা ধুঁয়ো হয়তো একটু দেখতে পায় কিন্তুক দিনের আলোর সাথে আগুন এমন মিশে যায় যি কিছু বোঝা যায় না। তাই বলে আগুন লাগলে কাউরির জানতে বাকি থাকে না বরং আগুনের খবরই সবচাইতে তাড়াতাড়ি জানতে পারে লোকে। কি করে জানে, জানি না। হু হু করে একটো শব্দ ওঠে। সি শব্দও আবার তেমন শোনা যায় না। তবে হ্যাঁ, হঠাৎ করে চারদিক থেকে বাতাস ছুটে আসে, সি বাতাসের শন শন আওয়াজ পাওয়া যায়। তাপর দাঁড়িয়ে থাকলে গরম বাতাস এসে গায়ে লাগে, ছাই উড়ে বেড়ায় আর মাটি, বাঁশ, খড়, সোংসারের জানের জান সব জিনিশ পোড়ার গন্ধ পাওয়া যায়।

আগুন লাগার খবর ঠিকই জানতে পারলম। এগ্‌নেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলম আগুন উত্তর থেকে দখিন দিকে যেচে, পট পট ধুমধাম আওয়াজ হচে। পেথম যি লোক দেখেছিল, সে চেঁচাতে যেয়েও চেঁচাতে পারে নাই। তাকে বোবায় ধরেছিল। আগুন পেথমে যি দেখে সে লিকিনি গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারে না। বুকে বিশমণি পাথর চাপানো আছে মনে হয়। অ্যাকন অবশ্যি অ্যানেক মানুষ, সারা গাঁয়ের মানুষ আগুন নেভাইতে লেগে গেয়েছে। সবাই চেঁচাইচে, হৈ-হুল্লা-চিচ্‌কার কানে আসছে। কি আচ্চয্যি, এত পুড়ছে, সব পুড়ে যেচে তবু মানুষের চেঁচানি শুনেই ভয় অ্যানেকটো কম লাগছে। কিন্তুক

য্যাকন আগুনটো লেগেছিল, যি পেথম দেখেছিল তার দম আটকে গেয়েছিল, শব্দ বার করতে পারে নাই। আগুন লাগলে মানুষের যেন কেয়ামতের ভয় লাগে!

সেইদিনই সাঁঝ-লাগার কোলে কোলে বামুনপাড়ায় পোড়া আঁতুড়ঘরের মদ্যে ভশ্চায্যি-গিন্নির একটি খোঁকা হলো আর মাঝ -রেতের পরে আমারও গভ্ভের সন্তানটির জরমো হলো। সি-ও একটি খোঁকা। মনে হয় ঐ মাহা লঙ্কাকাণ্ড না হলে ঐদিন ভশ্চায্যি-গিন্নির ছেলে হতো না। আমার ছেলেটিও ঐ রেতে দুনিয়ায় আসত না। পরের দিন সকালেই ভশ্চায্যি এল বাড়িতে।

প্রলয় হলো হে প্রলয় হলো। প্রলয়ের মধ্যে পুত্রলাভ, আমারও হলো, তোমারও হলো। আমি ঐ হতভাগার নাম রেখে দিয়েছি 'ভণ্ডুল'– তাই বলে তুমি ওরকম রেখো না। একটা ভালো সোজাসুজি নাম রেখে দিয়ো ছেলের।

সে তো হলো– এদিকে গাঁয়ের যে সর্বনাশ হয়ে গেল ভট্চাজ!

তার আর কি করা যাবে বলো? নিয়তি কেউ খণ্ডাতে পারে না। তবে কথা হচ্ছে তুমি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আমি একজন মেম্বার। তোমার সময়েই এমন আগুন লেগে আদ্দেক গাঁ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তোমাকেই এখন লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

ঐ শুরু হলো। সত্যিই আদ্দেক গাঁ পুড়েছিল। ঘরের সব জিনিশ লষ্ট হয়েছিল তো বটেই, বেশিরভাগ বাড়ির খড়ের চাল পুড়ে এমন দশা হয়েছিল যি দেখলে চোখের পানি রাখা যেছিল না। খালি পোড়া কালো কালো দেয়ালগুনো দাঁড়িয়ে আছে। আঁদার রেতে সিদিকে গেলে গা ছমছম করে। ঠিক যেন সার সার ভূত দাঁড়িয়ে রয়েছে– মুখে রা নাই, সি যি কি আবস্তা বলা যেচে না। ছেলেমেয়ে নিয়ে রেতে থাকে কোথা? অ্যানেক ভদ্দরলোক গেরস্থ কি করবে, উঠনে বিছেনা পেতে খোলা আসমানের তলায় থাকতে লাগল।

আর এইবার দেখলম কত্তাকে। সে দিনকে দিন মানলে না, রাতকে

রাত মানলে না। আশেপাশের বিশটো গাঁয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল। এক দণ্ড বাড়িতে থাকত না।

কোনো কথা নয়, মানুষকে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে হবে। তারপর অন্য কথা। গাড়ি গাড়ি নতুন বাঁশ লাগবে, কাঠ লাগবে, খড় লাগবে, দড়ি, পেরেক, গজাল– মোট কথা হচ্ছে বাড়ি করতে যা যা লাগে সব জোগাড় করতে হবে। মানুষের জন্যে ভিখিরি সাজতে, ভিক্ষে করতে দোষ কি? নিজের জন্যে তো নয়, হীন হবার কিছু নাই।

কত্তা হাত জোড় করে গাঁয়ে গাঁয়ে যেয়ে আবস্তাপন্ন চাষি গেরস্তদের কাছে বাঁশ-খড়-কাঠ এইসব যাচেঙ্গা করতে লাগল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল– হ্যাঁ, একটো মানুষের মতুন মানুষ বটে! হিঁদু-মোসলমান বলে কথা লয়, একজনা মানুষ। কতো সুনাম তার হতে লাগল। লতুন রাস্তা হবার পরেও তেমন হয় নাই।

অসাধ্য কিত্তি করলে মানুষটো! একা করে নাই বটে, সবাইকে সাথে নিয়েই করেছিল এই কাজ– ইউনিনের মান্যগণ্য কত্তারা সবাই ছিল। তবু সবাইকে একসাথেই বা করতে পারে কজনা? সারা গাঁ যেন ঘুমিয়ে ছিল, মিশমার হয়ে ছিল, কত্তার ডাকে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠল। কেউ বসে নাই, সবাই কাজে লেগে গেয়েছে, যাদের কুনো ক্ষেতি হয় নাই আগুনে, তারাও সবাই কাজে লাগল। নিজের নিজের কাজটুকু করে আবার ঐ সাজারের কাজে হাত লাগাল। দরকার হলে লতুন করে মাটির দেয়াল করে দিচে, বাঁশ কাটছে, কাঠ চিড়ছে, ঘরামিরা এসে চালা তুলছে, বাঁশ-কাঠের কাঠামো তৈরি করে দিচে, তাপর খড় দিয়ে ছাইয়ে দিয়ে তবে ছুটি। টাকাপয়সা যেখান থেকে যা জোগাড় হয়েছিল, কত্তা সেখান থেকে যাকে যা দেবার, যাকে না দিলেই নয়, তাকে তেমনি করে মজুরি দিচে।

সত্যিই অবাক বটে। আষাঢ়-শাওনের বর্ষা-বাদল আসার আগেই আমাদের এই পোড়া গাঁ আবার লতুন হয়ে গেল। আগের চেয়ে লতুন। দূর থেকে দেখা যেতে লাগল সব লতুন ঘরের চাল। খড়ের রঙ তো

সোনার মতুন! পুরনো কালো হয়ে যাওয়া চালগুনোর বদলে এই লতুন ছাওয়ানো চালগুনো দূর থেকে সোনার মতুনই ঝকঝক করতে লাগল।

সব কাজ হয়ে গেলে কত্তা একদিন ভশ্চায্যিকে বললে, ছেলের ভণ্ডুল নামটি বাদ দিয়ে আর একটি নাম দাও ভট্‌চাজ। ভণ্ডুল কিছুই হয় নাই।

তা আর ভশ্চায্যি করে নাই। ছেলের নাম ভণ্ডুলই রইল। সোনার ছেলে, তবু সারা জেবন ভণ্ডুল নামই বয়ে বেড়াইলে।

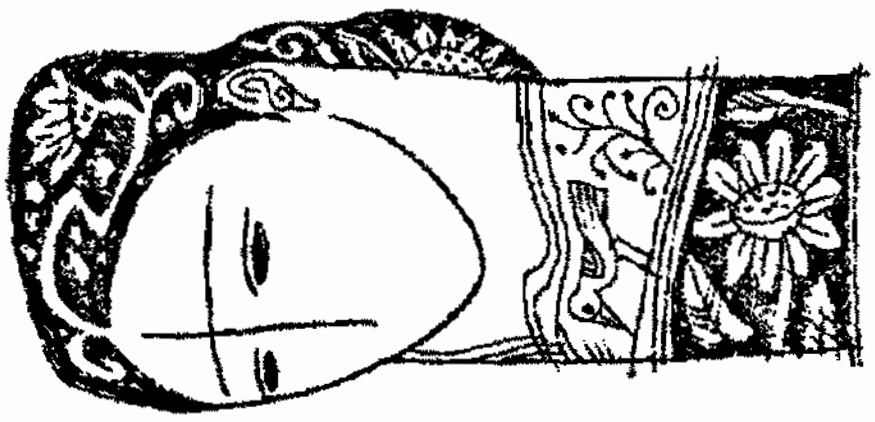

কি দিন এল, সারা দুনিয়ায় আগুন লাগল

পিথিমিতে এলম কিন্তুক পিথিমির কিছুই দেখলম না। কবে একদিন মায়ের প্যাট থেকে পড়লম, দুনিয়াতে এসে চোখ দুটি মেললম, হয়তো দুবার জোরে চিচ্‌কার করে কেঁদেছেলম, ঐ পয্যন্তই। তাপর এত কাল পার করলম, কিছুই দেখলম না পিথিমির। সারা জেবনে বাড়ি থেকে তিন কোশ চার কোশের বেশি যেতে হয় নাই। কেউ নিয়ে যায় নাই। মাঠ-ঘাট, ঘরবাড়ি, আসমান-জমিন ওইটুকুনই যা দেখলম। কবর কেমন হবে জানি না তবে মনে হয়, কবরের থেকে একটু বড় এই সোংসার। কবরের জায়গাটো তবু নিজের নিজের, সোংসারের সবটো নিজের লয়। সোংসারে থেকে যা দেখা যায়– আসমান-জমিন– সি তো কবরের বাড়া! সোংসার করতে করতে জান জ্বলে গেলে এইরকম মনে হয়। গাধার খাটুনি খাটতে খাটতে মনে হয়, পিতিদিন রাজ্যের লোকের পিন্ডির বেবস্তা করতে করতে হিমশিম খেয়ে গেলে মনে

হয়। শাশুড়ি-ননদের বাঁদিগিরি করতে করতে মনে হয়। তারা নিজেরা বাঁদি-চাকর না ভাবলেও মনে হয়। জা-রা য্যাকন গিদের করে বসে থাকে, ঢিটেমি করে, গরজ ঠাওরায়, ত্যাকন ইসব মনে হয়। ত্যাকন যেন নিজের ছেলেমেয়ে-সোয়ামি-সংসার সবই বিষ। তা বিষ খেতে খেতে এমন হয়েছে যি অ্যাকন এই বিষেও নেশা লাগে।

গাঁ যিদিন পুড়ল সেইদিন রেতে আমার যে আর একটি খোঁকা হয়েছিল, সে তো মরেই যেছিল। বাঁচার কুনো আশা ছিল না। বর্ষার মরশুমটো টিকবে কি না তাই খুব সন্দ। সি-বার বর্ষাও হয়েছিল তেমনি। সারা দিন সারা রাত গদগদ করে আকাশ ঢালছে তো ঢালছেই। তা ঢালুক চাষবাস সবই আসমানের মুখ চেয়ে! বর্ষায় পানি যেদি না হলো, ধান হয় রোয়াই হবে না, নাইলে মাঠের ধান মাঠেই শুকুবে। কিন্তুক সিবার হলো উল্টো। এতই বিষ্টি যি চাষের ফাঁক পাওয়া যেচে না, বীজতলা তলিয়ে যেচে, রোয়া ধান ভেসে যেচে। সারা মাঠ পানিতে তম তম করছে। এমন বাদলে কচি ছেলেটোকে বাঁচানো কঠিন হয়েছিল। তা শক্ত জান নিয়ে এয়েছিল ছেলে। বর্ষাকালও শেষ হলো, সে-ও বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠিল।

এই সোমায় কত্তা একদিন বললে, বাড়িতে যেসব কাগজ-টাগজ আসে সেসব কি চেয়ে কোনোদিন দ্যাখো, না, অক্ষর-টক্ষর সব ভুল মেরে বসে আছ! কত্তার ব্যাঁকা কথায় আমিও ব্যাঁকা কথা বললম। সোংসারের বত্রিশ জনার পিন্ডি রাঁধতে রাঁধতে অক্ষর-ফক্ষর সব চুলোয় গেয়েছে।

সত্যিই তো, পড়তে একদিন শিখেছেলম, কিছুই অ্যাকন আর মনে নাই। কতো দিন কিছু লিখিও নাই, কিছু পড়িও নাই। হপ্তায় হপ্তায় বঙ্গবাসী কাগজটো আজও আসে, আরও কতো কিসব আসে। কত্তা দেখি আজকাল সবই পড়ে। লোকটোকে অ্যাকন আর চিনতে পারি না। খুব ভদ্দরলোক ভদ্দরলোক লাগে। কুনো সময় খালি-গা হয় না। ধুতির ওপর হাতাঅলা গেঞ্জি পরে, না-হয় একটো কুনো জামা পরে।

চোখে চশমা লাগায়। কত্তা দূরে যেচে, আমি যেখানকার সেইখানেই আচি। কত্তার দিকে চেয়ে লরম করে বললম, সোংসারের কাজে এত বেস্ত থাকি, এক লহমার ফুরসৎ পাই না। দুনিয়ার খবর আর কি করে রাখব?

আবার যে সারা দুনিয়ায় যুদ্ধের আগুন লেগেছে। আর কিছু না হোক বঙ্গবাসী কাগজটা একটু কষ্টোমষ্টো করে দেখো।

দেখে কি করব? সোংসারের কয়েদখানায় সারা জেবনের মেয়াদে কয়েদ খাটচি– কুন্ দ্যাশে যুদ্ধু হচে, কে যুদ্ধু করছে, কতো লোক মরছে, কতো লোক খোঁড়া হচে, কতো দ্যাশ, কতো ঘর-সোংসার ছারেখারে যেচে, তা আর আমি কি জানব? আমি য্যাকন চোদ্দ বছরের মেয়ে, আমার বিয়ের সোমায়ে য্যাকন এমনি সারা দুনিয়া যুদ্ধু হয়েছিল– কই কিছুই তো বুঝতে পারি নাই। রেঁধেছি, বেড়েছি, খেয়েচি, ছেলেপুলে মানুষ করেছি, যুদ্ধু নিয়ে কুনোদিন ভাবি নাই। তা আবার অ্যাকন সারা দুনিয়ায় যুদ্ধু শুরু হয়েছে বলছ, তা হলোই বা, নিজেরা তো কিছু ট্যার পাব না। তার চেয়ে জষ্টি মাসে গাঁয়ে যি আগুন লাগল, গোটা হিঁদু-পাড়াটো পুড়ে গেল, সি ধাক্কা জানে যেয়ে লেগেছে তোমার এই যুদ্ধুর চেয়ে অ্যানেক বেশি।

এবার বোধ হয় অত সহজ হবে না। যুদ্ধ আর আগের মতো নাই। কত্তা বললে, ঢাল-তরোয়াল নিয়ে সামনাসামনি মারামারি-কাটাকাটি হতো সেখানকার যুদ্ধ সেখানেই থাকত। যতো রক্তারক্তি হোক, ঐ জায়গার বাইরে আর যুদ্ধ নাই। ঢাল-তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ করে আর কতো লোক মারা যায়? কিন্তু এখন যে যুদ্ধ হবে তা একদম আলাদা। লাখ লাখ লোক যুদ্ধে যাবে, যুদ্ধ করবে, মরবেও লাখে লাখে অথচ হয়তো শত্রুকে চিনবেও না, দেখবেও না। আবার যারা যুদ্ধে যায়ই তোমার আমার মতো খুব সাধারণ মানুষ, তাদেরকেও মরতে হবে লাখে লাখে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের শহরে মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে তো, আঁধার আকাশ থেকে বোমা মেরে বাড়িঘর-দুয়োর

দেবে মাটিতে মিশিয়ে। কতো লোক যে মরবে তার কেউ হিসাব করতে পারবে না। লাশই পাবে না। মা পাবে না ছেলের লাশ, ছেলে পাবে না বাপের লাশ। এক-একটা লাশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথা যে পড়বে তা কেউ জানতে পারবে না।

কতো দূরে যুদ্ধু হচে, আমরা ইয়ার কি বুঝব? উ নিয়ে তুমি অত মাথা ঘামাইছ ক্যানে? কই, সেই আগের যুদ্ধুতে তো কিছুই বুঝতে পারা যায় নাই! ঐ বঙ্গবাসী কাগজ আর কি কি সব ছাইভস্ম বাড়িতে আসে, ওইগুনোই য্যাতো লষ্টের মূল।

কত্তা একটু হেসে বললে, দুনিয়া জুড়ে কতো বড় বড় ব্যাপার হচ্ছে, কোন্ এক গাঁয়ের এক কোণে আমরা সব ছা-পোষা মানুষ পড়ে আছি। ঠিকই, আমরা আর এসব কি বুঝব? তবে আগে সব জানালা-দরজা বন্ধ ছিল— এখন একটা-দুটো কাগজ-টাগজ আসে, বাইরের দুনিয়ার হাওয়া খানিকটা বোঝা যায়। হাওয়া ভালো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আগুন যেখানেই লাগুক, সারা দুনিয়ায় ছড়াবে। দুনিয়াটা বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি নয় মনে রেখো। এরও মনিব-চাকর আছে। যেমন এইদেশে ব্রিটিশ মনিব, আমরা চাকর।

দিন যেতে লাগল, বছর ঘুরে গেল, যুদ্ধুর কিছু কিন্তুক আমরা বুঝতে পারলম না। সব আগের মতুন— সোংসারের চাকা ঘুরছে তো ঘুরছে। বাড়ির লোক কের্‌মাগত বেড়েই যেচে, ছেলেপুলেগুলো বড় হচে, একটি-দুটি করে জায়েদের সন্তান হচে। ঠিক আগের মতুনই সকালে সুয্যি উঠছে, সাঁঝবেলায় ডুবছে। বঙ্গবাসী কাগজটো এলে, কত্তার পড়া হয়ে গেলে, গাঁয়ের আর যারা পড়তে নিয়ে যায়, তারা ফেরত দিয়ে গেলে, একবার একবার চোখের ছামনে নিয়ে বসে থাকি। বিটিশ আর জারমেনি এই দুটো নাম দেখি বটে, আর আর নামও দেখি, তবে মনে থাকে না। ঐ দুটি নাম খুব বেশি দেখি বলে মনে থাকে। এক-একটো খবর ভালো করে পড়তে যাই, বিদ্যে কম, অ্যানেক কথাই বানান করে করে পড়তে হয়, তা-বাদে অতো কষ্ট

করে পড়েও কিছু বুঝতে পারি না। বুঝব কি করে? উড়োজাহাজ দিয়ে একটো-একটো বড় শহরে বোমা ফেলছে, কামান-বন্দুকের গুলি মারছে– আহা আহা, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যেচে, সমুদ্দুরেও আগুন লাগছে। কি ক্ষেতিই না হচে, কতো লোকই না মরছে! ইসবের হিশেব যি থাকচে না তা লয় কিন্তুক আমার মাথায় ঢুকছে না। একের পরে একটো শূন্য দিলে দশ হয়, দুটো দিলে একশো হয় আর তিনটো দিলে হাজার হয়– এই পয্যন্ত জানি আর হাজার হলে কতো হয় তা-ও একটু একটু বুঝতে পারি। কিন্তুক তারপরে য্যাতো শূন্যই দাও, তাতে কতো হয় তা আমি কুনোদিনই শিখতে পারব না। আর পারলেই বা কি? এক হাজার কতো তা-ই মাথায় ঢোকে না, এক লাখ হলে কতো হয় তা কি কুনোদিন বুঝতে পারব? আর কাগজে য্যাতো হিসেব সব শূন্য দিয়ে। এই লেগে কাগজ পড়তে গেলেই বুকের মদ্যে খালি খাঁ খাঁ করে। হায় হায়, তামাম দুনিয়ার সব্বোনাশ হচে!

কখনো কখনো মনে হয়, গাঁয়ের ভেতর ঘরের কোণে বসে আছি বলে কিছু বুঝছি না। শহরে হয়তো অ্যানেক কিছুই হচে। কত্তা আগের মতুনই শহরে যায় বরঞ্চ এট্টু বেশিই যায়। ছোট দ্যাওর কোটে চাকরি করে। বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলেও হয়েছে, তাদের নিয়ে শহরে বাসা করে থাকে। আমার ছোট ভাইটিও আর কলেজে যায় নাই। পড়াতে তার মন ছিল কিন্তুক তার আগে বাপের অভিশাপ কুড়নোর ইচ্ছা হয় নাই। সে-ও একটি বিয়ে করে ছোট একটি চাকরি জুটিয়ে শহরে বাসা ভাড়া করে থাকে। বাপজি মারা গেয়েছে আমার ছোট খোকাটি য্যাকন প্যাটে সে-ও তো ক-বছর হয়ে গেল। কিন্তুক একবার চাকরি আর সোংসারে ঢুকে পড়ে সে আর ল্যাখাপড়া করতে চাইলে না। দ্যাওর আর ভাইয়ের বাসা পাশাপাশি, বলতে গেলে একই বাড়ি। কত্তা শহরে গেলে এই দুই বাসাতেই যায়। বাড়ির সরু চাল, মুগ মুশুরি ডাল, ঘি এইসব দিয়ে আসে। শহরের খবর যা পাই, তার কাছ থেকেই পাই। কত্তা আজকাল পেরায়ই বলছে, যুদ্ধ লিকিনি পচ্চিমের

দ্যাশগুনো থেকে আমাদের ইদিকে এগিয়ে আসছে।

তিলিপাড়ার আগুন বামুনপাড়ায় কেমন করে গেল দেখলে তো— এইবার বুঝবে।

ছোট খোঁকাটি ত্যাকন দ্যাড়-দু বছরের হয়েছে, জম্মের পর কি অসুখ করেছিল, বাঁচার কথা ছিল না। নেহাত হেয়াত আছে তাই অ্যাকনো দুনিয়া দেখছে। বলতে গেলে অ্যাকন আর রোগ-বালাই কিছু নাই। বেশ মোটাসোটা হয়েছে, দু-হাতে দুই রুপোর বালা নিয়ে কাদাপানিতে খেলে বেড়ায়, শুদু বুকের ভেতর বিলুইয়ের মতুন ঘরর ঘরর আওয়াজটো আর গেল না।

ইয়ারই মদ্যে একদিন কত্তা বাড়ির ভেতরে এসে সেই আগের মতুন মা-বুনকে ডাকলে। গিন্নি এসে পাশে দাঁড়ালে বললে, বউদের কাপড় আনা হয়েছে, বছরে দু-জোড়া সবারই লাগে। মনে আছে, ছ-মাস আগে শাড়ি আনা হয়েছিল? এখন আর এক জোড়া করে সবারই লাগবে। তুমি সবাইকে যেমন যেমন দিয়ে দাও। কাছে এসে কাপড় দেখে গিন্নি বললে, ই কি কাপড় বাবা? এমন শাড়ি তো কখনো দেখি নাই। এ বাড়ির বউরা তো কুনোদিন এত মোটা শাড়ি পরে না। এ তুমি ফেরত দাওগা।

বাজারে আগুন মা, মিহি তাঁতের শাড়ি, চিরকাল যা তোমরা পরে এসেছ, সে আর বাজারে নাই। এ বড় বড় শহরে, কলকেতায় এখনো এখানে-ওখানে কিছু থাকতে পারে শহরগঞ্জে কোথাও তাঁতের মিহি শাড়ি আর নাই।

সে আবার কি বলছ, বাবা?

যুদ্ধের ফল এই বোধহয় শুরু হলো। ঘরে ঘরে সব তাঁত বন্ধ। সুতো নাই, তাঁতিরা সব পেটে কাপড় বেঁধে বসে আছে। আজ সারাদিন বাজারে ঘুরে ঘুরে বহু কষ্টে এই মিলের শাড়ি কটি জোগাড় করেছি। বাজারে কাপড় মিলছে না, মিলছে না মানে মিলছেই না, এ কি কোনোদিন কেউ ভেবেছে? এই তো কাপড়, তার আবার কি চড়া

দাম!

কাপড় দেখে আমাদের তো মাথায় হাত। চটের মতুন মোটা, মাড় না কি দিয়েছে, জমিনে হাত দিলে হাত পিছলে যেচে, সুতো মিহি না মোটা বোঝাই যেচে না। একরঙা ম্যাড়মেড়ে সবুজ নাইলে খয়েরি পাড় আর কাপড়ের রঙ কি! শুনছি কোরা রঙ, ঘিয়েঘিয়ে, ধোপাবাড়িতে দিলে ধুয়ে শাদা করে দিতে পারবে। ই কাপড় ভিজলে যি কি ভার হবে, বোঝাই যেচে। জানি না, ই গরম দ্যাশে কেমন করে ই কাপড় পরব। ত্যাকন কি আর জানি, ই কাপড়ও আর দু-দিন বাদে জুটবে না। বোধায় ছ-মাসও যায় নাই, কত্তা এসে খবর বললে বাজারে কাপড় নাই। নাই তো নাই, কুনো কাপড়ই নাই, বিদ্যাশ থেকে কাপড় আনা হয় বন্ধ, নাহয় খুব কম। দিশি মিল-কারখানাগুলিনও কাজ করছে না। কুনো সুতো পায় না বলে গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁতিরাও সব তাঁত বন্ধ করে থুতনিতে হেঁটো দিয়ে বসে আছে।

উসবই কি যুদ্ধুর লেগে? কবে যুদ্ধু শুরু হয়েছে, তিন বছর পেরিয়ে যেতে চলল। আর এতদিন বাদে পরনের কাপড় অমিল হবে?

কাপড় বেশ কিছুদিন থেকেই অমিল, কত্তা বললে, মেয়েদের কাপড় তবু এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল, পুরুষদের জামা জোব্বা ফতুয়ার কাপড় অনেকদিন থেকেই টানাটানি। তা আমাদের এই গরম দেশে গরিব মানুষদের কজনই বা জামা পরে— ভদ্রলোকদেরও জামা-জুতো অতো না হলেও চলে যায়। কিন্তু মেয়েদের তো একটি শাড়িই সম্বল। যুদ্ধ কি, দেশের মানুষ এবার বুঝবে। এখন তো শুধু কাপড় অমিল— মনে হচ্ছে মানুষ কি তবে ন্যাংটো থাকবে? একটিমাত্র জিনিশের অভাব হলে কি হয় দ্যাখো! বাঁচতে মানুষের বেশি কিছু লাগে না— তবু দু-একটি যা লাগে তার অভাব হলেই ভয়ানক কাণ্ড! কাপড় নাই, এর পর আর একটিই জিনিস যেমন ধরো ভাত নাই, তখন কি হবে?

যুদ্ধুর কুনোকিছু তো এখনো ই-দ্যাশে হয় নাই। তাইলে হঠাৎ হঠাৎ এক একটো জিনিশ ক্যানে নাই হবে?

গাঁয়ের টিউবওয়েল থেকে পানি পাচ্ছ, প্রতিদিন, বাড়ির রাখালটা পানি নিয়ে আসছে, তাই তো? একদিন সে এসে বললে, পানি নাই কলে। তুমি কি জানতে, মাটির তলার যে পানি থেকে তুমি পানি পাচ্ছ, সেই পানি মাটির তলায় থাকবে যদি দূরের একটা নদীতে পানি থাকে। সেই নদীর পানি কবে শুকিয়ে গিয়েছে, তুমি জানোও না– কিন্তু একদিন দেখলে টিউবওয়েলে আর পানি নাই। এখনকার যুদ্ধই এইরকম, কিসের সাথে কিসের যোগ তুমি-আমি জানতেই পারি না। মাটি পাথর হচ্ছে, কেউ জানে না, তারপর দেখবে একদিন তামাম মাঠই পাথর– চাষবাস সব শেষ!

ঐ হেঁয়ালি কিছুই বোঝলম না, কিন্তুক বেশিদিন গেল না ছ-মাস না যেতেই শোনলম, চারিদিকে হাহাকার হচে, কাপড় নাই, মেয়েদের পরনে কিছুতেই কাপড় জুটছে না। কোথাকার মেয়েরা লিকিন কাপড়-বিহীন ন্যাংটো থাকছে। সে গাঁয়ে মেয়েরা দিনে তো কথাই নাই, রেতেও বাপ-ভাইয়ের ছামনে বেরুইতে পারছে না। বেশি কথা আর কি বলব– যা কুনোদিন ইসব দ্যাশে হয় নাই, এইবার তা-ও হতে লাগল। বরাবর দেখছি রেতে শোবার সোমায় কেউ দুয়োরে খিল দেয় না, বড়জোর ঠেসিয়ে রাখে। আমাদের বাড়ির কথা আলেদা। অন্য সব বাড়িতেই আমকাঠের দরজা, ত্যাড়াব্যাঁকা, একটো দিক হয়তো ভাঙা, হাঁসকল খুলে পড়ছে, খিল আছে কি নাই– দরজা তো লয়, যেন দরজার ছল। ও-তে আবার খিল দেবে কে? তার দরকারই বা কি?

এইবার খবর আসতে লাগল খুব কাপড় চুরি হচে। লতুন কাপড় লয়, পুরনো কাপড়ই চুরি হচে। সোয়ামি-স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে, ভাঙা দুয়োরটো ঠেসানো– সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছে বউটির পরনের একটি কাপড় কে নিয়ে গেয়েছে। দুটোর বেশি কাপড় ই দ্যাশে কারই বা থাকে? বড়লোকের বাড়ির বউ-ঝিদের দু-একটো তোলা-শাড়ি, বিয়ের বেনারসি কাপড় ইসব তোরঙ্গে তোলা থাকে।

সিসব লয়, ঐ গরিব বউ মানুষটিরই দুটি শাড়ির একটি, কিংবা একমাত্র শাড়িটি চোরে নিয়ে গেয়েছে। ভিজে কাপড় অ্যানেক-সোমায় বাইরে এগ্‌নেতেই দড়ি কিংবা তারে শুকোতে দেওয়া থাকে, এতকাল তা-ই থাকত। অ্যাকন আর তা কেউ করে না। ঘর থেকেই কাপড় চলে যেচে। এত দুঃখের মদ্যে বলতে হাসিও লাগে, একপাড়ার বউয়ের কাপড় ভিনপাড়ার বউয়ের পরনে লিকিন দেখা গেয়েছে। ই বেপারে হিঁদু-মোসলমান বাছাবাছি নাই। কাপড়ের টানাটানি সবারই। কাপড় লাগবে সবারই। বোঝাই যেচে, কাপড় যারা চুরি করছে তারা চোর লয় বরঞ্চ আসল চোরই অ্যাকন চুরি করা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তুক তা বললে হবে ক্যানে? আমাদের সেধোর মায়ের কাপড় অমুকের বউয়ের পরনে দেখা যেচে যি!

এমনি কথা বলে বাড়ির পুরুষ মরদটো যেচে সেই বাড়িতে। এক রঙের কাপড় হয় না? তোমার বউয়ের শাড়ির মতুন রঙ কি দুনিয়ায় আর একটোও নাই? কারুর কাপড়ে কি নাম লিখে দিয়েছে কোম্পানি?

আমাদের সেধোর মায়ের শাড়ির এককোণে পাকা জামের রঙ লেগেছিল। এই দ্যাখো সেই কষ।

ক্যানে, জামের কষ কি আমাদের বাড়ির গোঁদানির মায়ের শাড়িতে লাগতে পারে না?

এইসব কথা নিয়ে মরদে-মরদে, বউয়ে-বউয়ে সি কি তুলকালাম ঝগড়া, মারামারি!

এমনি য্যাকন আবস্তা, ত্যাকন একদিন শোনলম, ছায়রাতুনবিবির লাতিনি মেয়েটি— এখনো বিয়ে হয় নাই, সোমত্ত মেয়ে— সেই মেয়ে ন্যাংটো হয়ে ঘরে বসে আছে। ছায়রাতুন বুড়ি ক্যানে বেঁচে আছে কেউ বলতে পারবে না, সোয়ামি-পুত্তুর-ভাই-বেরাদর কেউ নাই তার। সব পুড়িয়ে খেয়েছে, শুদু ঐ লাতিনটো আছে। বোধায় ঐ লাতিনটোর লেগেই বেঁচে আছে। তাদের মতুন তাদের ভিটেটোও বেআব্রু। একটোই মাটির কুটুরি। ভিটেঘেরা মাটির দেয়াল এককালে ছিল,

এখনো তার কিছু কিছু চেহ্নত আছে, এই পয্যন্ত। ঘরটোর দেয়ালও জায়গায় জায়গায় ভাঙা, দরজার বালাই নাই, একটো ছেঁড়া চট টাঙানো থাকে, চোরে সিটি নেয় নাই– ভাগ্যিস নেয় নাই। পায়খানা-পেশাব করতে ঐ চটটো পিঁদে লাতিনি বাইরে আসে। বুড়ি লিকিনি বলেছে, নিজের শাড়িটি লাতিনিকে দিয়ে সে ন্যাংটো হয়ে বাড়িতে কাজ করবে, ন্যাংটো হয়ে গাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। সে কি অ্যাকন আর মেয়েমানুষ যি লাজ-শরম থাকবে? উসব ধুয়ে-মুছে খেয়ে নিয়েচে সে। সে ন্যাংটোই ঘুরবে। বলেছে, দেখি গাঁয়ের লোকে কি করে! সিদিন রাতে খেতে বললে কত্তা এমন করে হাত নাড়লে যি আর একবার বলতে সাওস হলো না। গা-মাথা মোটা একটা কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে থাকলে।

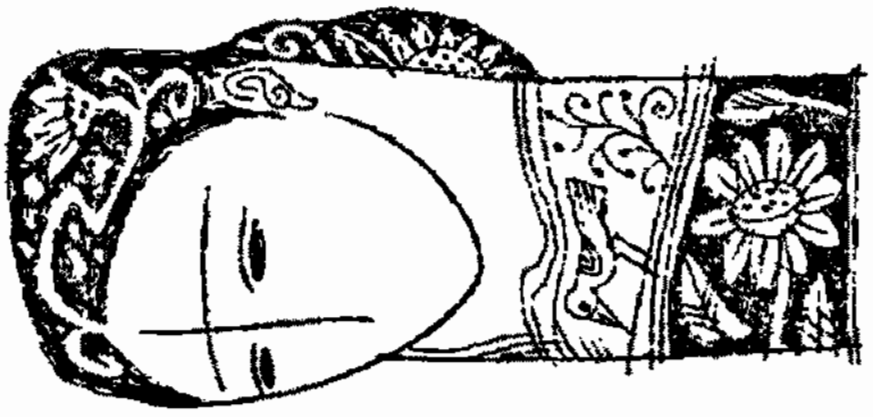

আবার অ্যানেকদিন বাদে বাপের বাড়ি

তা অ্যানেকদিন বাদেই বটে! আগের মতুন আর আনন্দ হয় না। বাপজি মারা গেয়েছে বছর চারেক হলো। অসুখের খবর লয়, আমি একেবারে মরার খবরই পেয়েছেলম। কষ্ট কিছু হয় নাই তার। মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। ই রোগের নাম লিকিনি সন্ন্যাস রোগ। ওষুধ-পানি আর করতে হয় নাই, ডাক্তারও ডাকতে হয় নাই। খানিকক্ষণের মধ্যেই সব শ্যাষ।

তা সোংসারের ইতর-বিশেষ আর কি হবে? বৈমাত্র ভাইটি বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছে। তিন বুনের একটোরও অবশ্যি বিয়ে হয় নাই।

জানি, উসব আবার কত্তাকেই করতে হবে। বাপজির তেমন বয়েস হয় নাই, আরও অ্যানেকদিন বাঁচার বয়েস ছিল। আত্মীয়-কুটুম সবাই এয়েছিল। খবর পেয়ে আমি তো অ্যালমই। এক দিন থেকে আবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গ্যালম। সোংসারে অসুবিধা তেমন কিছু নাই। বাপজি ভালোই রেখে-থুয়ে গেয়েছে। ভাই যেদি উড়িয়ে-পুড়িয়ে না দিয়ে এট্টু দেখেশুনে রাখে, তাইলে সোংসার ভালোই চলবে।

যাই হোক, চার বছর আমার বাপের বাড়ি আসা হয় নাই। অ্যাকনকার বড় খোঁকা আর আমার সাথে আসতে চায় না। বড় হয়ে গেয়েছে, নিজের পড়া নিয়ে বেস্ত। মেয়ে আর চার বছরের খোঁকাটি নিয়ে আমি ইবার বাপের বাড়ি যেচি। ইবার অন্য রকম ভালো লাগছে। আগে মোষের গাড়ি করে ধু ধু তেপান্তর মাঠের ভেতর দিয়ে যেতম। অ্যাকন লতুন সড়ক হয়েছে, সেই সড়ক ধরেই গাড়ি যেচে। সড়ক লতুন বটে, তবে কাঁচা তো, বর্ষাকালে একহাঁটু কাদা হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় রাস্তা ভেঙে এমন এঁটেল কাদা হয়েছিল যি মোষই কাদায় ডুবে যেত। অ্যাকন এই চোত-বোশেখে সেই কাদা শুকিয়ে একহাঁটু করে ধুলো হয়েছে। কি ধুলোই না উড়ছে, নিশ্বেস নিতে পারছি না।

বাপের বাড়ি যেতে এক কোশ দ্যাড় কোশ যেয়ে এই সড়ক ছেড়ে আবার আগের মতুন মাঠে মাঠে যেতে হবে। বাদশাহি পাকা সড়ক দিয়ে যাওয়া যায় বটে তবে সি খুব ঘুরপথ। সিদিক দিয়ে কে যাবে, মাঠে মাঠে যাওয়াই ভালো। গাঁয়ে যেতে শেষ এক কোশ আবার পাওয়া যায় পুরনো একটো পাকা সড়ক। এই সড়ক ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। আমাদের গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেয়েছে, কতো দূর গেয়েছে জানি না। এই সড়কে গাড়ি উঠলেই আমার মনে হয়, এই তো চলে এলম বাড়ি! মনে ত্যাকন খুব আনন্দ হয়। বাড়ির বউ আর বাড়ির মেয়ে বলে কথা! তফাত কতো! পাকা সড়কে উঠে আনন্দ ইবারও হছিল, যেদিও আগের মতুন লয়। এট্টু বাদে সি খুশিটো-ও মাটি হয়ে গেল য্যাকন পেছনের গরুর গাড়িটো পাশ দিয়ে এগিয়ে

যাওয়ার সোমায় গাড়োয়ান চেঁচিয়ে আমাদের গাড়োয়ানকে বললে, মেলিটারি গাড়ি হলে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমে যেও কিন্তুক, নাইলে তোমার গাড়ি ভেঙেচুরে মেলিটারি গাড়ি বেরিয়ে যাবে। মরলে, না বাঁচলে, ফিরে চেয়ে দেখবে না। এই বলে নিজের গাড়ি সে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমি গাড়োয়ান ছোঁড়াটোকে বললম, কি র‍্যা, কিছু বুঝলি? সে দাঁত বার করে হেসে বললে, শুনেছেলম বটে ইদিকে কোথা মেলিটারি ঘাঁটি করেছে। দিন নাই, রাত নাই, উয়াদের গাড়ি যেচে আসছে। বলতে বলতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে কি দেখে বললে, উই দ্যাখো, মেলিটারি গাড়ি আসছে।

এই রাস্তায় কুনোদিন তেমন গাড়ি-ঘোড়া দেখি নাই। বাস অবশ্যি চালু হয়েছে হালে। সকালে দোপরে সাঁঝবেলায় এই মাত্তর তিনটে বাস। রাস্তা সারাদিনই সুনসান থাকে। গাড়োয়ান ছোঁড়ার কথা শুনে আমি কি একটো বলতে গেলম, আর তখুনি সেই মেলিটারি গাড়িটো এসে পড়ল। ধুলোর মদ্যে ছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পাই নাই, অ্যাকন দেখলম, একটো ছোট গাড়ি। পরে নাম জেনেছেলম এই গাড়িগুলিনকে জিপগাড়ি বলে। খাকিরঙ একটু দূরে গেলেই আর দেখতে পাওয়া যায় না। দেখতে দেখতে গাড়িটো আমাদের গাড়ির কাছে এসেই বাঁশি দিলে। সি বাঁশির আওয়াজ যেন কেমন, গা-টো রি রি করে উঠল, হাঁড়ি চাঁচার আওয়াজ যেমন হয় তেমনি। বাঁশি একবার দিলে, দুবার দিলে– যেন তর সইচে না। ত্যাতোক্ষণে গাড়োয়ান ছোঁড়া ভয়ের চোটে মোষদুটোকে ডাকিয়ে হুড়মুড় করে গাড়ি নিয়ে মাঠের মদ্যে নেমে গেয়েছে। যেমন করে গেল আর একটু হলেই গাড়ি উল্টিয়ে যেত। উদিকে জিপগাড়ি রিরিরিরি করে বাঁশি দিতে দিতে আমাদের পেরিয়ে গেল। এক লহমার মদ্যে দেখলম, দুজনা না তিনজনা গোরা সোলজার বসে বসে হি হি করে হাসছে। মেয়েমানুষ দেখছে, তা আবার বেপদে পড়া মেয়েমানুষ, হাসবেই তো। বাঁদরের

পোঁদের মতুন লাল মুখ, গোরো ধপধপে– বসে আছে এক একটো যেন পব্বত!

গাঁ যেতে এই এক কোশ পথটো আর যেন ফুরুইতে চায় না। ঐ গাড়িগুনো একটোর পর একটো আসছেই। সয়রান থেকে আমাদের মোষের গাড়ি মাঠে নামাইতে সোমায় পাওয়াও যেচে না। মোষদুটো ভয় পেয়ে ছুটে নামতে যেয়ে গাড়ি উল্টিয়ে যাওয়ায় মতুন হচে আর রিরি করে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে জিপগাড়ি বেরিয়ে যেচে। একটো পেরুইচে তো আর একটো আসছে– কারাল নাই। পেত্যেক গাড়িতে একজনা দুজনা করে সেই হুমদোমুখো গোরা সায়েব বসে আছে। কেউ হাসছে, কেউ হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে, কেউ আমাদের বেপদ দেখে ভারি মজা পেয়ে খারাপ অঙ্গভঙ্গি করছে। এইরকম করে কতো গাড়ি যি গেল, কতোবার যি মাঠে আমাদের গাড়ি নামাতে হলো তা আর হিশেব নাই। এই এক কোশ রাস্তা মনে হতে লাগল আর কুনোদিন শেষ হবে না। পেছু দিকে দূরে গাড়ি দেখলেই তরাস হতে লাগল– এই ছোঁড়া, গাড়ি নামা র‍্যা– বলতে বলতে গাড়ি চলে আসছে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে। কাছে এসেও যি জোরে আসছিল তা একটুও কমাইছে না। বোঝাই যেচে, আমাদের গাড়ি রাস্তা থেকে সরাইতে না পারলে সব ভেঙেচুরে ওপর দিয়েই চলে যাবে, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা মরে থাকলেও ওরা একবার ফিরে তাকাবে না। পরের গাড়িটো হয়তো আমাদের লাশের ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবে। অ্যাকন দেখছি, শুধু গাড়োয়ানটোই লয়, দূরে গাড়ি দেখলেই আমার ছেলেমেয়েদুটিও ভয়ে নীল হয়ে যেচে। একটো পার হচে, নিশ্বেস ফেলছি, আবার একটো আসছে। সি যি কি বিভীষিকা হয়েছিল, কুনোদিন ভুলব না।

শ্যাষ পয্যন্ত গাঁয়ে ঢোকার বাগদিপাড়ার ঢালটো এলে জানে যেন পানি এল। মনে করি নাই যি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছুইতে পারব। ছোট ভাইটি বাড়িতেই ছিল, তাকে ইসব কথা বলতেই বললে, অ,

তোমরা জানো না বটে। তোমাদের উদিকে এখনো তো ইয়ারা যায় নাই, জানবে কি করে? ইদিকে খুব উপদ্রুব হচে। তিন কোশ দূরে সয়রানের পাশেই উযোর বেরাট ড্যাঙায় মেলিটারিরা অ্যারোডম করেছে। ছারখার করে দিলে এলেকা। গরু-ছাগল-মুরগি এন্তার খেয়ে ছয়লাপ করে দিচে। এই হুজুগে কতো ব্যাবসাই করছে গাঁয়ের লোকে, তা করুক! কিন্তুক শালারা জানে বাঁচতে দেবে বলে তো মনে হচে না। আজ তোমাদের গাড়ি ভেঙেচুরে দেয় নাই ভাগ্য ভালো। পিতিদিন রাস্তায় কতো বেদম যি উয়ারা ঘটাইচে, কি বলব! গরু-মোযের গাড়ি একটো-দুটো তো পত্যেকদিন ভাঙছেই, কতো শেয়াল-কুকুর-ছাগল-গরু-মোষ পেত্যেকদিন চাপা পড়ছে। শালাদের জানে দুখ-দরদ বলে কিছু নাই— ছামনে রাস্তায় কিছু যি দেখলি, এট্টু আস্তে চালা— তা লয়, একটুও কমাবে না। গাড়ি নিয়ে মানুষ সরতে পারলে ভালো, নাইলে সোজা এসে মেরে দেবে। তাইলে বলি শোনো, সিদিন মারলে একটো গাড়িকে, গাড়ি যেয়ে পড়ল রাস্তার পাশে গাবায়। একটো চাকা খুলে গড়িয়ে কুন্‌দিকে চলে গেল, যি মুনিষটো চালাইছিল সে-ও ছিটকে কোথা যেয়ে পড়ল। ইদিকে ডাইনের হেলে গরুটো, যেটো গাড়ি টানছিল, তার একটো পা ভেঙে সি ত্যাকন গাবায় পড়ে আছে, তার গলায় লেগেছে গলান্দির দড়ির টুঁসি। জোয়াল উঠেছে আসমানে, কিছুতেই গলান্দির দড়িটো আমি আলগা করতে পারলম না— গরুটোর চোখের দিষ্টি কি— রক্ত বেরিয়ে এল গো চোখ দিয়ে! হাতে ছুরিকাটারি কিছু নাই, দড়িটো কেটে দিতে পারলম না। গরুটো ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে শ্যাষে মরে গেল। জ্ঞান হয়ে মুনিষটোর কি কাঁদন!

কথা শুনে ছোট বুনটি বললে, খালি উ কথা লয়। উয়ারা লিকিনি অ্যাকন গাঁয়ে-ঘরে ঢুকছে, যা মনে হচে তা-ই টেনে নিয়ে চলে যেচে। সিদিন তোমাদের বললম না— গা ধোব বলে ঘাটে গেয়েছি, গা ধোয়া হয়ে গেয়েছে, গামছাটো নিংড়ুতে নিংড়ুতে উঠে আসছি— এমন

সোমায় পেছু দিকে শিস দেবার আওয়াজ শুনে যেই ফিরে তাকিয়েছি, দেখি এই একজনা লালমুখো সায়েব পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে একটো ছবি তোলার কালো বাক্‌সো আমার দিকে তাক করে আছে। তাই দেখে আমি ছুটেমুটে বাড়ি এসে মাকে সব বললম। শুনে ভাই বললে, কই আমি তো শুনি নাই, খবরদার আর ঘাটে যাবি না।

তাইলে ইবার কেরমে কেরমে যুদ্ধু এসে বাড়ির মদ্যে ঢুকে যেচে। পেলেন তো অ্যানেকদিন থেকেই দেখছি। পাখির মতুন ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে, যেচে। পেথম পেথম হাঁ করে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতম। ত্যাকন আসতও অ্যানেক কম। একটো-দুটো। গুড়গুড় করে আওয়াজ হতো, ম্যাঘের আওয়াজের মতুনই কিন্তুক ম্যাঘ তো লয়, আকাশে ম্যাঘের বংশ নাই, ম্যাঘ ডাকার আওয়াজ আসবে কোতা থেকে! তাপর দেখতম, আসমানের এক কোণ দিয়ে পাখির মতো উড়ে এল পেলেন। রোদে ঝকঝক করছে, তাকিয়ে দেখতে গেলে চোখ ধাঁধিয়ে যেচে। পাখির মতুনই ড্যানা আছে বটে কিন্তুক সি ড্যানা থির, পেথম পেথম দেখে ভারি অবাক লেগেছিল। য্যাতো এগিয়ে আসছে, গুড়গুড় আওয়াজ ত্যাতোই বাড়ছে। দেখতে দেখতে মাথার ওপর দিয়ে কোনাকুনি আকাশ পেরিয়ে মিলিয়ে গেল। কখনো একটো, কখনো দুটো। দেখতে ওইটুকুনি লাগছে বটে, শুনেছি, আসলে ছোটখাটো একটো বাড়ির মতুন। কান-ফাটানো আওয়াজ করতে করতে মাথার একদম ওপর দিয়ে যাবার সোমায় দেখেছি, সত্যি অত ছোট তো লয়, বেশ বড়।

তা এই পেলেনও দেখছি অ্যাকন অ্যানেক আসছে আর য্যাখন-ত্যাখন আসছে। আজকাল আর খেয়ালও হয় না। একসাথে আট-দশটোও আসছে, অত খেয়াল করবে কে? দিনের মধ্যে কতোবার যি আসছে যেচে, কতোরকম করে আসছে, একটোর পেছনে দুটো, পাশাপাশি চারটো, ছামনে তিনটো, পেছনে তিনটো, ডিগবাজি মারছে— নিজের মনে কাজ করছি, একবার একবার তাকিয়ে দেখছি,

কি দেখছি তা-ও খেয়াল হচে না। অ্যাকন মনে হচে, তাই তো, যুদ্ধুর গাড়িঘোড়ায় দ্যাশ যি ভরে গেল। আজ রাস্তায় য্যাতো গাড়ি দেখেছি, মনে হচে, তাইলে সারা দ্যাশে না জানি কতো গাড়ি এয়েছে আর তাদের সাথে কতো সায়েব, কতো গোরা সেপাই ই দ্যাশে এয়েছে! যুদ্ধু এখন নাই কিন্তুক দ্যাশ ভরে গেয়েছে যুদ্ধুর সরঞ্জামে। আমরা গাঁয়েগঞ্জে অত দেখতে পেচি না, শহর-নগর তাইলে নিচ্চয় ভত্তি হয়ে গেয়েছে। হঠাৎ ভয়ে আমার বুক হিম হয়ে গেল। এত সাজ-সরঞ্জাম, এত আয়োজন তবু যুদ্ধুর তো কিছুই নাই অ্যাকন! তাইলে য্যাকন যুদ্ধু দ্যাশে আসবে ত্যাকন কি হবে?

আমার খোঁকা দেখছি উত্তর-দুয়োরি ঘরের উসারায় বসে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। গুড়গুড় আওয়াজ হচে দখিন-পশ্চিম কোণে। দেখতে দেখতে আট-দশটা পেলেন এগিয়ে এল। কতো ভঙ্গি করছে, দুটো এগিয়ে আসছে, আবার পিছিয়ে যেচে আর খালি ডিগবাজি দিচে, ইসব কি খেলা? খোঁকা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি মনে হলো, ছেলেটোকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলম।

সব যেন কেমন কেমন লাগছে। কবছর আসি নাই ঠিক, তা বলে কিছুই তো বদলায় নাই। বুন তিনটো বড় হয়ে গেয়েছে, তিনজনাই সোন্দরী– একজনা যেন রাজরানী হবার লেগেই জন্মাইচে, তার রূপ দেখে ভয় লাগে– আর একজনার মাজা মাজা রঙ, টানা টানা চোখ, কোমর পয্যন্ত লম্বা চুল আর ছোটটোর দিকে তাকাইলে চোখ ধেঁধে যায়– পাড়াগাঁয়ে এত রূপ– কি করে যে কি হবে! আজকাল আবার মেলিটারিরা সব গাঁয়ে ঢুকতে শুরু করেছে।

রাতটো ক্যানে যি এতো অসোয়াস্তিতে কাটল জানি না। লতুন মায়ের সাথে পিতিবার কতো কথা হয়, ইবার কথা খালি কেটে কেটে যেচে। বড় হয়েছে বলে কি না জানি না, বুনরাও যেন কি কথা বলবে খুঁজে পেচে না। মনে হলো, অ্যানেকদিন পরে আসা হয়েছে তো, তাই এরকম হচে, দু-একদিন বাদে আবার সব আগের মতুন হয়ে

যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি, সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, বেলা অ্যানেকটাই হয়েছে। অন্য অন্য বার আমি বাড়ি এসে পৌঁছুলেই গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ অ্যানেকেই বাড়িতে দেখা করতে আসে, কতো গপ্পো-গুজব করে। ইবার আর তেমন কেউ আসে নাই। তাই আমি ভাবলম, হাত-মুখ ধুয়ে আমি বরঞ্চ একবার পাড়াটো ঘুরে আসি। গাঁয়েরই মেয়ে তো আমি!

এইবার যাব, এইবার যাব করছি, এমন সোমায় খবর এল, মীরপাড়ার ওলি মামুর ভোরবেলা থেকে ভেদবমি অরম্ভ হয়েছে। শুনে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। স্বপনেও ভাবি নাই, ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি আসব আর এই মহামারী রোগ ই-গাঁয়ে অরম্ভ হয়ে যাবে। দু-বছর তিন বছর বাদে বাদে ই রোগদুটি— ভালো কথায় বলে কলেরা আর বসন্ত— লোকে এমনি বলে পেট-নামা নামুনে আর মা-শেতলার দয়া— এই রোগদুটি আসবেই, কেউ ঠেকাইতে পারবে না। আর যি বছর আসবে গাঁ-কে গাঁ একদম উজাড় হয়ে যাবে। গেল দু-তিন বছর ক্যানে জানি না ভুলে ছিল আর অ্যাকন অরম্ভ হবি তো হ আমার বাপের বাড়ির গাঁয়েই শুরু হয়ে গেল। এই সকালবেলাতেই ওলি মামুর খবর প্যালম। সোমায় তো বেশি নেবে না, হয়তো বৈকালবেলাতেই শুনব ওলি মামু আর নাই। শুনে অবদি নিজের কথা ভাবছি না কিন্তুক ছেলেমেয়ে কারুর যেদি কিছু হয়, তাইলে কত্তার কাছে কি জবাব দেব? এই জায়গায় কত্তার কাছে কুনো মাপ নাই। কেন তুমি সাথে সাথে ফিরে এলে না? যা হবে আমার চোখের সামনে হবে। আর কুনো কথা সি শুনবে না। মাকে বললম, ও মা, আমার যি খুব খিদিবিদি লাগছে। এই কথা শোনবার পর থেকে আমি যি কিছুতেই থির থাকতে পারছি না। মায়ের বুদ্ধি যি কি ঠান্ডা, আমার কথা শুনে বললে, মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি কালই বাড়ি ফিরে যাও। যার ধন তার কাছে যাও। এই কথা আমিও ভাবছি। দিন ভালো হলে আবার আসবে। তোমার ভাইকে বলছি, কালই দিয়ে আসুক তোমাদের।

চলে যাব শুনে বুনরা কাঁদতে লাগল। সারাবছর তারা বসে থাকে। কখনো বছরের পর বছর এন্তেজার করে থাকে কবে তাদের বুনপো-বুনঝিরা আসবে। তাদের নিয়ে কি কি করবে তারা খুঁজে পায় না। আর ইবারে আজ এসে কাল তাদের যেতে হবে!

বৈকালের মদ্যেই খবর পাওয়া গেল, মীরপাড়ায় আরও দু-তিনজনার পেট নেমেছে। রোগটি ওলাউটোই, আর কিছু লয়। মুন্সিপাড়াতেও একজনার শুরু হয়েছে। যে ইসব খবর আনতে গেয়েছিল সে আমার এক বুন। কথায় কথায় বলেছে, মাহামারীর খবর পেয়ে বড় বুবু ছেলেমেয়ে নিয়ে কালই আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে। তাই শুনে সি পাড়ার এক বাঁজা-বউ বলেছে, অ, ওলাউটোর কথা শুনে পালাইচে তোর বুন! ছেলেপিলে যেন আর লোকের নাই! যোম যেদি একবার চেনে, যেখানেই যাও, পেচু পেচু যেয়ে ধরবে।

ছি ছি, এমন কথা কেউ বলে! কথাটো শুনে কি দুঃখ যি হলো! জান আর জানে থাকছে না! দুনিয়ার সব্বারই বুকের ধন ভালো থাকুক, ছি ছি, ই কি কথা! আমার ছোট বুনটো ভারি রাগী, ভারি তেজি। সে বললে, একুনি সে মুন্সিপাড়ায় যাবে ঝগড়া করতে। বহুৎ কষ্টে তাকে সামলালম।

তিমি-সাঁঝবেলাতেই খবর পাওয়া গেল, ওলি মামু আর নাই।

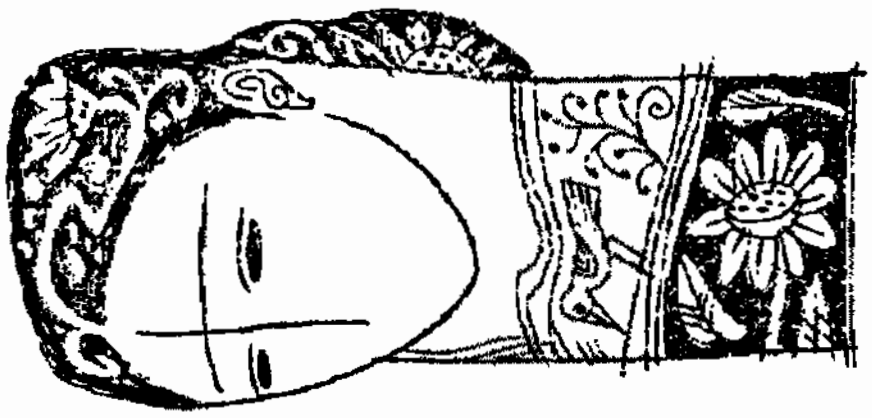

গিন্নি বিছেনা নিলে, আর উঠলে না

বাড়ি ফিরে অ্যালম কিন্তুক এক দিন পরেই ক্যানে অ্যালম সি কথা কাউকেই বলতে চাই নাই। ননদ একবার শুদুইলে বটে, মেতর-বউ, দু-দিন থাকতে গেলে, কতোদিন যাও নাই বাপের বাড়ি, তা একদিন বাদেই ফিরে এলে ক্যানে? ননদ শুদুইলে্ বটে কিন্তুক গিন্নি লয়। ঐ মানুষ কি সব বুঝতে পারত? আমি আর থাকতে না পেরে নিজে থেকেই বলে ফেললম সব কথা। শুনে গিন্নি বললে, ভয় কি মেতর-বউ, আল্লার দুনিয়ায় সব জায়গাই সোমান। তা বেশ করেছ, ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এয়েছ। কত্তাও শুনে তেমন কিছু বললে না, খানিক চুপ করে থেকে শুদু বললে, ভয় পেয়ে কি কিছু হয়, সাবধান হওয়া দরক্যর।

ঠিক কথা। হিঁদুদের মা-শেতলা লিকিন যোবতী নারী, গাঁয়ে তার পুজো হয়। তাইলেও সি কি কথা শোনে! আর মোসলমানদের ওলাবুড়ি নিজের নোংরা কাপড়ের পুঁটুলিটো নিয়ে গুটগুট করে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে হেঁটে আসবে, ঐ কুঁজো বুড়িকে এক লহমার লেগে কেউ থামাইতে পারবে না। আসতে অ্যানেক সোমায় লাগতে পারে, মনে হবে বুড়ির পা বুঝি ভেঙে পড়ছে, এইবার বুড়ি মাঠের মদ্যে মরা শুকনো ক্যাঁকড়ার খোলের মতুন পড়ে থাকবে। তা লয়, সে ঠিক এসে ঢুকবে গাঁয়ে। এবার এমন রোদ, এমন গরম, এক দিনও বিষ্টি হয় নাই, আমের বোলগুনো সব শুকিয়ে গেয়েছে, বড় বড় পুকুরের পানি শুকিয়ে খালি কাদাপানি আছে। মারী-মড়ক এলে ওমনিই হয়।

একদিন বাদেই ডোমপাড়ায় দু-একজনার নামুনির খবর পাওয়া গেল, তাপর দু-দিন কি তিনদিন পেরোয় নাই, সারা গাঁয়ে ওলাউটো ছড়িয়ে পড়ল। অ্যানেক রোগের মতুন ই রোগেরও চিকিচ্ছের কুনো বালাই নাই। তা সোমায় নেবে না, ভাবতে দেবে না, শোক করতেও

দেবে না। এক বাড়িতে একজনা মরল, তার দাফন-কাফন হতে না হতে আর-একজনা মরল। পাশাপাশি বাপ আর ব্যাটার লাশ, নাইলে মা আর মেয়ে, নাহয় দু-বুন, দু-ভাই— এমন আবস্তা, দাফন-কাফন করবে কে? কবর খুঁড়বে কে? হিঁদুদের মড়া হলে পাঁচ কোশ দূরের শ্মশানে পোড়াইতে নিয়ে যাবে কে? সোমায় কি করে পাওয়া যাবে? ভোররেতে ভেদবমি অরম্ভ হলো, দিনটোও গেল না, সাঁঝের আগেই শ্যাষ। পানির মতুন দাস্ত হচে, আর চাল ধোয়া শাদা পানির মতুন বমি হচে, একবার থামাথামি নাই। য্যাতো ভেদবমি হচে, রুগির ত্যাতো লাগছে পিয়াস, উঃ সি কি পিয়াস, দুনিয়ার পানি এক চুমুকে শ্যাষ করবে। এমনি করে করে দোপরের পর থেকেই নেতিয়ে পড়বে, জেরবার হয়ে যাবে, হাত-পায়ের আঙুলে খাল্ লাগবে। চিকিচ্ছে-মিকিচ্ছে বাদ দিয়ে ত্যাকন একটোই কাজ— মওত আসার আগে পয্যন্ত কি করে রুগিকে এট্টু আরাম দেওয়া যায়। একজনা পাখা করে, বাতাস দেয়, আর-একজনা হাতের পায়ের আঙুল টেনে টেনে সোজা করে। শ্যাষকালে রুগির গাল বসে যায়, চোখ কোটরে ঢুকে যায়, রুগি চোখে দেখতে পায় না, তারপর সুয্যিও ডোবে রুগিও চোখ বোজে।

চার-পাঁচ দিনের মদ্যে বাগদিপাড়া, মুচিপাড়া, বাউরিপাড়া পেরিয়ে এসে বামুনপাড়া, আগুরিপাড়া, তিলিপাড়ায় ঢুকে পড়ল ওলাউটো। মোসলমান পাড়াতেও ঢুকলে, তবে এট্টু দেরিতে। সি যি কি হতে লাগল, উরি বাপরে! পেত্যেকদিন একটো-দুটো-তিনটো করে যেতে লাগল। তাইলে কি কেউ বাঁচবে না? আমি ক্যানে বাপের বাড়ি থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে পালিয়ে অ্যালম? বাঁজা-বউটির কথাই সত্যি, যোম পেচু পেচুই আসে, যাকে চেনে তাকে ধরে-বেঁদেই নিয়ে যায়। এই বেপদে কত্তার মাথা কিন্তুক একইরকম ঠান্ডা। সে বাড়ির ভেতরে এসে বললে, মা, কেউ যেন না-ফুটনো পানি খায় না। এ রোগ মাছিতে আনে, খাবারের ভেতর দিয়ে আসে। খাবারের ভেতর দিয়ে না গেলে

কিছুতেই এ রোগ হবে না। না-ফুটনো পানি এক ফোঁটা কেউ খাবে না, বাড়ির বাইরে কেউ কিছু খাবে না, সব খাবার ঢাকা দিয়ে রাখো। বাসি আর ঠান্ডা খাবার সব ফেলে দাও।

কত্তা যা যা বললে গিন্নি ঠিক ঠিক তা-ই করলে। বাড়ির কারুর সাধ্যি হলো না যি তার একটি কথা অমান্যি করে। গাঁয়ের ভেতরে পাড়ায় পাড়ায় যেয়ে কত্তা এই কথা সবাইকে বললে বটে কিন্তুক কে শোনে কার কথা? আর শোনা কি সোজা কথা? কে অত জ্বালট জোগাড় করবে আর পানি ফুটোবে? এট্টুখানিক পানিতে আর কি হবে, টিউকলের পানি, পোষ্কারই তো রয়েছে, ঐ খেলে আর কি হবে– এই মনে করে লোকে পানি খেচে। আ-ঢাকা ঠান্ডা খাবার তো আখছার খেচে। খাবার কি শস্তা, ফেলে দেবে ক্যানে, খেয়ে ফেলছে। কিন্তুক ই বাড়িতে কত্তা এমুনি করলে যি উসব করার কুনো উপয় থাকল না।

দশ-পনেরো দিনের মদ্যে গাঁয়ের অ্যানেক লোক মরল। হাড়িপাড়া বাগদিপাড়া মুচিপাড়ায় বেশি, ভালো হিঁদুপাড়াতেও অ্যানেকে গেল। মোসমলানপাড়া থেকেও চার-পাঁচজনা দুনিয়ার মায়া কাটাইলে। দু-হপ্তা বাদে একদিন খবর পাওয়া গেল, হারামজাদি বুড়ি ওলাবিবি কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে ঠিক ঝুঝ্‌কিবেলায় পুব-দখিন কোনাকুনি মাঠ পাড়ি দিয়েছে। ঝাঁটা মার্, আবার কুন গাঁয়ে ঢুকে গাঁ উজাড় করবে কে জানে! এই কদিন মুসিবতের শেষ ছিল না– কেমন করে দিন যেছিল, কেমন করে রাঁদা-খাওয়া হছিল, সি আর কি বলব! ছেলেমেয়ে খেলা ভুলে গেয়েছিল, খাওয়া ভুলে গেয়েছিল, ঘুমনো ভুলে গেয়েছিল। আমরা মায়েরা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি– ইয়াদের মদ্যে কেউ কি যাবে, তার এগু যেন আমি যাই– এইরকম বুকবুকুনি করে দিন গেয়েছে, রাত গেয়েছে। কুনোদিকে মন ছিল না।

বুড়ি মাগি গাঁ ছেড়ে গেলে অ্যাকন মানুষের খেয়াল হবে গাঁয়ের

ই কি দশা হয়েছে! পেঁদনের কাপড় মিলছিল না তো অ্যানেকদিন থেকেই। বউ-ঝিরা আর কেউ কারুর বাড়িতে আসে না, বাড়িতেই থাকে। খুব দরকারেও পাড়ার রাস্তায় আসে না। পরনের কাপড়ের এমনি দশা যি আর আর বাড়িতে বেড়াইতে যাবে কি, একবার রাস্তায় বেরুবে কি– বাড়ির মদ্যে বাপ-ভাইদের ছামুতে বেরুতেই শরম লাগে। দিনের বেলাতেই কারুর গলা শোনা যায় না আর রাত লাগলে তো কথাই নাই। খেলাধুলোও বন্ধ, সাঁঝবেলাতেই নিঝুম রাত। কোথাও কুনো সাড়াশব্দ নাই। গাঁ যেন আঁদার কো-কাপ, কুনো বাড়িতে একটি আলো দেখা যায় না। কেরাসিন একদম গরমিল। মাথা খুঁড়লেও একটি ফোঁটা কেরাসিন পাবার উপয় নাই। গাঁয়ে দুটি মুদির দোকান আছে– দুটিই বন্ধ। কি বেচবে তারা? দোকানে কিছুই নাই– নুন নাই, তেল নাই, চাল নাই, আস্তে আস্তে সব গরমিল হতে লেগেছে।

আমাদের বাড়িতে দুটো হেরিকেন ছিল। একটো-কে ঘিরে ছেলেমেয়েরা সবাই গোল হয়ে বসে শোরগোল করে পড়ত আর একটো কত্তার ঘরে দিয়ে আসা হতো। সেই হেরিকেন দুটো অ্যাকন কেরাসিন বিহনে জ্বালানো হচে না। ভাগ্য ভালো, দিঘির ঢালু ঘেসো পাড়টোতে রেড়িগাছ লাগানো হয়েছিল, খুব রেড়ি হয়েছে! সেই রেড়ি ঘানিতে ভাঙিয়ে রেড়ির তেল পাওয়া গেয়েছে অ্যানেক। তাই দিয়ে পিদিম জ্বালানো হচে। একগাদা মাটির ছোট ছোট পিদিম কেনা হয়েছে আর কেনা হয়েছে চারদিকে চারটো মোটা কাচ লাগানো লন্ঠন। পিদিম জ্বালিয়ে ঐ লন্ঠনের মদ্যে রেখে হেরিকেনের কাজ চালানো হচে। রেড়ির তেলে চুবনো ত্যানার পলতেয় পিদিমে আর কতোটুকুন আলো হবে? ঘরের এক কোণে কুনোমতে মিটমিট করে জ্বলে। লন্ঠনের ভেতর রাখলে আলো একটু বেশি হয়, একটু বাতাসেই নেবে না। ঐ আলোতেই ছেলেমেয়েরা পড়া পড়ছে।

এমন করে আর কতোকাল? একদিন রেতে কত্তাকে বললম।

যুদ্ধ কি এইবার একটু একটু বুঝতে পারছ তো? প্রথমে দেখলে মানুষের পরনের কাপড় নাই। এখন দেখছ একটি-একটি করে জিনিশ গরমিল হচ্ছে– নুন নাই, কেরোসিন নাই, চিনি নাই। তার মানে গাঁয়েগঞ্জে যা যা তৈরি হয় না, তৈরি করতে পারা যায় না, তাই তাই নাই। যা কিছু বাইরে থেকে আসত, তা আর এখন পাওয়া যাবে না। জমিতে চাষ-বাস করে চাল ডাল তেল এইসব পেয়েছি বলে ততো অভাব মালুম হচ্ছে না– সব জিনিস যদি নিজেদের না থাকত, যদি কিনে খেতে হতো তখুনি বুঝতে পারা যেত যুদ্ধতে কি হয়।

তাইলে শহরের মানুষদের আবস্তা কি?

তাদের তেল নুন চিনি কেরোসিন তো বটেই, চাল ডালও কিনে খেতে হয়। শহরের লোকদের খেতে হচ্ছে বিদেশ থেকে আনা মোটা চাল। আমরা গাঁয়ে ভালোই আছি।

আমি কত্তাকে সেই বাপের বাড়ি যাওয়ার গঞ্জনার কথা বললম।

আমি জানি, খবরের কাগজে পড়ি, মাঝে মাঝে শহরে যাই– দেশে এখন আর দেশের লোক নাই– বিদেশীতে দেশ ভরে গিয়েছে। গোরা সেপাইতে, বিদেশী গাড়িতে, উড়োজাহাজে, কামান-বন্দুক গোলা-বারুদে, কোনো জায়গা আর বাদ নাই। শহরগঞ্জের পথঘাট, ট্রেন-বাস সব জায়গায় ওরা। ওদের যা লাগবে তাই জোগাতে হবে। ফলমূল, হাঁস-মুরগি গরু-ছাগল সব ওদের জুগিয়ে দিতে হবে। ট্রেনে বাসে ওদের পয়সা লাগবে না। সব ওদের দিতে হবে। মেয়েমানুষ পর্যন্ত বাদ নাই। না দিলে কেড়ে নেবে। ওরা যা খুশি তা-ই করবে, কোনো বিচার-আচার হবে না। যেখানে-সেখানে দেশের মানুষদের ওরা লাথি মারছে, ডান্ডা মারছে, মেরেও ফেলছে– কিছুই বিচার নাই। খুব খারাপ দিন আসছে। সারা দুনিয়ায় এই যুদ্ধ, পশ্চিম দুনিয়ায় এখন থমকে আছে, যুদ্ধ এখন পুবের দুনিয়ায়। কিছুই থাকবে না, সব মিশমার হয়ে যাবে। ফসলভরা একটা মাঠে পঙ্গপাল বসলে কি হয় দেখেছ? চার-পাঁচদিন পরে যখন দলটা চলে যায় তখন মাঠে শুকনো

খটখটে শাদা মাটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। একটা ঘাসও আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই যুদ্ধ শেষ হলে ঠিক তা-ই হবে, একটা ঘাসের ডগাও পড়ে থাকবে না সব বিরান মরুভূমি হয়ে যাবে।

এত ভেবে আর কি করব? যা হয় হবে। এবার আকাশের আবস্তাও খারাপ। ই কি খরানি! দু-মাস ধরে একটি ফোঁটা বিষ্টি নাই। কোথাও কুনো ছেঁয়া নাই। সারা গাঁ উদোম খোলা পড়ে আছে। বড়-ছোট কুনো গাছে পাতা নাই, ভয়ে সব যেন কাঠি হয়ে গেয়েছে।

একদিন দোপরের খানিক আগে সব্বোনাশ হলো। উঠনে ধান মেলে দেওয়া ছিল, গিন্নি সেই ধান নাড়াতে যেয়ে হোঁচট খেয়ে, নাকি এমনি এমনি, পড়ে গেল। আমরা ছুটে তাকে তুলতে গ্যালম। হালকা মানুষ, বয়েস হয়েছে, শরীর শুকিয়ে গেয়েছে, তুলতে কষ্ট হলো না আমাদের। কিন্তুক গিন্নিকে হাঁটাতে যেয়ে দেখলম গিন্নি হাঁটতে পারছে না। খুব জোরে আঘাত লেগেছে কিম্বা কোথাও কিছু ভেঙেছে বলেও মনে হলো না। ইদিকে দেখছি গোটা ডান পা আর ডান হাত লাঠির মতুন সোজা হয়ে রয়েছে। গিন্নি কথাও কিছু বলছে না। ত্যাকন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, মুখের চারদিকটো কেমন বেঁকে রয়েছে। এই দেখে আর কুনো কথা না বলে আমরা ধরাধরি করে গিন্নিকে নিয়ে উত্তর-দুয়োরি ঘরের মেঝেয় বিছেনা পেতে শুইয়ে দেলম।

সেই যি শয্যে নিলে গিন্নি, আর উঠলে না। ডান দিকটো, শরীলের পেরায় আধেক, একবারেই অবশ। হাতও নড়ে না, পা-ও নড়ে না। এত চেষ্টা করে গিন্নি কথা বলতে। তা মুখের বাঁ দিকটো এক-আধটু নড়াচড়া করছে বটে কিন্তুক ডান দিকটো থির। মুখ দিয়ে শব্দ হচে কিন্তুক একটি কথাও বোঝা যেচে না।

খবর পেয়ে কত্তা এল, অন্য সব ভাইরা এল, ছোট দ্যাওরকে খবর দেওয়ার লেগে শহরে লোক গেল, গাঁয়ের ডাক্তারটোও তখুন-তখুনি এল। সে বললে, আবস্তা খারাপ। ই রোগের নাম সন্ন্যাস রোগ। ই রোগেই বাপজি মরেছিল। মাথার শিরে ছিঁড়ে যায়, মাথার ভেতরে

শরীলের সব রক্ত জমা হয়ে দইয়ের মতুন থকথকে হয়ে যায়– তারপর দু-একদিনের মদ্যে রুগি মারা যায়। চোখে অন্ধকার দেখলম। তাইলে আর আমাদের গিন্নির হেয়াৎ নাই? গিন্নি ব্যাগোরে ই সোংসার একদিনও চলবে না, কেউ চালাতে পারবে না। আমি বউ হয়ে এসে মাকে মা, শাশুড়িকে শাশুড়ি একসাথে পেয়েছেলম। একদিনের লেগে ভাবি নাই, আমার কুনো দায় আছে। বুঝেছেলম যি শুদু হুকুম শুনলেই হবে। অ্যাকন কে হুকুম দেবে, কার হুকুম শুনব? এই কাঠির মতুন ফরশা রোগা এতটুকুন মানুষ শুয়ে আছে, উ কুন ধাতুতে তৈরি তা কেউ না জানলেও আমি জানি। ঐ শুকনো পাথরে কতো পানি, কতো মায়া, কতো দয়া–আমি হুহু করে কেঁদে ফেললম। তাই শুনে কত্তা এমন করে আমার দিকে চাইলে যি, কাঁদন সাথে সাথে গিলে নিতে হলো। কত্তা বললে, কিছু হয় নাই, রোদে মাথা ঘুরে গিয়েছে, দুর্বল শরীর, তাই পড়ে গিয়েছে, দু-দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বড় খোঁকাকে দেখার লেগে যি ডাক্তার এয়েছিল শহর থেকে, সেই ডাক্তার আবার এল। রুগি দেখে ডাক্তার বললে, শিরা ছেঁড়ে নাই, তাইলে বাঁচত না। মাথার ভেতর শিরা দিয়ে রক্ত যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেয়েছে বলে রক্ত জমে গেয়েছে। তখন-তখুনি য্যাকন রুগি মারা যায় নাই, আর ভয় নাই, রুগি এখুনি মারা যাবে না। ওষুধ খেতে হবে, রুগিকে খুব যত্নের মদ্যে রাখতে হবে, খাবার পথ্য যা যা লিখে দেওয়া হবে ঠিক তাই তাই খাওয়াতে হবে। আশা দিয়ে ডাক্তার বললে অবশ ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে– কথা হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই বলতে পারবে। এখুনি হাঁটতে পারবে না– তবে আস্তে আস্তে আবার হাঁটার ক্ষমতা ফিরে আসতেও পারে।

ডাক্তারের কাছ থেকে সব বুঝে নিয়ে কত্তা আমাদের বউ-ঝিদের সবাইকে ডাকলে– ভাশুর হয়েও সব ভাজ-বউদেরও ডাকলে– ডেকে বললে, মায়ের সামনেই বলছি– শাশুড়ি তার কথা শুনতে বা বুঝতে পারলে কিনা, জানি না– একদিষ্টে তাকিয়ে ছিল দেখলম– তা কত্তা

বললে, আমার কাছে দুনিয়া একদিকে আর আমার মা একদিকে। কাজ সব ভাগ করে নাও, কে কি করবে। পায়খানা-পেশাব থেকে শুরু করে সব কাজই করতে হবে। আমার দিকে চেয়ে এই পেথম সবার ছামনে আমাকে বললে, এই কাজটা তুমি নিজের হাতে করবে। তাপর বুনের দিকে চেয়ে বললে, মহুদা সবারই কাজ দেখবে। মোট কথা, রুগির যদি এতটুকু অযত্ন হয়, মায়ের কাছ থেকে যদি কিছু জানি, তাহলে যে-ই হোক, তার কোনো খাতির নাই, এ বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

আমরা সবাই জানি, কত্তার কথার একটুকুন ইদিক-উদিক হবে না। গিন্নির সেবা এগু, তা-বাদে অন্য কিছু। ঘরের আর আর জিনিস সরিয়ে ফেলা হলো। শুদু সিন্দুকটো থাকল, তার ওপর পোষ্কার বিছেনা আর রুগির যা যা লাগে সব রাখা হলো। মাথার দিকে ওষুধ-পত্তর আর ফলমূল পথ্য এইসব। কত্তা মুটের মাথায় চাপিয়ে মায়ের লেগে কতো জিনিস যি আনলে! ডাবের পাহাড় হলো, বাজার ঘুরে ঘুরে বেদানা, নাশপাতি, খেজুর, কলা, আম, লিচু সব কিনেছে সে, কিছু বাদ নাই। এত আক্রা-মাগনের দিনে পয়সা পেচে কোথা– একদিন এই কথা শুদুলে কি রাগ কত্তার!

তাতে তোমার কি দরকার? বাড়িতে কি ধান-চাল কিছুই নাই! এক শো বিঘে জমি আছে কিসের জন্যে? সব বেচে ভিখিরি হব– যাও।

ওরে বাপরে! আর একটি কথাও বলা নয়। উ মানুষের এমন রূপ কুনোদিন দেখি নাই। তা আমি কিছু বারণ করেছি? আমাকে অত কথা বলার দরকার আছে? গিন্নির সেবার লেগে আমাকে বলতে হবে ক্যানে? ঐ মানুষ আমার মায়ের বেশি, বাপের বেশি, ই সোংসারের মুদুনি। মুদুনি ভাঙলে কি আর ঘর থাকে? কত্তা যি বুনকেই সব দেখতে বলেছে তার কারণ আছে। আমি জানি, গিন্নি গেলে ননদই লতুন গিন্নি হবে। ঐ মায়েরই তো মেয়ে, ভাইদের সোংসারের হাল সে ঠিকই

ধরতে পারবে। গিন্নির সেবা-যত্নের খবরদারি করা তারই কাজ বটে! তবে সেবা-শুশ্যুষার সব কাজ আমাদের বউদেরই করতে হবে। বড় বউয়ের ছেলেপুলে হয় নাই, কাজকম্ম সবই করে বটে কিন্তুক একটু আলগা আলগা, কুনো কিছুতেই তেমন আঁট নাই, নিজের ওপরেও যত্ন নাই, কোথাও তার কুনো বাঁধন পড়ে নাই, জেবনটা কুনো গতিকে কেটে গেলেই হবে, এমনি করে চলে সে। এইসব চারদিক ভেবে গিন্নির সব দায় আমাকেই নিতে হলো। বাড়ির আরও কাজ আছে, সিসব আর দু-বউ করুক। ছোটজনা তো শহরে আছে। আসবে হয়তো কাল-পরশু— দু-দিন থেকে আবার চলে যাবে। ছোট দ্যাওরের আপিস কামাই করার উপয় নাই।

আমাদের অত সেবা বেরথা গেল না। কদিন বাদেই দেখা গেল গিন্নির জবান আবার ফিরে আসছে। পেথমদিকে একটি কথাও বোঝা যেছিল না, সব কথা জড়িয়ে-মড়িয়ে খালি একটো গোঙানির মতো আওয়াজ শোনা যেছিল। তাপর মুখের ব্যাঁকাভাব কাটতে লাগল, একটি-দুটি করে কথা পোষ্কার হতে হতে আবার তার কথা আগের মতুন হলো। অসুখ যেন হয় নাই, সব আগের মতুন আছে। গিন্নির মনে কুনো ভয়-ভীত্ নাই। আগের মতুনই কি করতে হবে, না হবে, বলে। একবারও কই অসুখের কথা বলে না, নিজের কষ্টের কথা বলে না। একবার কাকে যেন বললে, মওত যখন আসবে তখন আসবে, আমি বেস্ত হব কেন। কথাবার্তা য্যাকন বেশ সড়োগড়ো হলো ত্যাকন কত্তাকে একদিন বললে, কি জানি বাবা, মাথাটা কেমন করে ঘুরে উঠল, ফুঁ দিয়ে পিদিম নিভিয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি দপ করে সুয্যিটা নিভে গেল। আর আমি কিছু জানি না।

তোমার সব ঠিক আছে তো এখন? সব কথা মনে করতে পারো তো?

হ্যাঁ, সব মনে আছে— শুধু এই হাঁটাটা বন্ধ। কেউ ফিরিয়ে না দিলে পাশ ফিরতেও পারছি না। বিছেনাতেই পায়খানা-পেশাব করতে হচ্ছে,

বাবা! শুধু এই জন্যেই মওত চাইছি। কেন কেউ এই কাজ করবে?

কথা শুনে চোখের পানি রাখতে পারলম না, ই কথা কেন বলছে গিন্নি। আমার কাঁদন দেখে গিন্নি কত্তার দিকে চেয়ে বললে, মহুদাই এই কাজ করত– কিন্তু আমি জানি মহুদাকে এ কাজ করতে দেবে না মেজ বউ। তুমি ভেবো না বাবা।

সোংসারের আর কুনো হ্যার-ফ্যার হলো না। সব আবার ঠিক আগের মতুন চলতে লাগল। শুদু একটো মানুষ দিন-রাত শুয়ে আছে, সব দেখছে, সব শুনছে। সে সবকিছুতেই আছে কিন্তুক কুনো কিছুতেই থাকতে পারছে না। সুরুজ ওঠার আগে তাকে বিছেনা থেকে উঠে বসিয়ে দিতে হয়, পাত্তর কেনা হয়েছে, তাতে পায়খানা-পেশাব করিয়ে দিতে হয়, মুখ ধুইয়ে দিতে হয়। তাপর সকালের বাঁধা খাবারটো খাইয়ে দিতে হয়। ডান হাতটো তো অবশ। এইরকম করে দিন অরম্ভ করে সারাদিনে তাকে কতোবার উঠিয়ে-বসিয়ে দিতে হয়, গোসল করাতে হয়, ওষুধ খাওয়াতে হয়, একটো মানুষের সব কাজ করে দিতে হয়। গিন্নি কিছুই বলে না। দিনের পর দিন যায়। তবে এক-একদিন গিন্নির চোখে কি এট্টু রাগ দেখি? বিড়বিড় করে কিছু যেন বলছে বলে মনে হয়। আমি জানি, গিন্নি কারু ওপর রাগে নাই, রাগ তার নিজের ওপর। বিড়বিড় করে আল্লাকে শক্ত শক্ত কথা বলে, শিগগিরি-শিগগিরি মওত চায়। একদিন লিকিনি কুন্ বউ পানি খাইয়ে হাতের গেলাশটো এট্টু বেরক্ত হয়ে ঠক করে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখেছিল। গিন্নি কত্তাকে সাথে সাথে ডেকে পাঠিয়ে বললে, সত্যি বলছি বাবা, একটুও রাগ করে বলি নাই, দুনিয়ায় দিন যদি শেষ হয়েই থাকে– শেষ তো হবেই একদিন, সব মানুষেরই হবে– তা যদি দিন শেষ হয়েই থাকে, আর কিছুই করার না থাকে, তাহলে দুনিয়ায় থাকা কেন, আল্লা কেন তবে নেয় না? এর কোনো মানে পাই না। তোমাকে শুধু একটি কথা বলার জন্যেই ডেকেছি, যার মন হয় না, সে যেন কিছুতেই আমার কাজ না করে। সে যেই-ই হোক, আমি তাতে এতটুকুনি রাগ করব না।

কথা শুনে কত্তা সবই বুঝলে, ঘর থেকে উঠে বাইরে যেতে যেতে ভারি কঠিন গলায় বললে, যার মন হবে না, সে যেন না মায়ের ঘরে যায়। ও ঘরে ঢুকে কেউ এতটুকুন বেচাল করলে, তাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেব।

দিন যেতে লাগল আগের মতুনই। সেই সকাল থেকে চুলো জ্বলছে, সারাদিন যজ্ঞ হচে, মুনিষ-মাহিন্দার যেচে-আসছে, ভালো-মন্দ খবর পেচি— কিছুই বাদ নাই। চুলো নিভছে সেই অ্যানেক রেতে। সারারাত আঙার থাকছে, ভোরে আবার সেই আঙার থেকেই চুলো জ্বালানো হচে। চেরকাল যা হবার তা-ই হচে। কিন্তুক আমার কাছে সব লাগছে অন্যরকম। সব জায়গায় কথা— শুদু এক জায়গায় কথা নাই। উত্তর-দুয়োরি ঘরের দরজা সব সময়েই বন্ধ। রুগি ছাড়াও ঘরে কেউ না কেউ সব সোমায়েই আছে কিন্তুক সব চুপ। গিন্নি থিরকাঠি হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের ফরশা রঙ ঘরের আবছা আলোয় যেন আরও ধপ ধপ করে। ঠিক আগের মতুনই শাদা থানের শাড়ি কপালের আধখানা ঢেকে আছে।

এই মানুষ কুনোদিন নামাজ কাজা করে নাই। আমাদের কারু ওপর কুনোদিন জোর-জবরদস্তি করে নাই, তবু সেই কতোকাল থেকে, বোধায় ই বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর থেকেই গিন্নি, ননদ আর আমি একসাথে পাশাপাশি বসে আসর, মাগরেব আর এশার নামাজ পড়তম। সেই নামাজে কি হতো তা তো আমাদের কারুরি জানার উপয় নাই তবে সোংসারের জ্বালার ওপর সি ছিল মলমের মতুন। গিন্নির পাশে বসলেই এই কথাটি মনে হতো। জবান আর জ্ঞানবুদ্ধি আবার ঠিক হয়ে যাবার পরে গিন্নি আবার নামাজ পড়ছে বিছেনায় শুয়ে শুয়েই। এক হাত তুলে দোয়া করা হয় কি না, জায়েজ আছে কি না, তাও একদিন কত্তাকে শুদিয়েছিল। কত্তা বলতে পারে নাই, শুদু বলেছিল, তুমি যেমন করে পড়বে তা-ই জায়েজ। গিন্নি অ্যাকন থির হয়ে শুয়ে শুয়েই নামাজ পড়ে, লষ্ট না হলে ওজুও করে না।

এমনি করে গিন্নি নিজের বিছেনায় শুয়ে থাকলে। কুনোদিন আর উঠলে না।

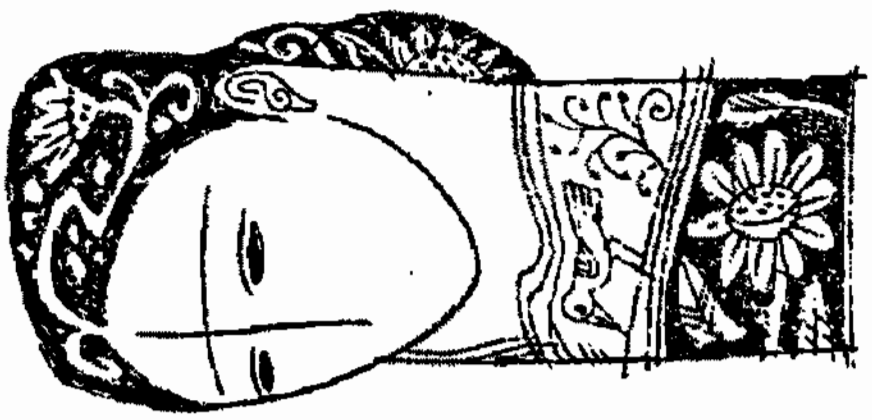

আকাল আর যুদ্ধুর দুনিয়ায় কেউ বাঁচবে না

কি ভায়ানক দিন এল! এমন খরানি বাপের জম্মে দেখেছি বলে মনে হয় না। আকাশের দিকে চাইলে চোখ পুড়ে যেচে, আসমানের নীল রঙ লাল হয়ে গেয়েছে। এক-একটো দিন যেন পাহাড়ের মতুন বুকে চেপে থাকছে– কিছুতেই পেরুইতে পারা যেচে না। সাথে আছে আবার যুদ্ধু আর আকাল। গেরস্তর নিত্যদিনের যা যা লাগে, তা যি শুদু আক্রা তাই লয়, পাওয়াই যেচে না। পেঁদনের কাপড়ের কথা আর কি বলব, সি তো পাওয়াই যেচে না। কেরাসিন নাই। কয়লার চুলো অ্যানেকদিন থেকেই বাড়িতে আছে, খুব ধুমো আর রান্নায় গন্ধ হয় বলে ঘসি আর কাঠের জ্বালটই ই বাড়িতে বেশি চলে। গাছ কেটে কেটে শ্যায, অ্যাকন গাছই পাওয়া যেচে কম। কয়লাটো এতদিন পাওয়াও যেছিল, দামেও শস্তা ছিল বলে কয়লা আনা হছিল এদানিং বেশি। সেই কয়লাও অ্যাকন আর পাওয়া যেচে না। নুন নাই, ট্যানাকাঠি নাই, চিনি নাই। চিনির অভাবে তেমন অসুবিধা হতো না, কারণ ই দিকের লোকে গুড়ই খায় বেশি। কিনতেও পাওয়া যায়, গাঁয়ের সালে নিজের নিজের সোংসারের গুড় তৈরিও হয়। ইবার কারুর বাড়িতে গুড় নাই, আমাদের বাড়িতেও নাই, অ্যাকন শুনছি মুদির দোকানেও নাই। যা বা এক-আধটু আছে গরিবের তা কিনে

খাবার কুনো উপয় নাই, এমনি দাম! গাঁয়ের তিনটো মুদির দোকানের দুটো বন্ধ, কুনো জিনিশ আনতে পারছে না, দোকানে রাখতে পারছে না কুনো জিনিশ দামের চোটে। দোকান খোলা রেখে কি করবে? বাইরের জিনিশ– কাপড়, কেরাসিন, কয়লা, নুন, চিনি ইসব কোথাও নাই। আর আর সামিগ্রি– চাল, ডাল, খাবার তেল, মশলা, ইসব গেরস্তদের কিছু কিছু থাকলেও গরিব মানুষদের কোথা থেকে থাকবে? তাদের কিনেই খেতে হয় ইসব জিনিশ। পয়সা তো কুনোদিনই নাই গাঁয়ের মানুষের হাতে, রুপোর টাকা-আধুলি-সিকি গরিবরা চোখেই দেখে না। উসব আসবে কোথা থেকে? ধান বেচে, চাল বেচে, টাকা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তুক বেচার মতুন ধান-চাল কজনার আছে! কুনোরকমে এট্টু ধান-চাল জোগাড় করতে পারলে লোকে তাই নিয়ে দোকানে যায়, ঐটি দোকানিকে দিয়ে মাপিয়ে দোকানিকে বিক্রি করে আধ পয়সার, সিকি পয়সার জিনিস কেনে। তবে সোংসার চলে। ইসব অ্যাকন বন্ধ। সব দাঁত টিপে ঘরে বসে আছে। রাঁধা-বাড়া, শখ-আল্লাদ সব গেয়েছে। যার খ্যামতা আছে, কুনোরকমে দুটো চাল ফুটিয়ে মাড়সুদ্দু খেচে, ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। কি কষ্টের কথা, গরু-মোষের লেগে মাড় রেখে দিয়েছি– উ পাড়ার এক বউ সেই মাড় চেয়ে নিয়ে গেল। কি, না মেয়ে তিনটো না খেয়ে আছে! এট্টু মাড় খেয়েও প্যাট ঠান্ডা করার রাস্তা নাই। মাড়টুকুনি না পেলে– কেউ কেউ হয়তো তাও পায় নাই– সি বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাইকে উপোস করতে হবে। ওমা, আমার কি হবে? জেবনে যি এমন ভাতের আকাল দেখি নাই, শুনি নাই।

কার লেগে কি করব! অ্যাকন জষ্টিমাসের মোটে আধেক যেচে, সারা বর্ষা পড়ে আছে, তা বাদে শেরাবন ভাদরের আলেদা আকাল আছে। ইদিকে ধান ছাড়া ফসল নাই, অঘ্‌ঘান মাসে দু-চারটি আউশ হয় বটে, সি কিছুই না। সবাই তা পায়ও না! আসল ফসল আমন

ধান, সেই পোষ মাসে। ঐ-ই একমাত্তর সারা বছরের খোরাক আর ঐ বেচেই আর যা যা লাগে তার বেবস্তা করতে হয়! তাইলে এতগুলিন দিন কেমন করে পেরুবে মানুষ? আবার শুনছি শহরে চালের দাম দ্বিগুণ হয়েছে, কেনে হয়েছে কে জানে? সি লিকিনি ফাগুন-চোতেই হয়েছে। গাঁয়ে তেমন বোঝা যেত না বটে। বোঝা যাবেই বা ক্যানে, গাঁয়ে চালই নাই, তা দাম বাড়ল না কমল জেনে কি হবে? খুব ভয় লাগছে, খুব ভয় লাগছে।

আর হুজুগের শ্যাষ নাই। পেত্যেকদিন লতুন লতুন হুজুগ। যুদ্ধুর আবস্তা খুব খারাপ হচে। বিটিশরা অ্যাকন সব জায়গা থেকেই লিকিনি পালাইচে। আমাদের এই বেরাট দ্যাশের লাগোয়া উদের আর একটো দ্যাশ আছে। সি দ্যাশের নাম হচে বর্‌মা। সি দ্যাশ বিটিশদের কাছ থেকে লিকিনি দখল করে নিয়েছে। আর একটো কথা খুব উঠেচে– জাপানিরা বোমা ফেলবে ই দ্যাশে। এই কথা নিয়ে গান বাঁধা হচে। মাঠে-ঘাটে ছেলে-ছোকরারা গাইছে, সারেগামাপাধানি, বোম ফেলেছে জাপানি। সি বোমা অবশ্যি অ্যাকনো পড়ে নাই। যি কুনোদিন পড়বে আর পড়লে ই দ্যাশের আর কুনো চিন্ন থাকবে না। জাপানিরা কম লয়, ওরাই ঐ বর্‌মা দখল করে নিয়েছে, অ্যাকন ই দ্যাশের দিকে এগিয়ে আসছে, ই দ্যাশটোও দখল করে নেবে বিটিশদের হাত থেকে। তার এগু বোমা ফেলে সব ছিতিছান-বিতিবান করে দেবে। জাপানিদের নাম আমরা আগে তেমন শুনি নাই। জাপানি কুন দ্যাশ? কেমন সি দ্যাশের লোক? তাদের সব আমাদের মতুন মা-ভাই-বুন-সোংসার আছে তো!

তা হুজুগের আর দোষ কি? সারা দ্যাশ আম্রিকার গোরা পল্টনে ভরে গেয়েছে। গাড়িঘোড়া সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তারা সব জায়গায় হাজির। দ্যাশের সবকিছু তাদের লেগেই। চাল-ডাল-আটা-গরু-ছাগল-ডিম-মুরগি আগে তাদের যা লাগবে সব দিয়ে তাপর ই দ্যাশের মানুষরা পাবে। এসবের অ্যানেক কিছুই চেরকাল ই দ্যাশের মানুষ

নিজেরাই করে আসছে নিজেদের লেগে। কেনাকিনির অত চল ছিল না। অ্যাকন সব দালাল হয়েছে, গাঁ-গঞ্জ থেকে গরু-ছাগল-ডিম-মুরগি ইসব কিনে নিয়ে যেচে, তাতে গেরস্তরা দুটো পয়সা পেচে ঠিক, পয়সার লেগেই সব বেচে দিচে। আগে নিজেরা কিছু খেত মাখত, অ্যাকন কাঁচা পয়সার লেগে সবই বিককিরি করছে, নিজেদের লেগে কিছুই রাখছে না। অবশ্যি উসব কিনে খাবার লোক আগে ছিল না, আর অ্যাকন তো নাই-ই। তাছাড়া কেউ কিনতে গেলে পল্টনের লোক এসে হাড়গোড় ভেঙে দেবে। যুদ্ধু ছাড়া অ্যাকন আর কুনো কথা নাই। গোরা পল্টনের গা থেকে লিকিনি কেমন একটো বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়, বললে না কেউ পেত্যয় যাবে সেই বোটকা গন্ধ অ্যাকন সারা দ্যাশে, পল্টন কাছে থাকুক আর না থাকুক। ই গন্ধই অ্যাকন যুদ্ধুর গন্ধ। রুগির ঘরে সেই গন্ধ, ভাতের থালায় সেই গন্ধ, ছেলের গায়ে সেই গন্ধ। চামড়া শুকোনোর গন্ধ।

অ্যানেকদিন থেকে আসমানের উড়োজাহাজের দিকে আর কেউ তাকিয়েও দ্যাখে না। দেখে কি করবে? গোঁ গোঁ আওয়াজ করে আসে, কখনো কখনো খুব নিচু দিয়ে আসে, কান যেন ফাটিয়ে দেয়, কখনো আসে খুব উঁচু দিয়ে, শব্দও শুনতে পাওয়া যায় না। জাপানিরা বোমা ফেলবে এই হুজুগ ওঠার পর থেকে অ্যাকন আবার লোকে পেরায় সব সোমায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোমা ফেললে তো উড়োজাহাজ থেকেই ফেলবে। কি করে বোঝা যাবে কুনটো ফেলবে আর কুনটো ফেলবে না। সব উড়োজাহাজ কি এক রকম, না আলেদা আলেদা? আজকাল আসছে অ্যানেক বেশি, আর আসছেও অ্যানেকবার করে। মাঝে মাঝে পাঁচটো-সাতটো একসাথে গুড়গুড় শব্দ করতে করতে গাছপালার ঠিক ওপর দিয়ে উড়ে যেচে। আগে ডিগবাজি মেরে মেরে খেলা করত— অ্যাকন সিসব দেখি না। দু-একটো দেখি একা একা আসছে, আসমান দিয়ে কোনাকুনি আসছে গুট গুট আওয়াজ করতে করতে— অ্যানেকটো সোমায় লাগছে আকাশ

পেরিয়ে যেতে। সি চলে গেলে সব আওয়াজ বন্ধ। দোপরবেলায় বাড়িতেও কুনো সাড়াশব্দ নাই।

আমাদের বড় ভাগ্নেটি, মা মরে গেলে কত্তা যাকে ই বাড়িতে এনেছিল, সে অ্যাকন খুব রূপের এক যোবক। সে শহরে একটো চাকরি পেয়েচে। এই মেলেটারির চাকরি। জাপানি বোমার হুজুগের পরেই এই চাকরি। সে বললে, একটো আপিসে বেবস্থা আছে, বোমা ফেলার লেগে উড়োজাহাজ এলে অ্যানেক আগেই লিকিনি জানতে পারা যাবে আর ত্যাকনই একটো হুইসিল না সাইরিন কি বাজিয়ে দেবে। সি অওয়াজ এত জোরে হবে যি সারা শহরের লোক জানতে পারবে আর সবাই সাবধান হয়ে যাবে। কি সাবধান? সারা শহরে গত্ত খুঁড়ে রেখে দিয়েছে এক-একটো খালের মতুন। সাইরিন বাজলেই যে যেখানে আছে, সেই খালের ভেতরে ঢুকবে, ছেলেমেয়ে-বউ-বিবি সব নিয়ে সেইখানে বসবে। বোমার উড়োজাহাজ চলে গেলে আবার অন্য রকম সাইরিন বাজলে সবাই উঠে আসবে। আরও একটা বেবস্থার কথা শোনলম। যেখানে-সেখানে বালির বস্তার দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। বোমা যেদি পড়েই তাইলে বোমার ভেতরে যিসব ভায়ানক জিনিস আছে, তা ঐ গত্তে ঢুকতে পারবে না, বালির দেয়ালও ভাঙতে পারবে না। ভাগ্নেটি এই চাকরি করছে, মাঝে মাঝে য্যাকন আসে, ত্যাকন এইসব কথাই শুনি তার কাছে। বেশ চাকরি করছে, মাইনে পেচে। বোমা ই পয্যন্ত পড়ে নাই।

নোহ নবীর সোমায়ের কেয়ামত কি আবার এল

হেঁশেল ঘরের উসারায় একটো খুঁটিতে হেলান দিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছি। পাঁচ দিন হলো বাদল নেমেছে। মাঠভরা ধান– ইবার লিকিনি খুব ফলন হয়েছে ধানের, বহুকাল এমন কেউ দেখে নাই। সবারই মনে আনন্দ। হবে না ক্যানে? ঐ এক ধান, ধান ছাড়া আর তো কিছুই নাই দ্যাশের মানুষের। আর কিছুই লয়, শুদু এই আমন ধান। সারা বছরের ঐ একটি ফসল–বর্ষায় রোয় আর পোষ-মাঘে কাটে। খাওয়া-পরা সবকিছুই ঐ ধানে। ই বছর খরানির কালে লোকের খুব ভয় হয়েছিল। আসমানের পানিই শুধু ভরসা, সেই পানি যেদি আষাঢ়-শেরাবনে না হয় তাইলে জমি আবাদ হবে না, বীজতলা শুকিয়ে যাবে আর ইয়ার মানে একটোই– মরণ। সারা বর্ষা পানির লেগে ত্যাকন হাহাকার– সেই কাত্তিক মাস পয্যন্ত। এই হলো খরানির ভয়, আবার পানি বেশি হলেও ভয়! ধান ভেসে যাবে না তো? জমি তলিয়ে যাবে না তো? কম হলে চাষির মনে দুরদুরুনি– শুকিয়ে যাবে না তো, জমি শুকিয়ে চরচরিয়ে ফেটে যাবে না তো? আর বেশি হলে ভয়, ভেসে যাবে না তো? এইরকম করে করে চলে।

ইবারের খরানির ভাব দেখে লোকে মনে করেছিল পানির অভাবে আবাদই হবে না, গেলবার পানির অভাবে চাষে জুৎ হয় নাই, লোকের খুব কষ্ট গেয়েছে, ইবারও যেদি ধান মরে যায়, তাইলে মানুষ আর কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। উদিকে যুদ্ধুর আগুন তো আছেই। কিন্তুক না, শ্যাষ পয্যন্ত আষাঢ় মাসের দিনকতক যেতেই ভালো বর্ষাই নেমেছিল। মানুষ খুব খুশি। পেটে ভাত নাই, পেঁদনে কাপড় নাই, ওলাউটোয় কতো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তবু মানুষ আশায় বুক বেঁধে ইবার খুব ভালো করে চাষ করলে। ঐ দু-মাসে পানি বেশিও হয় নাই, কমও হয় নাই। দেখা যেচে ধানও খুব ভালো হয়েছে। আমাদের সেজ আর ল-কত্তা চাষবাস নিয়েই থাকে– আমরা

তো আর মাঠে যাই না, ওরাই এসে বুনের কাছে গপ্পো করে, ইবারের নতুন ধান বহুকাল হয় নাই। পাঁচ-ছটো মরাই পিতি বছর হয়, ইবার মনে হয় সাত-আটটো হবে। আমাদের অতো বড় খামারেও জায়গা হওয়া কঠিন– দেখো, পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে লুকোচুরি খেলবে। ওরা বলছে আর আমি যেন দেখতে পেচি ধানের মরাইগুলিন!

ভাদর মাসে খুব বিষ্টি হয়, মাঠে পানি লাগেও বটে, হয়ও খুব। তাই সিদিন মাঝরেতে ঝমঝমিয়ে ম্যাঘ নামলে ভেবেছেলম বোধায় কদিনের মেয়াদি বাদল নামল। তার বেশি আর কিছু ভাবি নাই। পাঁচদিন আগে, সবাই ত্যাকন ঘুমিয়ে, ঘরবাড়ি সব আঁধার কো-কাপ। অতো রেতে মানুষ আলো জ্বালবেই বা ক্যানে? তার ওপর কেরাসিন নাই, সরষের ত্যাল নাই, রেড়ির ত্যাল নাই অ্যানেকের। পিদিম জ্বালাবেই বা কোথা থেকে? আবার আমাদের ঘরে অবশ্যি একটো আলো জ্বলত মিটমিট করে, কত্তা ঘর একদম আঁদার করতে দিত না। তা এমন দিন পড়েছে যি সি আলোও বন্ধ– সবাই ঘুমিয়েছে, আমিও মনে হয় মরণঘুমই ঘুমিয়েছেলম। ম্যাঘ লল্‌পানিতে আর গুড়ুম গুড়ুম ম্যাঘের ডাকে ঘুমটো ভাঙল, খুব ঘন ঘন বিজলি চমকাইছেল আর জানেলা দিয়ে ঘরবাড়ি গাছ পুকুর মাঠ সারা দিনদুনিয়া একবার একবার দেখতে পেচি আবার চোখ বুজছি কিন্তুক থাকতে পারছি না চোখ বুজে। ম্যাঘের ডাকে কানে তালা ধরে যেচে।

কত্তার ঘুম খুব পাতলা। আমি জানি, তার ঘুম ভেঙে গেয়েছে কিন্তুক সি কুনো কথা বললে না। বলবে না জানা কথা! বিজলি লল্‌পাইছে আর ঘরের ভেতরে ছেলেমেয়ের বিছেনা আবছা দেখতে পেচি– আরামে ঘুমুইছে তারা। বড় ছেলে শহরে পড়ে, মেয়েটোও ননদের সাথে থাকে, ই ঘরে শুদু আমার দুই খোঁকা। এর মদ্যে আরো একটি খোঁকা হয়েছে কিছুদিন আগে। উ কথা আর বলি নাই– কি আর বলব– য্যাতোদিন খ্যামতা আছে পেটে ধরব, যিদিন বন্ধ হবে, সিদিন হবে। তাই বলে কি যারা এয়েছে দুনিয়ায়, মায়ের কাছে তাদের

অনাদর হবে? তা লয়। ঐ যে দুই ভাই নিচ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। সব একবার দেখে নিয়ে আমি আবার চোখ বোজলম আর ঠিক তখুনি দড়বড়িয়ে পানি নামল। শুকনো মাটি য্যাতক্ষণ না ভেজে, ফট ফট করে মাটিতে বিষ্টি পড়ার আওয়াজ হয়। বড় বড় ফোঁটায় অ্যাকন তেমনি বিষ্টি হচে। চোখ বুজেই আছি কিন্তুক বিজলি চমকাইলেই চোখে আলো দেখতে পেচি, চোখ বুজে কুনো কাজ হচে না। আর বাজ পড়ার আওয়াজ তো আছেই।

একটু বাদে বুঝতে পারলম মাটি আর শুকনো নাই, বিষ্টির চোটে মাটি আর ফটাস ফটাস করে উঠছে না, পটপট ঝমঝম করে ঘোনো আওয়াজ শুরু হয়েছে। তা ভালো, বিষ্টি হলে তো মাঠের ধানের ক্ষেতি নাই বরং ভালো। জমি কানায় কানায় ভরে থাকুক কি ভেসেই যাক তাতে কুনো ক্ষেতি নাই। ইসব কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে গ্যালম।

ঘুম য্যাকন ভাঙল, ভোরের আলো ত্যাকন খালি ফুটেছে, পুবদিক বোধায় ফরশা হয়েছে, বিছেনায় শুয়ে শুয়েই শুনতে প্যালম একটানা বিষ্টি হয়ে যেচে। অ্যাকন আর ম্যাঘ ডাকাডাকি নাই, লল্‌পানি নাই, বাতাসের সোঁ সোঁ অওয়াজ কিম্বা ঝাপটানি কিছুই নাই। খালি অঝোর বিষ্টির ঝমঝম অওয়াজ। একবার উঠে উঁকি মেরে দেখলম, সারা আসমান আমানির মতুন ম্যাঘে ঢাকা, কোথাও একটু কম-বেশি নাই, ম্যাঘ বলে মনেও হচে না, মনে হচে আসমানের বুঝিন ঐ রঙ। ঘন কালো ম্যাঘে খুব বিষ্টি হয়, মনে হয়, ঐ ম্যাঘে বিষ্টি তো হবেই কিন্তুক এমন ঘোলা ম্যাঘের গোলা দিয়ে লেপা আকাশ থেকে এত বিষ্টি কি করে হচে? তা অবশ্যি লতুন কিছু লয়, চেরকালই দেখে আসছি, আষাঢ়-শেরাবনে ত্যাতো লয়, ভাদর মাসে আকাশ এমনি ভাব ধরলে খুব পানি ঢালে। কুনো কুনো বার ভাদর মাসে বাদল হয়, মাঠ-ঘাট ভেসে যায়, তেমন বাদল দু-তিন দিন কি তার বেশিও থাকে। ইবারেও বোধায় তাই। রাতদোপরে নেমেছে। কম বেশি নাই,

বাতাসের ঝাপটানিতে বিষ্টি ছেঁড়া-খোঁড়া হচে না। লিশ্চয় এত বিষ্টিতে মাঠকে মাঠ ভেসে যেচে। আর খানিকক্ষণ এইরকম চললে ধানগাছ সব পানিতে তলিয়ে যাবে, সারা মাঠ হয়ে যাবে শাদা সমুদ্দুর। তাতেই বা আর ভয় কি? কুনো কুনো বছর এমন হয়। ধান সব তলিয়ে যায়, ডগাটুকুনও দেখা যায় না মনে হয় সব ধান পচে যাবে। তা কিন্তুক হয় না। বাদলা কেটে ভাদর মাসের রোদ উঠলে দু-দিনেই পানি হুড়হুড় করে নেমে যায়। গরম ভাপ হয়ে পানি শুকিয়ে যায়, যেমনকার ধান তেমনি আবার জেগে ওঠে। উ নিয়ে ভাবার কিছু নাই।

আর শুয়ে থাকা যায় না, উঠেই যখন পড়লম কাজকম্ম দেখি গা। য্যাতো বাদল-বর্ষাই হোক, দিন তো বসে থাকবে না। একটু বাদেই ছেলেপিলেরা সব উঠে খেতে চাইবে, জা-রা উঠে কাঠ-কয়লা দিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিজের নিজের কাজে মন দেবে, বাড়ির পুরুষরা বাইরে বেরিয়ে যাবে, বিষ্টি-বাদলা মানবে না। মুনিষ-মাহিন্দাররা বাড়ির এটো-ওটো কাজ করবে– হাঁস-মুরগিতে বাড়ি ঘিনঘিন করবে– দিন এমনি করে শুরু হবে, এমনি করেই শ্যাষ হবে। ইয়ার অন্যাথা নাই। আমি হেঁশেলের পাশে রাঁধা-বাড়ার চালাটোয় যেয়ে চুলো ধরাইতে গ্যালম। এই সোমায়টোয় জ্বালটের খুব অভাব– অত শুকনো কাঠ কোথা? ডালপালা কাঠিখোঁচা আর খ্যাড় দিয়েই কাজ চালাতে হয়। গরু-মোষের খাবারে টান পড়ে, খ্যাড় পোড়াইলে মুনিষ-মাহিন্দাররা আবার রাগ করে। আবার কয়লাও গরমিল– এইসব কথা ভাবতে ভাবতে চুলোর কাছে যেয়ে দেখি ডালপালা সব ভিজে, চুলোয় রেতের আগুন শুদু যি নিভে গেয়েছে তা লয়, চুলোর ভেতরে পানি জমে গেয়েছে। কি করে জ্বালাই চুলো?

তা দিন পড়ে থাকে নাই। আগুন ঠিকই জোগাড় হলো, যাহোক রাঁধা-বাড়া হলো, দিনের কাজে সবই হলো। ভাবনা করার কিছু হয় নাই। কিন্তু তার পরে বিষ্টি যি একবারের তরে থামল না।

আজ পাঁচ দিন বাদল নেমেছে, একবার থামাথামি নাই। হয় বটে বিষ্টি, তাই বলে অত? দ্যাওরদের কাছে খবর পেয়েছি যি মাঠ ডুবে গেয়েছে পরশুদিনই। অত পানি কি মাঠ রাখতে পারে? সব ভরা, অত পানি নেমে যাবে কোথা? সারা মাঠে ধান আর দেখাই যেচে না, সব ডুবে গেয়েছে। আগে আগে হলে বলতম দু-দিন বাদে পানি নেমে গেলেই মাঠ আবার সবুজ হবে। তাই বলে টানা ছ-দিন যেদি ধান পানির তলায় থাকে তাইলে কি সেই ধান বাঁচবে? আজ পাঁচ দিন তো হয়েই গেল।

ইদিকে দিন গুজরান তো অসোম্ভাব হয়ে যেচে। কাল পয্যন্ত কুনোরকমে রাঁধাবাড়া হয়েছে। যেমন করে হোক ছেলেপুলে, বাড়ির পুরুষমানুষ, মুনিষ-মাহিন্দারদের মুখে ডাল-ভাত জোটানো গেয়েছে। আজ কি হবে? গিন্নি আঁদার ঘরে নিথর শুয়ে আছে, ননদ হয়তো আমারই মতুন তার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কাকে কি শুদুব? কোথা কি আছে আমিই সব জানি! হেঁশেলে বড়ো পয়ায় চাল আছে, ডালও আছে য্যাথেষ্ট, টিনে মুড়িও আছে। চুলোটো যেদি জ্বালাতে পারি তাইলে চালে-ডালে এক পাতিল খেচুড়ি রেঁধে দিলে বাড়ির সবাই খেতে পারবে। কিন্তুক চুলো জ্বালাইতে কি পারব? এক ফোঁটা কেরাসিন নাই, কয়লাও নাই। কটো ভিজে ঘসি আর বাবলাগাছের ডালপালা পড়ে আছে। গুণে গুণে দ্যাখলম ট্যানাকাঠির বাক্‌সোয় মোটে তিনটো কাঠি পড়ে আছে। ডালপালা গুছিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে বসে একটো কাঠি বারুদের গায়ে টানলম। কিছুই হলো না। বারুদ ভিজে জবজব করচে। বাক্‌সোর গায়ে আর একবার কাঠিটো জোরে টানতেই খশ্ করে কাঠির মাথার বারুদটো খসে গেল। কি হবে? কি করে আগুন জ্বালাব? কে এট্টু আগুন দেবে? পরের কাঠিটো খুব জোরে টানতে গ্যালম, যাঃ, কাঠিটোই ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। আর মোটে একটি কাঠি আছে। এটিও যেদি না জ্বলে!

কোথাও আগুন নাই, সারা গাঁ ভিজে চবচব, কুনো বাড়িতে আগুন

নাই, কারুরি চুলো জ্বলছে না। কারু ঘরে খাবার নাই। ভয়ে আমার হাত-পা প্যাটের ভেতর সেঁদিয়ে যেচে। এই যে, এই শ্যাষ কাঠিটোর বারুদও খসে গেল। ত্যাকন আমার কাঁদন এল। কোথা আমি আগুন পাই? মুনিষদের কাছে চকমকি পাথর আছে, হয়তো তারা কষ্ট করে আগুন জ্বালাইতে পারবে। কিন্তুক অ্যাকন তারা কোথা?

কতক্ষণ থেকে গালে হাত দিয়ে বসে আছি। কি যে ভাবছি আর কি যে দেখছি কে জানে? পানি হওয়া বটে? অ্যাকন মনে হচে এত বিষ্টি জেবনে দেখি নাই। পাঁচ দিন পাঁচ রাত থির বিষ্টি হয়ে যেচে! আসমানের সেই এক আমানির মতুন রঙ— কম-বেশি নাই। একবার যেন কতো দূরে, অ্যানেক দূরে, গুড়গুড় করে আওয়াজ উঠল। বিষ্টি আর একটু ঘন হলো। বাড়ির পুব-উত্তর দিকের মাটির পাঁচিরের খ্যাড়ের ছাউনি পচে গলে গেয়েছে, এইবার মাটিই গলছে। দু-তিন হাত পাঁচির এর মদ্যেই গলে গেয়েছে। পাঁচিরের ওপর দিয়ে দেখতে পেচি খিড়কির পুকুরটো ভেসে চারদিক দিয়ে পানি উপচিয়ে পড়ছে। এইবার বাড়িতেও পানি ঢুকবে। ঐদিকে সবকটো পুকুর একটো পুকুর হয়ে গেয়েছে। পুকুরগুনোর সাথে মাঠ এক লাগোটা হয়ে গেয়েছে। সব একদম শাদা। বসে বসে দেখছি, বাড়িরই চারপাশের পাঁচির অ্যাকন গলে গলে পড়ছে, বাড়ি ইবার বে-আব্রু হয়ে পড়বে। তাপর হয়তো মাটির ঘরগুনো দুদ্দাড় করে পড়ে যাবে। ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

বিষ্টি এইবার আরও ঘন হয়ে এল। এখন চোখের দিষ্টি বেশি দূর যেচে না। পাঁচ হাত দূরের জিনিশটো যি কি তা ঠিক বোঝা যেচে না। বাড়িতে কতো জিনিশই তো ইদিক-উদিক ছড়ানো থাকে, খেয়ালও হয় না। অ্যাকন বসে বসে ভাবছি ওটো কি জিনিশ, ওটো একটো ঝুড়ি, ঐটো কি, একটা কালো ভাঙা হাঁড়ি, আতাগাছের তলায় ওটো কি তেঁতুলগাছের শক্ত গুঁড়িটো? এই করতে করতে যেখানে কিছুই নাই, সেখানেও অ্যানেক জিনিশ দেখতে প্যালম। সি সবই যেন

পানি দিয়ে তৈরি। তৈরি হয়েই আবার ভেঙে বেচে। একবার যেন মনে হলো খিড়কি-পুকুরের কোণের বাড়ি থেকে পানি দিয়ে তৈরি একটো মেয়ে বেরিয়ে এল। পানির ভেতর দিয়ে ছপ ছপ করে হাঁটছে। আমাদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তুক সে বাড়ির ভেতরে ঢুকল কিনা বুঝতে পারলম না। খালি ঝমঝম করে পানি হচে, সেই আওয়াজই শুনতে প্যালম। একটু বাদে ফের দ্যাখলম কে যেন হেঁশেল থেকে বেরিয়ে যেচে। না, ইবার আর বেভ্রম লয়। অবশ্যি এত পানি হচে যি মনে হচে আমার চারদিকে শাদা চাদর টাঙানো, তার আড়ালে সব ঢাকা পড়েছে। তবু ঠিক দেখলম একটো মানুষ হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এসে এগ্‌নেয় নামার আগে উসারার খুঁটির কাছে এসে দাঁড়াইলে। তাপর যেমন সে পা বাড়িয়েছে এগ্‌নেয় নামবে বলে, আমি অমনি ঐ মাহা বিষ্টির মদ্যে ভিজে শুঁটিয়ে যেয়ে তাকে ধরলম।

হ্যাঁ, খিড়কির কোণের বাড়ির আক্‌লিই বটে। বিয়ে হয় নাই, এক বুড়ি দাদি ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কেউ নাই তার। ভেজা জবজবে মোটা একটো চট বুক থেকে পা পয্যন্ত ডান হাত দিয়ে ধরে আছে। খেতে পায় না, তবু এত বড় বড় দুটো বুক ক্যানে যি তার, কি কাজে লাগবে আল্লা জানে! অমন করে চটটো হাত দিয়ে ধরে আছে মেয়েমানুষের শরম বাঁচাইতে কিন্তুক তবু ঢাকা পড়ে নাই ঐ পব্বতের মতুন বুক। বাঁ হাতে মাটির শানকি-ভরা বাসি ভাত, তার আদ্দেক গলা। এক শানকি ভাত। হেঁশেলে ভাতের হাঁড়িতে গত রেতের পানি দেওয়া ভাত যা ছিল তা বোধায় সবটাই নিয়েছে শানকি ভরে।

আমরা দুজনা মুখোমুখি তাকিয়ে থাকলম। উঃ, মেয়ের দু-চোখের জমিন কি শাদা! ধলিবগের পালকের মতুন ধবধবে শাদা। বোঝাই যেচে চট দিয়ে শুদু শরীলের ছামনেটাই ঢেকেছে সে, ঘাড়-পিঠ-পাছা-কোমর উদোম। অ্যানেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলম। একটি কথা বলতে পারলম না। দুনিয়ায় অ্যাকন খালি সকাল হয়েছে। সারাদিন বাকি, অ্যানেক বাকি, অ্যানেক বাকি। বুকের ধুকপুকুনি কিছুতেই থামে

না। কতক্ষণ বাদে আক্‌লি ফিসফিস করে বললে, তিনদিন তিনরাত কিছুই খাই নাই, দাদি ঘরেই আছে, বোধায় আজ মরতে পারে। আমি শুদু কোনোরকমে বললম, দাঁড়া। এই কথা বলে হেঁশেলে ঢুকে কি এক ভায়ানক রাগে একটো মাটির হাঁড়িতে থাবা থাবা চাল তুলে একদম ভত্তি করে উসারায় বেরিয়ে অ্যালম।

শানকি হাঁড়ির মুখে ঢাকা দে। চালটো ভেজাস না। যা–

কুনো কথা না বলে আক্‌লি পানিতে নামল। অ্যাকন আর চট দিয়ে কি হবে, মেয়েমানুষের গোটাটোই অ্যাকন উদোম! তা কি হবে, যে খুশি দেখুক। সে নেমে গেলে আমি পেছন থেকে বললম, তোদের চুলোয় আগুন আছে? থাকলে আমাদের একটু দিস। ক্যানে যে ইকথা বললম কে জানে। বলতে মন হলো তা-ই বললম।

তার পরদিন থেকে হাওয়া বইতে লাগল। এই কদিন একনাগাড়ে খালি বিষ্টি হয়েছে। একফোঁটা বাতাস ছিল না। আজ সকাল থেকে হাওয়া অরম্ব হলো। সকালবেলায় ভাবছি আজও যেদি অমনি করে করে বিষ্টি হয়, তাইলে দুনিয়া আর থাকবে না। ঘর-দুয়োর সব গলে মুছে যাবে। মিছে ভাবছি না, গতকাল বৈকালবেলায় মল্লিকদের একটো ঘর আমার চোখের ছামনেই ভেঙে পড়ল। আমাদের এই বাড়ি থেকে ঐ ঘরটো দেখা যেত না, বাড়ির পাঁচিরের আড়াল হতো। সকালবেলায় সেই সীমেনা-পাঁচির ভেঙে পড়েছে বলে মল্লিকদের গোটা বাড়ি দেখতে পাওয়া যেছিল। পড়ন্তবেলায় ঐ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সোমায় উদের বড়ো ঘরটোর একটো দেয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে মাটিসই হয়ে গেল। সাথে সাথে সারা বাড়িটো এমন আনকা লাগল যেন আগে কুনোদিন বাড়িটোই দেখি নাই। ভাঙা ঘরের ভেতর থেকে একঘর আঁদার আর একটো খারাপ গন্দঅয়লা ভাপ এসে আমার নাকে লাগল আর মানুষ হঠাৎ ন্যাংটো হয়ে গেলে যেমন লাগে ঘরটোকেও তেমনি একদম ন্যাংটো মনে হলো। ঘরের ভেতর যা যা আছে সব দেখতে পাওয়া যেচে যি! যা মানুষ দেখায় না, লুকিয়ে রাখে, সি-সব

দেখা যেচে! ভাঙা ফুটো পচা সব জিনিস। জানে ধরে উসব জিনিস ফেলে দিতে পারে নাই।

সকালে যি হাওয়া বইতে শুরু হয়েছিল, তার জোর কের্‌মে কের্‌মে বাড়ছে দেখছি। কুন্‌দিকের হাওয়া কিছুই বোঝলম না। শুদু দেখলম, অমন সোজা-চাদর ঝুলনো বিষ্টি একদিকে হেলে রয়েছে। তাপর হঠাৎ এমন একটো বিষ্টির ছাঁট এসে আমার চোখে-মুখে লাগল যি আমি কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লম, পরনের কাপড় সাথে সাথে ভিজে চুবচুবে হয়ে গেল। ই আবার কেমন বাতাস ভাবছি আর ত্যাকুনি আর একটো ঝাপট এসে লাগল। আগেরটোর চাইতে জোর বেশি এটোর।

এই অরম্ব হয়ে গেল! হাওয়া মাতালের মতুন করতে লাগল, কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই, একবার ইদিক থেকে তো আর একবার উদিক থেকে। তাপর দেখি, উত্তর-দখিন-পুব-পচ্চিম হাওয়ার গতিক কিছুই ঠিক নাই। আর সি কি জোর আর শোঁ শোঁ আওয়াজ! গদগদিয়ে আজ টানা ছ-দিন ধরে যি বিষ্টি হচে, সেই বিষ্টি অ্যাকন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেচে, গায়ে এসে সুঁইয়ের মতুন বিঁধছে। কখনো দেখছি এলোমেলো হাওয়ার চোটে ধুমোর মতুন উড়ে যেচে। গত কদিন ধরে গাঁয়ের সব মাটির বাড়ি খালি বিষ্টিতে ভিজেছে, এইবার এই হাওয়ায় আর একটোও খাড়া থাকতে পারবে না, সব মাটিতে মিশে যাবে। মল্লিকদের ন্যাংটো বাড়িটো কাল একবার দেখেছি, এইবার গোটা গাঁ-টো ন্যাংটো হবে। খোলা আসমানের তলায় থাকবে সারা গাঁয়ের মানুষ, ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সব। ত্যাকন মওত আসতে দেরি হলেই রাগ লাগবে!

আমি একা বসে আছি, আশেপাশে কেউ নাই, ছেলেপুলেদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ নাই। বাড়িতে কেউ এখনো ওঠেই নাই। কদিন থেকে শুদু আমিই রাত থাকতে বিছেনা ছেড়ে উঠছি আর একা একা এখানে এসে বসে থাকছি, মনে হচে দুনিয়া শ্যাষ হবে। ত্যাকন মনে হতে লাগল আমার ই দুনিয়ায় আর কেউ নাই, এইবার দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।

এই কদিন কেউ সুয্যির মুখ দেখতে পায় নাই, সকাল-দোপর-বৈকাল কখন আসছে কখন যেচে কারুর বোঝার উপয় নাই। ছেলেপুলের মুখ শুকনো, কেউ একটি কথা বলছে না, যা জুটছে তা-ই খেচে; কুনো হুজ্জোতি নাই। বড়রা আর কি করবে? বুকের সাথে হেঁটো লাগিয়ে সব টিপ টিপ বসে আসমানের দিকে চেয়ে আছে।

দোপরের দিকে মনে হলো বিষ্টিটো কমে আসছে আর বাতাসটো বাড়ছে। বাতাসের য্যাতো জোর বাড়ছে ত্যাতো সি মাথাপাগলের মতুন করছে। বিষ্টিকে তাড়িয়ে একবার ইদিকে নিয়ে যেচে, একবার উদিকে নিয়ে যেচে। এই করতে করতে শ্যাষে বিষ্টিটো একদম থামল, অ্যাকন খালি বাতাস। হোক বাতাস, বিষ্টিটো তো থামল! এই ছ-দিন ছ-রাত বোধায় একবারও থামে নাই। গাঁয়ের সব পুকুর ডোবা, নামো জায়গা পানিতে ভরা ; রাস্তায় একহাঁটু করে পানি। আর একদিন অমনি বিষ্টি হলে এই শুকনো দ্যাশের লোক তো সব ডুবেই মরে যেত। যাক বাবা বিষ্টিটো তো থামল। বাতাস আর কতোক্ষণ থাকবে, সাঁঝ আসতে না আসতেই ওর জোর চলে যাবে। ননদ বললে, নোহ্ আলাইহি সাল্লামের সোমায় একবার পেরায় কেয়ামত হয়েছিল, জাহাজে যারা জায়গা পেয়েছিল শুদু তারাই বেঁচেছিল, ইবারের যা বেপার তাতে এই পৃথিবীর জাহাজে কেউ বাঁচবে না গো! দ্যাওররা বললে, বিশেষ যি দ্যাওর চাষবাস নিয়ে থাকে, আসমান-জমিনের খবর রাখে, সে বললে, এমন অসময়ে এত পানি কুনোদিন দেখি নাই– এদিকে সব মাটির বাড়ি, দুদ্দাড় পড়ছে, বৈকালের মধ্যে গাঁয়ের আদ্দেক বাড়ি পড়ে যাবে। এ তল্লাটের সব গাঁয়েই এরকম হবে। তা নিয়ে আমি ভাবছি না। ভাবছি, ধান তো সব তলিয়ে গিয়েছে। ফুলনো ধান, শীষ খালি আসতে লেগেছে, এই অবস্থায় ধান চার-পাঁচ দিন পানির তলায়! ও কি আর আছে? পচে-হেজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সব ধান। নতুন করে আর রোয়ারও কুনো কথা নাই। কি ভায়ানক

মাগন যে লাগবে তাই ভাবছি।

বাতাসের জোর বাড়তেই লাগল। সাঁঝ লাগতে লাগতে শোনলম গাঁয়ের আরও অ্যানেক বাড়ি পড়ে গেয়েছে। লোকের দুদ্দশার শ্যাষ নাই, অ্যানেক বাড়িতে রাঁধা-খাওয়া বন্ধ। চাল-চুলো, কাঠ-খ্যাড়, আটা-চাল কিছুই নাই! আমাদের বাড়ির লোক সব বাড়িতেই রয়েছে। কত্তাও বাড়িতে, তা সে তো আর বাড়ির ভেতরে আসবে না, পরচালিতে লোহার চেয়ারে ঠেসান দিয়ে চুপ করে বসে আছে। তার কোট-কাছারি নাই, ভোটে হেরে গেয়েছে, হিঁদুপাড়ার গিরে দাঁয়ের কাছে। কত্তার ঘাড়ের কোঁকড়ানো চুল অ্যাকন চাঁছা। কথা খুব কম বলে।

সাঁঝবেলায় আবার বাড়িতে কেউ নাই। সব নিজের নিজের জায়গায়। আমি আর ননদ বসে আছি। কুনোমতে একটো পিদিম জ্বালিয়ে গিন্নির ঘরে দিয়ে এয়েছি। বিছেনায় গিন্নি মরার মতুন পড়ে আছে। শ্বাস বইছে, না, বন্ধ হয়ে গেয়েছে বুঝতে পারা যায় না। কথা বলতে পারলেও গিন্নি আজকাল কথা একদম বলে না। আমরা ঘরের ভিজে উসারায় বসে বসে সাঁঝ নামতে দেখছি। চারপাশের সব গাছের মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। বাড়ির মিশমিশে কালো লম্বা তালগাছদুটো এমন করে দুলছে যেন আকাশপেমান দুই লম্বা ভূত মাথা ঝাঁকিয়ে নাচছে। পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের ডালপালার আঁদারের ভেতর থেকে কালো কি একটা ঝাঁক উড়ে আসছে দেখলম। কালো ফুটি ফুটি এক ঝাঁক পোকা। কাছে আসতে দেখি, ওমা পোকা নয়, এক ঝাঁক বাদুড়। এত বাদুড় একসাথে কুনোদিন দেখি নাই। আমার গা ছমছম করে উঠল।

সেই রেতে দুই ছেলে নিয়ে আঁদার ঘরে শুয়ে আছি। কত্তার এতদিনের অব্যেস আলো থাকতে হবে, তবু আলো জ্বালাতে পারি নাই ঘরে। আঁদার ঘরে দুই ছেলের নিশ্বেসের আওয়াজ পাওয়া যেচে। বড়টো কাছে নাই, মেয়েটো বড় হয়েছে, সে ছোটবেলা থেকেই

আমার কাছে থাকে না, থাকে ননদের কাছে।

মাটিতে বিছেনা পেতে একটু দূরে চাদর দিয়ে গা-মাথা ঢেকে কত্তা শুয়ে আছে ঠিক মরা মানুষের মতুন। আমি জানি একটি কথা বলবে না, ঐ মানুষ ঠিক যেন পাথরের মুত্তি। শুয়ে শুয়ে শুদু বাতাসের আওয়াজ শুনতে লাগলম। হু হু করে একটানা বয়ে যাওয়া বাতাস তো লয়, সি তো অ্যানেক শুনেছি– ই বাতাস যেন মদ খেয়ে এয়েছে, আসছে যেন আর একটো দুনিয়া থেকে। সিখানে আটকানো ছিল, অ্যাকন ছাড়া পেয়ে খালি আসছে, আসছে, আসার রাস্তার কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই, মাঠ-ঘাট ভেঙে আসছেই। কতোরকম শব্দ যি হচে তার শ্যাষ নাই– বড় গাছের ডাল ভাঙার শব্দ, টিনের চালের ক্যাঁ-কোঁ করে কাঁদনের আওয়াজ– সব আছে। শুদু কুনো জ্যান্ত পেরানির আওয়াজ নাই।

য্যাতো রাত গড়িয়ে ভোরের দিকে যেচে, আওয়াজ-ও যেন ত্যাতোই বাড়ছে। তবে কি এইবার ঝড় অরম্ব হবে? এমন লাগছে ক্যানে? একবার কি উঠে বাইরে যেয়ে আকাশটো দেখব? চোখে ঘুম তো এক ফোঁটাও নাই। বাইরে যাব বলে বিছেনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, ঠিক যেন পাথরের মুত্তির মতুন কত্তা কথা কয়ে উঠল, বাইরে যেয়ো না। এই কথাকটি বলে পাথর যেমন পাথর ছিল তেমনিই পাথর হয়ে গেল। চুপ করে আবার শুয়ে পড়লম।

ভোরবেলা থেকে শুনতে প্যালম আর-এক রকম আওয়াজ। সি বাতাসের আওয়াজ লয়, ম্যাঘ ডাকার আওয়াজও লয়। কেমন এক হড়াম হড়াম দুরদুর হড়হড় আওয়াজ। অ্যানেকক্ষণ ধরে এইরকম শুনছি আর ভাবছি ই কি ভুঁইকম্পের আওয়াজ, না আর কিছু? কাছে লয়, অ্যানেক দূর থেকে আসছে, একবার মনে হচে মাটির তলা থেকে, একবার মনে হচে আসমান থেকে। বাতাসই বোধায় তাকে ইদিক-উদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যেচে। খানিকক্ষণ ধরে শুনতে শুনতে আমার মাথাটোও যেন বিগড়ে গেল– কার ঘর, কার বাড়ি, কে ছেলে, কে

মেয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না। এমন সোমায় পাথরের মুত্তি আর একবার কথা বলে উঠল, জোলের মাঠ থেকে পানি নেমে যাচ্ছে।

আঁদার আঁদার ঘরে চাদর-ঢাকা মানুষটো থির হয়ে শুয়ে আছে। মোটা চাদরের তলা থেকে কথা বলে উঠল এমন করে যি আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তা হবে, পানি নেমে যাবার আওয়াজই বটে। আমার মনে হতে লাগল, কুন্ দুনিয়া থেকে দানোরা এসে পানির রাজত্বে দাপিয়ে বেড়াইছে, হটর হটর করে হাঁটছে, ঢাক বাজানোর মতুন বুক চাপড়াইছে। আওয়াজ শুনি আর কেঁপে কেঁপে উঠি। ইদিকের এইসব তেপান্তরের মাঠ আর সেই সব মাঠভরা পানি। পানির সমুদ্দুর, কুনোদিকে কূলকিনারা নাই। আসমানের সব পানি দুনিয়ায় ঢালা হয়ে গেয়েছে, অ্যাকন এত পানি নেমে কোথা যাবে? কোথা জায়গা হবে? বাতাসও বাড়ছে, পানিকে সি-ও থির থাকতে দেবে না, মাঠ থেকে চেঁছেপুছে ঠেলে নদীতে ফেলবে।

সাত দিন বাদে, আজ সকালে দেখলম সারা আকাশ ধোয়া তকতক করছে। মনে হচে কোথাও একটুকুনি ধুলো-বালি নাই। সাত দিনের কালো ময়লা আকাশ অ্যাকন নামোয় এসে দুনিয়াটোকেই কালো ময়লা চিটচিটে করে দিয়েছে। অ্যাকন এই দুনিয়া সাফ হবে কি করে? কোথাও একটুও শুকনো জায়গা নাই, সারা গাঁয়ে একহাঁটু করে কাদা, ঘরদুয়োরের মাটি ভেজা, ঘরের মেঝে ভিজে স্যাঁতসেঁতে। ঠান্ডায়, জোর হাওয়ায় কাঁপুনি লেগে যেচে।

সকাল থেকে কাজকম্মে আছি– যখুনি একটু হাত খালি হয়, একটু একা হই, তখুনি শুনতে পাই হড় হড়, হুড় হুড় আওয়াজ। পানি নামছেই, নামছেই। আঁদার ভোররেতে য্যাতো ভয় লেগেছিল, অ্যাকন আর ওরকম লাগছে না। খালি মনে হচে, এই আওয়াজ আর সইতে পারছি না। পানির ভারে দুনিয়া হাঁসফাঁস করছে, নিশ্বেস নিতে পারছে না। মনে হচে আমিও নিশ্বেস নিতে পারছি না। কবে আবার দুনিয়ার ভালো শ্বাস হবে, থির হবে পিথিমি, অ্যাকন কোথাও কুনো পাখি

দেখছি না, কবে আবার পাখ-পাখালি ফিরে আসবে, এই ভায়ানক হাওয়াটো থামবে, অমন করে হাওয়া মাথাপাগলের মতুন করবে না?

বিষ্টিটো থেমেছে বটে, রোদও উঠেছে কিন্তুক হাওয়ার জোর থামল না। সব পানি না সরিয়ে সে থামবে না। গাঁয়ের পুবদিকের ঢালু দিয়ে পানি নেমে যেচে। ইদিকের মাঠ-ঘাট সব পুব-উত্তরে কাত। সিদিকে সব বড় বড় নদী আছে। বাতাস পানিকে তাড়িয়ে সিদিকেই নিয়ে যেচে।

তিন দিন পরে, দশ দিনের মাথায় এই কেয়ামত শ্যাষ হলো। বিষ্টি গেল, হাওয়া গেল, আসমান আবার নীলবন্ন হলো, সোনাবন্ন রোদ হলো– সব হলো! সেজ দ্যাওর, ল-দ্যাওর যারা চাষবাস নিয়ে থাকে, তারা দুজনে একদিন বাড়ি এসে কপাল চাপড়ে বললে, মাঠে কিছু নাই, কিছু নাই, একটি দানা মিলবে না কারুর।

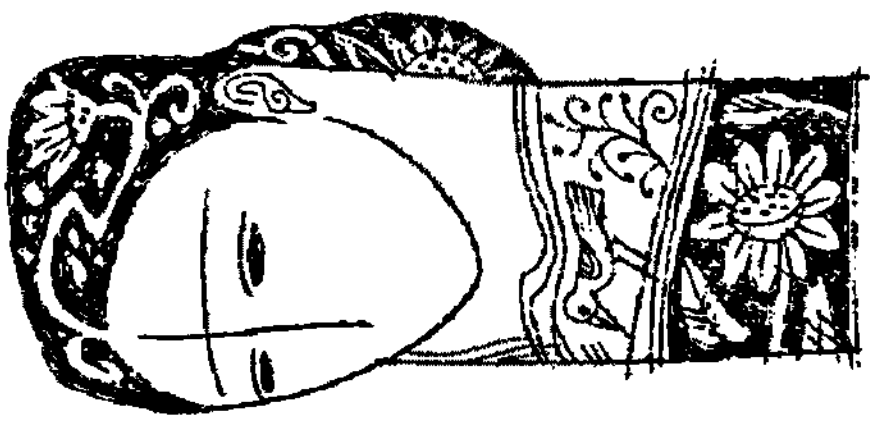

দুনিয়ায় আর থাকা লয়, গিন্নি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল

ল-দ্যাওর সব কথা বেশ ভালো করে বলতে পারে। দশ দিনের বাদল-ঝড়-হাওয়া থেমে গেলে মাঠ দেখে এসে সে বলেছিল, সারামাঠে একটি দানা ফলবে না, একটি ধানের শীষও টিকবে না। তার কথাই সত্যি হলো। আজ ননদকে সাক্ষী রেখে সে বললে, মাঠের সব পানি নেমে গেলে মাঠ দেখে বলেছেলম না যি, ইবার আর মাঠে আমন ধানের কোনো গন্ধ নাই, এক কাঠা ধানও কেউ পাবে না? বলি নাই? জমির কাছে গেলেই আমরা বুঝতে পারি, তাতে নিশ্বেস আছে, না

নাই! জমির অসুখ-বিসুখ আছে, নিশ্বেসের কম-বেশি আছে, মরতে মরতে মরে পাথর হয়ে যাওয়া আছে– জমি যে না চেনে, সে কি তা বুঝতে পারবে? তখুনি বুঝেছেলম আমরা, মাঠকে মাঠ একদম কালা ঠান্ডা। কালো কাদা বার করা জমি। তার ওপরে সরু সরু বগরোঁয়ার মতুন সব ধানের চারা যা আছে, দু-দিন বাদেই শুকিয়ে যাবে।

পর পর দুই সন তাইলে ফসল মারা গেল। গতবার হয়েছিল খরানি আর ইবার ঝড়-বাদল। অ্যাকন দুনিয়ার দিকে তাকাইলে তা কি বোঝবার বাগ আছে? কোথা বাদল, কোথা সেই অঝোর পানি, কোথা সেই ইবলিশি হাওয়া আর কোথাই বা সেই পাষাণের মতুন আসমান। অ্যাকন ধান পাকার সোমায়, সোনা-মাখানো ধান। আসমান ভরা রোদ হবে, জানভরা ঠান্ডা হি হি বাতাস হবে, তা সবই হয়েছে, সবই হবে, শুদু মাঠে একদানা ধান নাই। ছিল যুদ্ধু, তাতেই লোক মরতে শুরু করেছিল, গাঁয়ের আদ্দেকের বেশি মানুষ অ্যাকন ন্যাংটো থাকছে, দিনের বেলায় বেরুইতে পারছে না। যারা বেরুইচে, ভাগ্যিস তাদের শরম নাই– বুড়ো-বুড়ি, রোগে-শোকে মরা মানুষ– তাদের ইজ্জত থাকল, না থাকল না, কে সি কথা ভাবছে? কিছুই নাই, কিছুই নাই! যুদ্ধুতেই এই! এবার যোগ হলো আকাল। দু-বছর ধরে জমানো ধান খেয়ে খেয়ে অ্যাকন আমাদের বাকি আছে পুরনো ধানের আর মাত্তর একটি মরাই। এতে আর ক-দিন চলবে?

কত্তা কতোদিন আর বাড়ির ভেতরে আসে না। কোর্ট-কাচারি, আমলা-ফয়লা অ্যাকন আর কেউ নাই, পেয়াদা-দফাদাররাও নাই। পালকিটো পড়ে আছে, রং চটে গেয়েছে। কাঠ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, ঘোড়া একটো আছে বটে এখনো। ঘোড়ায় চেপে কত্তা কতোদিন কোথাও যায় না!

সেই কত্তা হঠাৎ একদিন আগের মতুন হৈ হৈ করে কথা বলতে বলতে বুনের নাম ধরে ডেকে বাড়িতে এসে ঢুকল। বাড়ির

মাহিন্দারটোর মাথায় বেরাট একঝুরি ভত্তি ফল। সোজা উত্তর-দুয়োরি যে ঘরে গিন্নি শুয়ে আছে, সেই ঘরে ঢুকে মাহিন্দার ছোঁড়াটোকে ঝুরি নামাইতে বললে। শীতকালের দিন, সব ফলমূল অ্যাকন পাওয়া যায় সত্যি! তাই বলে এতরকম ক্যানে? সব পচে লষ্ট হবে। আপেল নাশপাতি বেদানা কমলা আঙুর কিসমিস খেজুর ইসব তো আছেই, আরও কতোরকম আছে আমরা তার নাম জানি না। গিন্নির মাথার কাছে বসে তার একটি শুক্‌নো হাত তুলে নিয়ে কত্তা বললে, মা, অনেকদিন আসি নাই তোমার কাছে, একবার আমার কথা শোনো। গিন্নি চোখ মুজে ছিল, তেমনি মুজেই থাকল। শুনতে পেলে কিনা, ঘুমিয়ে আছে কিনা বুঝতে পারা গেল না। এই কিছুদিন আগে পয্যন্তও গিন্নির জেগে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা আলেদা আলেদা ছিল। জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে– পষ্ট বুঝতে পারা যেত। জেগে থাকত য্যাকন, টক টক করে চেয়ে থাকত; ঘুমুইলে সমানে ঘুমুইত। এই কদিন হলো সব সোমায় চোখ মুজে থাকছে যেন চেয়ে থাকবার খ্যামতা নাই, চোখের পাতা বুজে বুজে যেচে। কত্তা আরও কবার মা মা করে ডাকলে কিন্তুক গিন্নি চোখের পাতা মেলতে পারলে না। জাগা আর ঘুমুনো তার কাছে একাকার হয়ে গেয়েছে।

সারা ঘরে রুগির গন্ধ। সি গন্ধ এমনিই যি ঘরে ঢুকলেই বমি আসে। পেশাব-পায়খানা এখনো আমিই পরিষ্কার করি আর কাউকে করতে দিই না। কিন্তুক য্যাতোই করি গন্ধ হবেই। আজ ছ-মাসেরও বেশি হলো গিন্নি শুয়ে আছে ঘরের মুদুনির দিকে চেয়ে চেয়ে। কোমরে পিঠে দগদগে ঘা হয়ে গেয়েছে। এত ধুইয়ে দি, ওষুধ দি, ঘা দিন দিন বেড়েই যেচে। গিন্নি মাঝে মাঝে তাকায় আমার দিকে– কি যি আছে সেই চাউনিতে, কেউ বলতে পারবে না। একবার একবার মনে হয় বৈকি আর কতো দিন! মনে হয়, আর নিজেই শরমে মরে যাই। কত্তা আবার ডাকলে, মা, শোনো। বহু কষ্টে গিন্নি চোখ মেললে, মনে হলো এইবার বোধায় কত্তাকে সেই কথাটো বলবে, যি কথা আমাকে

অ্যানেকদিন বলেছে। সি কথাটি এই, দুনিয়ায় বেঁচে থাকার লিয়ম আছে, তার বেশি বাঁচতে নাই। আগের দুনিয়া আছে, পরের দুনিয়াও আছে। সব দুনিয়া সবার জন্যে লয়। ভাবলম, এইকথাই বোধায় বলবে কত্তাকে। কিন্তুক গিন্নির ঠোঁটদুটি টিপে আটকানো, শুদু চোখদুটি মেলে কত্তার দিকে চেয়ে আছে। কত্তা আবার বললে, মা শোনো, বাজারে যতো ফলমূল পাওয়া যায়, একটা একটা করে সব এনেছি। আর তো কিছু খেতে পারো না তুমি! তবু তোমার জন্যে নয়, এনেছি আমার জন্যে, আর হয়তো কোনোদিন সুযোগ পাবো না। মা, শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে, আমার সামনে একটু কিছু খাও। এই বলে কত্তা গিন্নির শুক্‌নো হাতটি আর একটু নিজের দিকে টানতে গেল। ত্যাকন দেখলম, হাতটো কেমন সরতে লাগল, সরতে সরতে কত্তার হাত থেকে খসে পড়ে তার কোলে এসে পড়ল, তাপর কোল থেকে আস্তে করে মেঝেতে পড়ল। গিন্নির চোখদুটি ত্যাকনো তেমনি করে চেয়ে আছে।

একটু বাদেই কত্তা বুঝলে তার মা আর নাই।

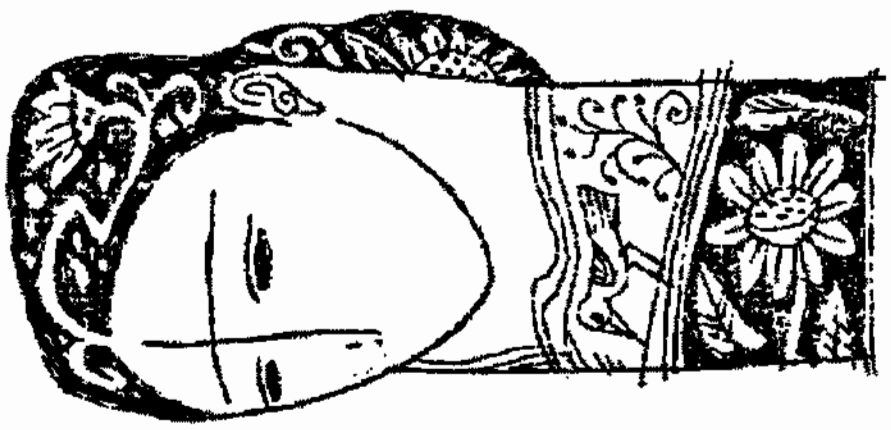

সোংসার তাসের ঘর, তুমি রাখতে চাইলেই বা কি

দুটি বছর পেরুল। এই দুটি বছর যি কেমন করে গেল সি শুদু আমিই জানি এমন কথা বলতে পারব না। দুনিয়া জাহানে যারা আজও বেঁচে আছে, না খেয়ে শুকিয়ে মরে নাই, রোগে ভুগে মরে নাই, রাস্তায় হুঁটুরে পড়ে মরে নাই— কুনো পেকারে শুদু বেঁচে আছে, তারাই তা হাড়ে হাড়ে জানে। একটি একটি করে দিন আর যেন কাটে নাই,

রোজ-কেয়ামতের লেগে অপিক্ষেও এর চাইতে ভালো।

গাঁয়ে লোক অ্যাকন অ্যানেক পাতলা। মরার ছিল যারা,– অ্যানেক খুনখুনে বুড়ো, এমনিতেই দু-দিন বাদে যারা মরবে, তাপর যারা রোগে ভুগছিল, ওষুধ-পানি তো দূরের কথা, একমুঠো খুদও জোটে নাই, তারা আর দেরি করে নাই। বিছেনায় সেই যি শুয়েছে, আর ওঠে নাই। কাউকে কিছু বলে নাই, ওষুধ চায় নাই, ভাত চায় নাই, একবার কাছে বসবার লেগে বউ-ছেলে-মেয়ে কাউকে ডাকে নাই, বোধায় জাকামদানির সোমায়েও এতটুকুন শব্দ করে নাই। হিঁদু হলে, মনে হয়, ভাই বন্ধু ছেলের কাঁধে চেপে পাঁচ কোশ দূরে ভাগীরথী নদীর পাড়ে শ্মশানে যেয়ে পোড়বার আশাও করে নাই। কি জানি, মোসলমান মওতা কবরের আশা করেছিল, না করে নাই। তবে তা একরকম করে হয়ে গেয়েছিল। কবর দেবার লেগে বেশি দূরে তো যেতে হতো না! মাঠের ধারে, পুকুরের পাড়ে, নাইলে কুনো একটা খানায় গাড় খুঁড়ে মড়া রেখে এলেই হতো। এমনি করে বুড়ো-ধুরো, জনম-রুগি, ঢোক-পিয়াসি, উদুরি যারা ছিল তারা পেথমেই গেল। তাপরে মরতে লাগল সব রোগা-ভাংরোগুলিন, আজ হোক, কাল হোক যারা মরতই। এদের মরা হয়ে গেলে বাল-বাচ্চাদের মড়ক এল। দুধের বাচ্চা, দুধ ছাড়া আর কিছু খায় না, খেতে শেখে নাই– তা মায়ের বুক এমন শুকনোর শুকনো যি চোঁ চোঁ করে টেনেও এক ফোঁটা দুধ বার করতে পারত না বুকের। দুধের বাছা দুনিয়ার আসে তো দয়া করে, রহমতের মতুন। বয়ে গেয়েছে তার বাঁচতে। এয়েছেলম, থাকতে দিলি না, চললম– বোধায় এই মনে করেই সব ঝটপট বিদেয় হতো। তবে এরা মরলে কুনো হ্যাঙ্গাম-ফৈজত নাই। মাঠের ধারে এই পুকুর ঐ পুকুরের পাড়ে গাড় খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়ে এলেই হতো। হিঁদু-মোসলমান সবাই তা-ই করত।

সেই যে পরপর দু-বছর একটি দানা ফলল না, যুদ্ধও পেলয়-আকার নিলে, কলকাতা বদ্দোয়ান আর কুন্ কুন্ শহরে

জাপানিরা বোমা ফেললে, সেই সোমায় ধানচাল একদম গরমিল হয়েছিল, পয়সা তো দূরের কথা সোনার অলংকারগয়না দিয়েও একমুঠো চাল পাবার উপয় ছিল না। শহরেও পাওয়া যেছিল না, আবার দামেও আগুন লেগেছিল ধান-চালের বাজারে। কত্তাও ত্যাকন বলেছিল চালের এত দাম সি-ও লিকিনি বাপের জম্মে দেখে নাই। তবে গাঁয়ের কথা আলেদা, গাঁয়ের লোকে তো আর চাল কিনে খেত না। তাদের কাছে চালের দাম বাড়লেই বা কি, কমলেই বা কি? তারা পরপর দু-সন ধান পায় নাই একটো। তাদের তো ঠারো দাঁড়িয়ে মরতে হবে– শুয়ে-বসে আয়েস করে মরার ভাগ্যও তাদের নাই।

ত্যাকন দেখেছেলম, মানুষরা সব এক জায়গায় বসে না, কেউ কারুর সাথে কথা বলে না, দুটো গপ্পগাছাও করে না। কিসের লেগে দিনরাত কুকুরের মতুন হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়াইছে। এমনিতে কথা নাই, কিন্তুক আবার কথা মানেই মারামারি। উপোসি মানুষ মারামারিই বা করে কেমন করে? খানিক বাদেই হাঁফিয়ে যেয়ে একজনা আর একজনার দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকে যেন পারলে কাঁচা চিবিয়ে খায়। আমাদের বাড়ির খামারে দেখেছি একগাদা লোক পাঁচিলের ছেঁয়ায় বসে আছে কিন্তুক কেউ একটি কথা বলছে না। গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় হন হন করে হেঁটে চষে বেড়াইছে মানুষ, কুনো কাজ নাই। শুদু আনাগোনা-ত্যানা, তাঁত বোনাবুনি করছে। কি করবে, কোথা যাবে কিছুই যি ঠিক নাই। আদুরে আদুরে ছেলে সব দল বেঁধে মাঠের দিকে চলে যেচে, সারা দিনে আর বাড়ি আসে না। এসে কি করবে? বাড়িতে চুলো জ্বলে নাই, হাঁড়ি চড়ে নাই– তাইলে বাড়ি এসে কি করবে? ঘাটে মাঠের পুকুরে যেদি দুটো বনকুল কি শেয়াকুল পায়, গাছে একটো কয়েতবেল পায় কিম্বা শালুক, পদ্মর ডাঁটা ঘাটা খাবার মতুন কিছু পায় তা-ই চিবিয়ে পেটে দেবে। গাঁয়ের ইস্কুল খোলাও নাই, বন্ধও হয় নাই। যার মন হয় যায়, যার মন হয় না, যায় না। মাস্টাররাও কেউ আসে, কেউ আসে না।

নাই, নাই, কিছুই নাই। হেলেঞ্চা শাক, কলমি শাক, শুষুনি শাক যা সব যেখানে সেখানে পাওয়া যেত, যে খুশি নিয়ে যেত। অ্যাকন সিসব সারা গাঁ খুঁজে কোথাও পাবার উপয় নাই। আচ্চয্যির কথা– গাধাপুইনি, খইলুটি শাক যি শাক, যা কেউ খেত না, গরু-ছাগলেও না, সেই শাকও গরমিল। যার সজনে কি একটো ডুমুর গাছ আছে, সে অ্যাকন একটো শজনের পাতা, একটো ডুমুরও কাউকে দেয় না।

আকালের মদ্যে মানুষ কি মানুষ ছিল? পুরুষরা নাইলে প্যাটে কাপড় বেঁধে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াইত, বউ-ঝি-শাশুড়ি যারা তারা নাইলে ঘরের ভেতর মুখ বুজে বসে থাকত, জোয়ান জোয়ান বিটিছেলেগুলিন কি করে? তারা সব লোকের বাড়ি বাড়ি দাঁদুরে বেড়াইতে লাগল। আমি মেয়েমানুষ, তবু তাদের দিকে তাকাইতে পারতম না। ময়লা চেকট ত্যানাকানি পরে আছে। তার ভেতর দিয়ে সব দেখা যেচে, কিছুই ঢাকা পড়ে নাই। তা ঢাকা পড়বেই বা কি? না খেয়ে খেয়ে দ্যাহে কিছু নাই, ঢাকা দিলেও যা, না দিলেও তাই। সবার আবার ত্যানাকানিও জোটে নাই। কেউ এক টুকরো পচা চট জড়িয়েছে কোমরে। আর এক টুকরো জড়িয়েছে বুকে। কাকে শরম করবে, কি করে শরম করবে? এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াইছে ভূতের মতুন, গাছপালার আড়ালে আড়ালে। জট পাকিয়ে আছে চুল, ডাইনির মতন সেই চুল চুলকোতে চুলকোতে ছিঁড়ে ফেলছে। খারাপ কিছু তারা করে নাই। তবে খিদের জ্বালা এমমি জ্বালা লোকে করতে চাইলে কি তাদের নিয়ে খারাপ কাজ করতে পারত না? তা তেমন কিছু হয় নাই। গাঁয়ে ঘরে সবাই আকালে মরছে, ফুত্তি করার মানুষ কোথা?

গাঁ থেকে কুনো মেয়ে যায় নাই। কটো পরিবার, তা দশ ঘর হবে, গাঁ থেকে চলে গেয়েছে। ঐ দশটো বাড়ি– বাগদিপাড়ার দু-ঘর, হাঁড়ি-ডোমপাড়ার তিন ঘর আর হিঁদু-মোসলমানপাড়ার চার-পাঁচ ঘর শ্যাষ পয্যন্ত গাঁয়ে আর থাকতে পারলে না। কারুর সাধ্যি হলো না যি তাদের বলে, যেয়ো না। রাত আঁদার থাকতে থাকতে কাউকে কিছু

না বলে ওরা গাঁ ছেড়ে চলে গেল। শহরে গেলে লিকিনি কাজ পাবে, কাজ খুঁজে নেবে। আমরা ভাবতম, আকাল পেরুইলে গাঁয়ে ফিরবে বোধায়। কেউ ফেরে নাই। ঘর-বাড়ির চাল গলে-পচে ভেঙে পড়েছে, ন্যাংটো দেয়ালগুলিন অ্যাকনও আছে।

একদিন সাঁঝরেতে, ত্যাখনো ভালো করে আঁদার নামে নাই, কি মনে করে বাড়ির বাইরে এসে খামারে দাঁড়িয়েছেলম। খামারের পচ্চিমদিকের দুই বাড়ির ছামনের গলি দিয়ে তামিল পুকুরের পাড় আর মাঠ দেখা যেচে। দেখি কি, পুকুরের ঢাল ধরে কারা সব মাঠে এসে নামল। ঐ তিমি-সাঁঝের আঁদারে সব ছেঁয়া ছেঁয়া মানুষ– তাদের গায়ে জামাকাপড় আছে কি নাই, এতদূর থেকে বুঝতে পারলম না। বোধায় নাই, থাকলেও ছেঁড়া ত্যানাকানির বেশি কিছু নাই, রেতে বেরিয়েছে য্যাকন। যেচে কোথা ওরা? ই গাঁয়ের মানুষ যি লয়, সি তো বোঝাই যেচে। তাইলে কি আশেপাশের এলেকা থেকে এসে ওরা এই গাঁয়ের ঝোপ-জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল? হায়, রেতের আঁদারও যে মানুষের এত দরকার, তা কি কুনোদিন ভেবেছি! মানুষগুলিন দূরে চলে যেচে, তা দেখতে পেচি। মেয়ে-মরদ বালবাচ্চা সব আছে ঐ দলে। সব ভূতের মতুন, সব ছেঁয়া ছেঁয়া। ভাত নাই, কাপড় নাই– জেবনটো এসে ঢুকেছে প্যাটের চুলোয়। সিখান তুষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে– কিছুই চোখে দেখতে পেচে না। ইজ্জত-শরম তো দূরের কথা, সন্তানটোকেও দেখতে পেচে না। ভিটেমাটি ছেড়ে সব বেরিয়ে পড়েছে। ই গাঁয়ে এসে যি বাড়ি বাড়ি ভিখ মাঙবে তারও উপয় নাই। আধ-উদম মেয়ে-পুরুষ সব– যেদি কেউ চিনে ফেলে। দূরে যেয়ে যা খুশি তাই করবে– কে আর চিনবে?

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়লম। আঁদারে মিলিয়ে যেতে লাগল দলটো, আঁদারেই গোটা দলটো জড়া-পুঁটুলি পাকিয়ে একটো বড় ছেঁয়া হয়ে গেল। তা-বাদে আর তাদের দেখতে প্যালম না।

দুই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে বসলম। ওরে,

অ্যাকন কাকে ডাকি? কার সাথে দুটো কথা বলি? বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে– এত লোক বাড়িতে কিন্তুক অ্যাকন কেউ নাই, একটি ছেলেমেয়েও দেখতে পেচি না। নিজেরগুনো বড় হয়েছে। তারা মায়ের কাছে অতো আসে না। তাইলে এইবার কি আমাদেরও নিজের নিজের প্যাটের ভেতরে সেঁদোনর সোমায় হলো? শ্যাষ যি মরাইটো ছিল, তার আর আধখানা বাকি আছে। এইমাত্তর খামারে তা দেখে অ্যালম। তা ভালো! এখনো আমরা দোকান করতে যাই, গামছার কোণে দুটো চাল বাঁধা থাকে। ঐ চাল দোকানদারকে বেচে ত্যাল-নুন ট্যানাকাঠি মশলাপাতি কিনি, দু-বেলা চুলো জ্বলে, ভাতের চাল ফোটে। তবে সি আর কদিন কে জানে! আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। উসারার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে একা বসে থাকলম। গিন্নির ঘর ফাঁকা– সি ঘরে কো-কাপ আঁদার। এই তো কদিন হলো চলে গেয়েছে, মওতার ঘরে আলো জ্বালানোর লিয়ম। কিন্তুক আলো জ্বালাব কোথা থেকে?

যুদ্ধু নিয়ে অ্যাকন আর কেউ ভাবে না। যা হবে হোক। দিনে রেতে কতোবার কতো উড়োজাহাজ আসছে-যেচে, কেউ তাকিয়েও দেখে না। বোধায় বোমা ফেললেও কেউ গা করবে না। বোমাতে আর কতোজনা মরবে? আর মরলে সাথে সাথে মরবে। ভুখের জ্বালায় এমন করে ধুঁকে ধুঁকে তো মরতে হবে না! বউ-মেয়ে-পুতের মরণও দেখতে হবে না।

গাঁয়ে অ্যাকন কন্টোলের দোকান হয়েছে। কটো বাঁধাবাঁধি জিনিশ সিখানে পাওয়া যায়। শাড়ি এলে শাড়ি পাওয়া যায়। সবুজ বা নীল পাড়ওয়ালা মোটা, মিলের শাড়ি। আজকাল তা-ই পরছি। আর পাওয়া যায় মোটা মার্কিন কাপড়। ছেলেদের জামা তৈরির লেগে পাওয়া যায় লংক্লথ বলে আর একরকম কাপড়। মিলের শাড়ি এমন মোটা যি, ভেজালে ভারি চব্বর হয়ে যায়। তোলে কার সাধ্যি। এমন মোটা কাপড় কুনোদিন পরি নাই। ননদ পরত মিহি ধূতি। অ্যাকন সবাই ঐ মোটা মিলের শাড়ি পরছি। পাওয়া যে যেচে, সেই কতো! ই

কাপড়ও কন্টোলের দোকানে সব সোমায় আসে না। য্যাতো দরকার ত্যাতো কুনোদিনই মেলে না। সবাই যেদি কিনতে পারত, তাইলে কন্টোলের দোকানে য্যাতোই শাড়ি আসুক সবাই পেত না। বাজারের দিষ্টে দাম বেশ কমই বটে। তা য্যাতোই কম হোক, দাম দিয়ে শাড়ি কেনার লোক আর কজনা? কন্টোলের দোকানে জিনিশ পেতে গেলে রেশন কাট করতে হতো। তাতেই সব জিনিশের নাম লেখা থাকত। কাপড় ছাড়া পাওয়া যেত চিনি, ট্যানাকাটি, কেরাসিন এসব। আরও অ্যানেক জিনিসের নাম লেখা থাকত। ঐ নাম পয্যন্তই সারা– বেশিরভাগ জিনিশই থাকত না– যা বা থাকত তা কখন পাওয়া যাবে, কতোটো পাওয়া যাবে, তা বলবার জো ছিল না।

বাড়িতে কন্টোলের শাড়ি এল। শাশুড়ি নাই। তাই ননদ জা-দের সবাইকে ডাকলে, নিজের হাতে এক-এক জনের হাতে কাপড় তুলে দিলে। কিন্তু পেত্যেকে দেখলম কাপড়-হাতে মুখ নামিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। কাপড় কি পছন্দ হয় নাই? ননদ কিছুই বুঝতে পারে না। এতকাল ইসব কাজ গিন্নি নিজে করত, তা সে চলে গেয়েছে দুনিয়া ছেড়ে। অ্যাকন ননদের ওপরেই সব দায় পড়েছে। সে বুঝতেই পারছে না, কাপড়-হাতে সব মুখ বেজার করে দাঁড়িয়ে আছে কেনে। ননদ এই কথা দু-একবার শুদুইতেই আসল কথাটো বেরিয়ে এল। কাপড় পছন্দ হয় নাই। সবই তো এক কাপড়, শুদু পাড়ের রঙ আলাদা, তাইলে পছন্দ না হওয়ার কি আছে? আমরা পাঁচ বউ সিখানে হাজির। ছোট দ্যাওরের সোংসার শহরে– তা সে-ও পরিবার অ্যাকন গাঁয়ে রেখে গেয়েছে শহরের আবস্থা দেখে। তাই আমরা পাঁচ বউ-ই হাজির। মনের কথাটি কেউ ভেঙে বললে না বটে কিন্তুক কথায় কথায় বুঝতে পারা গেল, নিজের কাপড়টোই কারুর পছন্দ লয়, অন্য জনার হাতে যি কাপড়টো সেইটো পছন্দ। কি আচ্চয্যির কথা– ননদ বলেই ফেললে, একই কাপড়, তফাত কিছুই নাই, শুদু পাড়ের রঙের তফাত। এরই জন্যে নিজের কাপড়টি পছন্দ নয়, আরেকজনারটি পছন্দ? না,

এ ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়।

আমি তো কিছুই করি নাই, মায়ের আমল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। মেতর-ভাই শুধু মায়ের ইচ্ছার দাম দিয়েছিল। দু-বছরও হয় নাই, মা দুনিয়া ছেড়ে গেয়েছে, এর মধ্যেই সব নিয়ম পাল্টে যাবে? তা যাকগো, এই নিয়ে আমি অশান্তি করতে পারব না। শাড়ি সব এই রইল, যার যেমন মন হয়, তুলে নাও।

সিদিন এর বেশি আর কিছু হলো না। যার হাতে যি শাড়ি ছিল, সে সিটিই নিলে কুনো কথা না বলে, কিন্তুক হাসিমুখে লয়। যেমন বেজার মুখে ছিল, তেমনি বেজার মুখেই নিজের নিজের কাপড় নিয়ে গেল। কি মনে করে রেতে এই কথা কত্তাকে বলতে গ্যালম। রাগ করে বলি নাই, আমার ভালো লাগছিল না বলেই বলতে গ্যালম। তা এমন করে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে– উঃ, সি যি কি চাউনি– আমার জানের ভেতরটো পয্যন্ত দেখে নিলে– আমি কথাটো আধখানা বলেই থেমে গ্যালম। এই পেথম কত্তা আমাকে যেমন দেখলে, আমিও তেমনি দেখতে প্যালম কত্তাকে। কত্তার সেই চাউনির ভেতরে রাগ ছিল না। মনে হছিল কষ্টে আর দুঃখে সে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে।

তাইলে সব্বোনাশ কি এমনি করেই শুরু হয়? চুলের মতন সরু একটো চিড় কোথা যেন ছিল, চোখে দেখতেই পাওয়া যেত না। পেথম দিন দেখে মনে হলো, কই, আগে কুনোদিন দেখি নাই তো, পরের দিন দেখছি, ওমা, তার পাশে আর একটো চিড়, তাপর দেখতে দেখতে অ্যানেক অ্যানেক চিড় সব জায়গায়– কখন হলো, কি হলো, কেমন করে হলো ভালো করে কিছু বোঝার আগেই একদিন বড় বড় ফাটল ধরে জিনিশটো চৌচির হয়ে ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সোংসারেও কি তাই হতে যেচে? হঠাৎ খেয়াল করলম, আমাদের বড় সোংসার অ্যাকন কত বড় হয়ে গেয়েছে! এ তো একটো সোংসার লয়, পাঁচটো সোংসার ; এ তো ডালপালা বাড়া নয়, ই বটগাছের মতুন। আলেদা

আলেদা ঝুরি নেমে আলেদা আলেদা বটগাছ হয়েছে আর মূল গুঁড়িটো অ্যাকন আর মুটেই নাই, ফোঁপরা হয়ে কবে শ্যাষ হয়ে গেয়েছে। গিন্নি ছিল মূল গুঁড়ি, সে থাকতে থাকতেই যার যার ঝুরি নামছিল। অ্যাকন আর সি গুঁড়িই নাই, মূল গাছটো থাকবে কি করে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটো ভায়ানক কথা মাথায় এল। আমিও কি তাইলে এত দিন তলায় তলায় ঝুরি নামিয়েছি? সবাইকে বাদ দিয়ে আমার নিজের সোংসারের একটো আলেদা বটগাছের ঝুরি কি পুঁতিছি? একবার ভেবে দেখি তো! নিজের মন নিজের কাছে বিচের করলে দোষ কিছুই নাই। নিজের য্যাতো খারাপই বেরুক কে আর তা জানতে পারছে? সেই লেগে খুব চেষ্টা করলম জা-দের কথা না ভেবে নিজের মনের উলুক-শুলুক খুঁজে দেখতে। বড় খোঁকা মারা গেয়েছে তেরো-চোদ্দ বছর। সে আজ বেঁচে থাকলে মনের আবস্তা কি হতো জানি না, হয়তো জা-দের চেয়েও দশকাঠি সরেস স্বাথপর হতোম। কিন্তুক সে নাই, সে চলে যাবার পর আর আমার জেবনে জেবন নাই, কোথাও খুঁটি পুঁতি নাই, কোথাও ঝুরি নামাই নাই। আমার এই কথা কেউ জানে না, কত্তাও জানে না। ছেলেমেয়ে আজ যারা আছে, বড় হয়ে গেয়েছে, তারাও কেউ জানে না। আমার ঝুরি মাটিতে নাই, বাতাসে আলগ্ ঝুলছে।

তাই বলে আমার কপাল দিয়ে সবাইকে বিচের করতে যাব ক্যানে? দুষবই বা ক্যানে? সিদিন আর কিছু হয় নাই, ঝগড়াঝাঁটি না, কথা-কাটাকাটি না, ননদের দিকে চোখ তুলে কেউ একটো কথাও বলে নাই। তবু ক্যানে আমার মনে হলো, এই শুরু– সোংসারের ভাঙনের এই হলো গোড়াপত্তন? সুখের দিনে কিছু হয় নাই, সবাই হেসেছে, খেলেছে, সবাই সবাইকে দেখেছে, দুখে দুখি, সুখে সুখী হয়েছে আর অ্যাকন য্যাকন কাল খারাপ পড়েছে, অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে, সবকিছুই ভাগে কম পড়ছে, অমনি কোথা থেকে বিষের মতুন গল গল করে হিংসে বেরিয়ে আসতে অরম্ভ হয়ে গেয়েছে।

অভাব যি অমনি করে আস্তে আস্তে হাঁ করে, কুনোদিন জানতম না। ধানের শেষ মরাইটো খালি ছোট হছিল। অত বড় পেল্লায় মরাই— মনে হতো, অত ধান খেয়ে কে ফুরুইতে পারবে— সেই মরাই হঠাৎ একদিন দেখলম কেমন এতটুকুনি হয়ে গেয়েছে। তারপর দেখলম ল-দ্যাওর একদিন মুখটো হাঁড়ি করে মরাই ভেঙে সব ধান বার করে ফেললে। পোষ-মাঘ ত্যাকনো অ্যানেক দেরি। দ্যাওরকে শুধুইতে সে মুখ কালো করে বললে, এই ধানকটির চাল ফুরুলেই বাড়ির খোরাকি ধান আর কোথাও নাই। তার কথাটো নিয়ে ত্যাকন তেমন ভাবি নাই। ওমা, ওর কথার মানে হচে এই বাড়িতে উপোস অরম্ব হবে আর দু-তিন মাসে বাদে? সিদিন কি সত্যিই আসবে? কত্তা কিছু করবে না? এই সোংসার তো তার। সেই-ই তিলে তিলে গড়েছে, সেই অ্যাকন এই খেলাপাতি ভেঙে দেবে? তার পক্ষে সবই সোম্ভাব, দিতেও পারে। সিদিন রেতে একবারের লেগে দেখে ফেলেছেলম তার ভায়ানক দুঃখ আর কষ্টের মুখ! তবু কি শক্ত সেই মুখ, যেন লোহা পুড়ে গনগন করছে। ঐ মুখটিকে আমি খুব ভয় করি।

এই গরমকালেও কোথা থেকে আসছে এই হাঁড়কাপুনি ঠান্ডা বাতাস? সব একদম কালিয়ে জমে যেচে। আগে আগে সোংসারে সব জিনিশ খালি বেড়ে যেত। সব কিছুতেই ছিল বরকত, কিছুতেই কুনো কিছু শ্যাষ হতো না। অ্যানেক জিনিশই ফেলে দিতে হতো। কতবার গুড় আলু পেঁয়াজ পচে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, সব ফেলে দিতে হলো। কখনো কখনো ভাবতে হতো এত ফলে ক্যানে? সব ল্যাতাজোবরা হয়ে থাকে— হাতের কাজ আর শেষ হতে চায় না। এইবার দেখছি সবকিছুতে ভাটার টান। সেই যি দু-বছর আগে ফাঁপা সমুদ্দুরের মতুন পানি উথাল-পাথাল হাওয়ায় দু-দিনে হুড় হুড় করে নেমে গেল, ঠিক তেমনি এক হাড়কাঁপুনি হাওয়ায় বাড়ির সব জিনিশ যেন উধাও হয়ে যেতে লাগল! এই ছিল, আর নাই। ভরা ছিল সকালে, বৈকালে খালি। একটু বেলা হলে গাই দুইয়ে দুধ আনা হয় বাড়িতে। অতো দুধ কোথা

রাখব, কি করব, আগে এই ভাবনা হতো। কতদিন দুধ লষ্ট হয়েছে বলে গিন্নির ধমকানি খেয়েছি। অ্যাকন দেখি, সেই দুধ এক বলকা করে রেখে দিলে ঠান্ডা হওয়ারও সময় হয় না। জা-রা সব তক্কে তক্কে থাকছে। ঘটি-বাটি-গেলাসে সবাই নিজের নিজের ছেলেমেয়ের দুধ ঢেলে নিয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে যেচে। ননদ যি ছেলেপিলেদের ডেকে ডেকে দুধ খাওয়াত, অ্যাকন আর তার কুনো উপয় নাই। আগে দুধ ফুরুইত না, অ্যাকন সবার কুলুইচে না। ননদ দুধ দিতে যেয়ে দেখছে দু-একজনাকে বাদ দিতে হচে। যারা বড় হয়েছে, তারাই কেউ কেউ হয়তো বাদ পড়ছে। জা-রা বাছাবাছির কুনো ধার ধারছে না, যে যেমন পারছে দুধ ঢেলে নিয়ে চলে যেচে। কত্তা বরাবরই রেতের বেলা এট্টু দুধ খায়। আমি তো আর কত্তার দুধ ঢেলে আনার লেগে বাটি নিয়ে জায়েদের সাথে দাঁড়াইতে পারি না। শরমে মাথা হেঁট হয়ে যেতে লাগল। আমার রকম দেখে ননদ-ই বা আর কি বলবে— চুপ করেই থাকছে। এক-একদিন দুধের কমবেশি নিয়ে জায়েদের মধ্যে লেগে যেচে তুলকালাম কাণ্ড। চিচ্‌কার- চেঁচামেচি শুনে কত্তা একদিন বাড়িতে ঢুকেছিল। আগে তাকে দেখলে জা-রা ভয়ে শরমে পাথর হয়ে যেত। সিদিন কেউ গেরাহ্যি করলে না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে কত্তা আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ভরা গোয়াল কবে খালি হলো কেউ জানে না। মাহিন্দার দুটো বিদায় হয়েছে। পাড়ার এক ছোঁড়া মাঠে গরু চরাতে নিয়ে যায়। গাইগুলিন কি দড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোয়াল থেকে লাপাত্তা হয়েছে? কোথা গেল ঐসব বড় বড় দুধেল গাই? ক-বছর আগে মড়কে মরেছিল তিনটো, গেমার বিষ খেয়ে ধড়ফড় করে মরল সিন্দিটো। অ্যানেক কটো বকনের বাছুর হলো না। মোষও অ্যাকন আদ্দেক। পেয়ালা রঙের একটো বুড়ি ঘুড়ী আছে অ্যাকনো। কত্তা ঘোড়ায় চাপা ছেড়েছে অ্যানেকদিন। কেউ কিনতে আসে না বলেই ঘুড়ীটো অ্যাকনো বাড়িতে রয়েছে।

যুদ্ধু তো ছিলই, তাতে তেমন কিছু হয় নাই। কিন্তুক মাত্তর দু-বছরের আকালে দুনিয়া অন্যরকম হয়ে গেল। ভাত-কাপড়ের টান বড় টান। আর একজনার কি হচে তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে? যার পরনে কাপড় নাই, সে দেখছে সেই-ই ন্যাংটো, আর কেউ ন্যাংটো তা কি সে দেখতে পায়? ছেলে ভুখে কাঁদছে তা চোখে দেখতে হয় আর মনে আন্দাজ করতে হয় কিন্তুক নিজের প্যাটে আগুন জ্বললে দেখতেও হয় না, আন্দাজ করতেও হয় না। সি আগুনের কি কুনো তুলনা আছে? সি আগুন জ্বললে পেটের সন্তানকেও দেখতে পাওয়া যায় না।

ছেলেপুলেরা বাড়িতে অ্যাকন য্যাকন-ত্যাকন যা খুশি তা-ই খেতে পায় না। বাঁধা তিনবার খাবার। অ্যাকনো ননদই তাদের খেতে দেয়। পেরায়ই দুখে-রাগে তাকে চোখের পানি ফেলতে হয়। যি ছেলেটো বেশি খায় কিংবা কুনো বিশেষ জিনিশ খেতে পছন্দ করে, তার দিকে তাকানোর জো নাই, ননদকে নিক্তিতে মেপে চলতে হয়। একটু ইদিক-উদিক হলে– কি শরমের কথা– মুখফোঁড় কুনো ছেলেই হয়তো বলবে, উ বেশি পেচে। একজনার খাবার আর একজনার থালা থেকে তুলে নিতেও দেখছে ননদ। ছেলেরা কেউ দুর্দান্ত, কেউ শান্ত, কেউ হিংসুটে, কেউ সাত চড়ে রা করে না। খাবার সোমায়ে ঘরে হুড়োহুড়ি মারামারি। সব চাইতে খারাবি হচে, সময়ে সময়ে তাদের মা-রাও ঘরে হাজির থাকছে। কিছু বলছে না বটে, একদিষ্টে নিজের নিজের ছেলেমেয়ের থালার দিকে চেয়ে আছে। ননদ কাঁদবে না তো কি করবে? পোষ্কার বোঝা যেচে, আজ বলছে না কিন্তুক কালকেই কুনো বউ বলবে, তার ছেলেকে কম দেওয়া হচে। ননদ এক দিষ্টিতে দেখছে না সবাইকে, দুই-দুই করছে। কে জানে, হয়তো নিজেরাই নিজের নিজের ছেলেমেয়েকে খাবার খসিয়ে দেবে আর তা করতে গিয়ে নিজেরাই হুড়োহুড়ি করে মরবে। ত্যাকন হয়তো তাদের সোয়ামিরাও এসে হেঁশেলে ঢুকবে, নিজের নিজের ইস্ত্রীর হয়ে লড়াই করবে। ত্যাকন ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি হতে আর বাকি কি থাকবে?

বউদের হয়ে ঝগড়া করতে করতেই হয়তো দ্যাওর তার ভাবির গায়ে হাত দেবে কিংবা ভাসুর মারবে ভাদ্দর-বউকে। পোষ্কার দেখতে পেচি ইসব হবে, হবে। এর মদ্যেই ছেলেমেয়েরা হাঁড়ি থেকে নিজেরা খাবার তুলে খেতে শিখে ফেলেছে। সারাদিন সবাই নিজের নিজের খাবারের ধান্দায় থাকে। কোথা থেকে একটো মাছ পেলে সেটি পুড়িয়ে খায়, নাইলে তার মা-ই তাকে আলেদা করে রেঁধে দেয়। ননদই কি সত্যি সবাইকে এক দিষ্টিতে দেখতে পারচে? সেই যি ভাগ্নেদুটিকে কত্তা ই সোংসারে এনেছিল মানুষ করার লেগে, তাদের একজনা তো বড় হয়ে শহরে চাকরি করছে, আর একজনা ই বাড়িতে অ্যাকনো আছে। ননদের চোখের মণি এই ছেলেটি। তাকে এট্টু অন্য রকম করে না দেখে কি ননদ পারে? সকলের ছামনে হয়তো ভালো একটু কিছু ননদ তাকে দিয়ে ফেলে, কিম্বা লুকিয়ে-চুরিয়ে কুনো খাবার দেয়। হয়তো নিজের খাবার থেকেই দেয়। তা এমন শিক্ষে হয়েছে ছেলেমেয়েদের তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে, তারা চেঁচিয়ে উঠবে, ফুপু ওকে দিলে, আমাকে দিলে না। একদিন চূড়ান্ত হলো, য্যাকন বউদের একজনা ছেলেপুলেদের খাবার সোমায় হেঁশেল থেকে উঠে গেল আর একটু বাদে সোয়ামিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। তাপর সেই দ্যাওর সকলের ছামনে, ছেলেমেয়ে-বউ-ঝি সকলের ছামনে, নিজের বুনকে যা লয়, তা-ই বলে রপমান করলে। এমন করলে ই সোংসারে থাকা হবে না তা-ও বললে।

সোংসারের ভেতরটো এইবার তাকিয়ে দেখতে প্যালম আর সোংসারের মধ্যে মানুষ কি, তা-ও দেখলম। কুকুর-বেড়ালের ছেঁড়াছিড়ি দেখে রাগ করি কিন্তুক মানুষ কুকুর-বেড়ালের চাইতে কিসে ভালো? মূলে টান পড়লে সবাই সমান। সেই মূল হচে প্যাট। এই আমি সার বোঝলম। মূল ঠিক থাকলে সব ঠিক, তাই বলছেলম প্যাটের খোরাকি নাই তো কিছুই নাই, তুমি নাই, আমি নাই, কেউ নাই। এই দ্যাশে সেই মূলের নাম হচে ধান। ঐ ধান থেকেই খাবার,

ঐ ধান থেকেই কাপড়, ঐ ধান থেকেই সব। ঐ জিনিশের অভাবেই সব ছত্রখান হয়ে গেল। ঘর ভেঙে গেল, ঘরের চাল হুমড়ি খেয়ে পড়ল, মাটির দেয়াল মাটিতে মিশল, গরু মোষ ছাগল মুরগি সব উধাও হলো, চাকর মাহিন্দার পালিয়ে গেল। ভরাভত্তি পানি সব নেমে গেল, পাঁক আর কাদা বেরিয়ে পড়ল।

একদিন ঠিক ভরাদোপরে দু-ভাই নিজের নিজের ইস্ত্রীর কথা শুনে মারামারি করে দুজনই জখম হলো। সি এমনি জখম যি দুজনার কেউ আর দাঁড়াইতে-বসতে পারলে না। একজনার লাগল কোমরে, কোমর ভাঙল কি না কে জানে আর একজনার মাথায় পড়ল লাঠির বাড়ি। দর দর করে রক্ত ঝরতে লাগল। এইটি ল-দ্যাওর— আমার ভাইয়ের অধিক, ছেলের মতুন— ফেনা মেশানো টকটকে লাল তাজা রক্ত মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে যেচে। সে দু-পা ছড়িয়ে দু-হাতে ভর দিয়ে বসে আছে। মুখে কি খারাপ খারাপ কথা! মাঝে মাঝে হুঁ হুঁ করে কোঁকাইছে।

সবাই ছামনে এসে জড়ো হলো। ছোট দ্যাওর নাই তবে তার বউ-ছেলেমেয়ে সব ওখানে। ভাসুরও এল। কিন্তুক কত্তা এল না। হয়তো বাড়িতে নাই, থাকলেও আসবে না, জানা কথা। সবাই এসে দাঁড়িয়ে থাকলে, কারুর মুখে একটো কথা নাই। শুধু হাহাকার করে কেঁদে উঠল ননদ। যে ছোটভাই এত রপমান করেছিল, সেই ছোট ভাইয়ের য্যাকন রক্ত ঝরল, ত্যাকন তার লেগেই মাথা ঠুকতে লাগল ননদ, ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত— সোংসার আর থাকবে না, থাকবে না।

পড়ে থাকলে দু-ভাই। উঠে দাঁড়িয়ে যি নিজের নিজের ঘরে যাবে সি সাধ্যিও নাই। ঐ উসারাতেই পাশাপাশি দু-ভাইয়ের বিছেনা করে দিলে তাদের বুন। দূর থেকে মনে হতে লাগল তারা দুজনা গলাগলি করে শুয়ে আছে। যি কদিন তারা উঠতে পারবে না, যেমন করে হোক একটু সাবু-বার্লি জোগাড় করে তাই রেঁধে খাওয়াবে ঐ বুন।

জা-দের কিছুই করার সাধ্যি নাই, তারা শুদু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। ডাক্তার-বদ্যির কুনো কথা নাই। অ্যাকন অসুখে-বিসুখে জ্বরজারিতে ছেলেমেয়েগুনোই দিনের পর দিন বিছেনায় পড়ে থাকছে, সাবু-বার্লিও জুটছে না, তা এইসব বুড়ো দামড়া জোয়ান মরদরা মারামারি করে পড়ে আছে– কে দেখবে তাদের?

আমি দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সেজ দ্যাওরটো একটু আখ্‌চোটা রকম, ভালো করে কারুর সাথে আলাপ করতে পারে না, কাজকম্ম গোঁয়ারগোবিন্দের মতুন কিন্তুক মানুষটি সে খারাপ লয়। আর ল-দ্যাওরকে নিয়ে তো কুনো কথা নাই! রাজপুত্তুরের মতুন চেহারা। অবশ্য আর আগের চেহারা নাই, তবু সে এখনো সোন্দর। বিয়ে হয়ে আমি য্যাকন ই সোংসারে আসি, ঐ দ্যাওর ভাইয়ের মতুন, ছেলের মতুন কাছে কাছে থাকত, যা ফরমাশ করতম তাই শুনত। আমার বড় খোঁকাটি হয়েছিল তার জানের জান। দাদির দেওয়া জমির বদলে ইখানে য্যাকন জমি কেনা হলো, সেই জমির ধান নিয়ে কত্তাকে বলে আলেদা একটো মরাই বাঁধলে। আমাকে এসে বললে, তোমার ধান আলাদা করে রাখা হলো।

আমার আবার ধান কি, সবই সোংসারের– এই কথা তাকে বলেছেলম আমি। কতদিন আগের কথা! ওর কি মনে আছে সি কথা? উসব কথা কারুর মনে থাকে না। মাটি থেকে ওঠা ভাপের মতুন কোথা উড়ে যায়।

দুজনাই আবার উঠে দাঁড়াইলে বটে কিন্তুক দুই ভাই লয়, ঠিক যেন একে আরেকের দুশমন। কুনোই কারণ নাই, তবু ওদের দুই বউ-ও একে আরেকজনার দুশমন। আর এ কথা কে পেত্যয় যাবে যি দু-ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও হলো ঠিক তাই।

খামার অ্যাকন ফাঁকা। শ্যাষ মরাইটোর শ্যাষ কটি ধানও বার করে নেওয়া হয়েছে, খামারবাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। আর কদিন চলবে? যিদিন তা বন্ধ হবে, সিদিন থেকে কি হবে? কি বেবস্থা হবে এতগুলিন

পেরানির? কত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কি কঠিন সেই মুখ, যেন পাথরের। তাকে একটো কথা বলতে সাহসও হয় না, ইচ্ছাও হয় না।

আমার এত কথা, কার কাছে বলি? কেউ নাই। গিন্নি য্যাতোদিন ছিল, তার কাছে যেয়ে চুপ করে দাঁড়াইলেই হতো, কুনো কথার দরকারই হতো না। আপনা-আপনিই মন শান্ত হতো। ননদের কাছে তো সিটি হবার উপয় নাই, তারই বরং কত কথা বলার লেগে বুক ফেটে যেচে। আর আছে ঐ কত্তা। কিন্তুক উ মানুষ অ্যাকন মানুষই লয়, পাষাণ। তাকে আমার চিচ্‌কার করে শুদুতে মন যায়, দু-বছরের মদ্যে সব এমন ছারেখারে গেল ক্যানে? কেমন দেখেছেলম ই সোংসার, আর অ্যাকন কেমন দেখছি? অমন সোংসার তো সেই-ই দিয়েছিল, অ্যাকন সব দেখে চুপ করে আছে কেন? জানি, যেদি তাকে এই কথা শুধুই তার কুনো জবাব সে দেবে না, বড় জোর সব কথার এক কথা বলবে, সারা দুনিয়া ছারেখারে গিয়েছে, তোমার আমার সংসারও ঐ এক পথে যাচ্ছে। তবে কি লোকটো একবারে হেরে গেল?

পরপর দুবার মারা গেলেও মাঠে কিন্তুক ইবার ধান আছে। ই বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে দেখতে পাই না, মনে ইচ্ছা হয় একবার যাই, দেখে আসি আর কতো দূর? বাড়িতে বসে মনে হয়, এখনো অ্যানেক দূর। এখনো অ্যানেক দিন বাকি।

উত্তর-দুয়োরি ঘরের আঁদার কোণে মাটির বেরাট এক পয়ায় ভাতের চাল থাকে। ওখান থেকেই পেত্যেক দিন খরচ হয়। উত্তরপাড়ায় দুই বেধবা বুন আছে। তাদের কাছে লোকে ধান ভাঁচা দেয়। সেই ধান তারা সিজোয়, শুকোয়, তাপর ঢিঁকিতে পাড় দিয়ে চাল বানায়। এই তাদের পেশা, এই করেই তারা খায়। আমাদের ধানও ওদেরই কাছে ভাঁচা দেওয়া থাকে। ধান যায় ওদের কাছে, তাপর চাল আসে। সি চাল খরচ হয়ে গেলে আবার আসে। এই চেরকাল চলছে। পয়ায় চাল শেষ হতে না হতে আবার পয়া চালে ভরা হয়। এই পেথম

দেখছি পয়া আধেক খালি হয়ে গেয়েছে। ভেতরটো আঁদার, উঁকি দিয়েও বোঝা যেচে না চাল আর কতোটো আছে। দিনের বেলা লম্ফ জ্বালিয়ে পয়ার ভেতরটো দেখলম। একদম তলায় সেরদশেক চাল কুনো পেরকারে থাকতে পারে। লম্ফর আলোয় পুরনো চাল কটো দেখে আমার যি কেমন মনে হতে লাগল কি বলব? মনে হচে সাত রাজার ধন এই চাল। চালের রঙ কি অতো সোন্দর হয়?

কিন্তুক বাড়িতে আর চাল এল না। ল-দ্যাওরের ওপর ছিল সব দেখার দায়িত্ব। তা সে চুপ করে থাকে। ননদ পেত্যেক দিন তাকে বলছে, চাল কিন্তুক শ্যাষ, আর দিন দুয়েক পরে বাড়িতে চুলো জ্বলবে না। কদিন চুপ করে থেকে থেকে একদিন সে বললে, ভাঁচা দেওয়া ধানের আর কুনো চাল পাওনা নাই। ননদ এই কথা শুনে বললে, তাইলে কি হবে? ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে? যিখান থেকে হোক ধান জোগাড় করতে হবে না? সে ত্যাকন কাঠ-কাঠ গলায় জবাব দিলে, আমি কোথা থেকে ধান জোগাড় করব? চুরি করব, না ডাকাতি করব? বাড়িতে ভাত না হলে শুধু কি আমার ছেলেমেয়ে উপোস করবে? সবাই করবে। আমি কিছু জানি না।

ধানের কথা, চালের কথা, সোংসারের কথা ভাশুরকে বলা বের্থা। তার নিজের কুনো ছেলেপুলে নাই, অমন সোজা মানুষের কিছু করার খ্যামতাও নাই। সেজ দ্যাওরকে তো এসব কথা বলার আরও কুনো মানে নাই। সে এমন গোঁয়ারগোবিন্দ যি এসব শুনলে হয়তো আবার কার সাথে মারামারি-ফ্যাসাদ লাগিয়ে দেবে। আর থাকল ছোট দ্যাওর। তারও কুনো ভরসা নাই। এমন দিন পড়েছে যি সে অ্যাকন চাকরির কটো টাকা বাঁচাবার লেগে শহরে একা থাকে। বউ আর পাঁচটো বাচ্চা সে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কাউকে কিছু বলার নাই। ননদ কত্তাকে কিছুই বলবে না। কত্তা যেদি নিজে থেকে কিছু না করে, তাইলে শত বললেও কারুর কথায় কিছু করবে না। তাকে বলার কিছু নাই, তার অজানা কি আছে? ইদিকে

তা দের দেখে মনে হচে তারা যেন কিছুই জানে না। কুনো কাজকম্ম নাই, মনে কুনো দুচ্চিন্তা নাই, ঘর-দুয়োরে ঝাঁটপাট নাই, কোথাও কুনো ছিরিছাঁদ নাই। তারা সবাই সারা বাড়ি ছিরফুটি করে বেড়াইছে আর কথায় কথায় কুঁদুল অরম্ব করছে। মনে হচে, সোংসারের এই অবস্তা দেখে তারা ব্যাজায় খুশি। এমনি চললে আর কিছুদিন বাদে তাদের নিজের নিজের সোংসার হবে।

পেত্যেক দিন রাঁধার সোমায় ননদের সাথে আমি য্যাতম ভাতের চাল আনতে। ঘরের কোণের ঐ বেরাট পয়ার ভেতরে আঁদার দিন-দিন ঘোনো হচে। তার হাতের চাল তোলার টিনের কটোটো খরাৎ খরাৎ করে পয়ার গায়ে লাগে, অ্যানেকটো ঝুঁকেও ননদ পয়ার তলার চাল কটোর নাগাল পায় না। শ্যাষকালে সে মাথা ঢুকিয়ে দিলে পয়ার ভেতরের আঁদারের মদ্যে। স্যারদুয়েক চাল বার করে ঘরের বাইরে এসে দোপরের রোদে এগ্‌নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে বললে, আর একটি দানাও নাই। বাছারা আজ রেতে আর কেউ খেতে পাবে না।

কথাটো শুনেই মনে হলো দিনের আলো কেমন মিইয়ে এল, শন শন করে ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগল, আর বুকের ভেতরটো খামচে খামচে উঠতে শুরু হলো।

দোপর বেলায় ছেলেরা সব খেতে বসেছে। খাবার তেমন কিছু নাই। পাতলা ডাল আর ভাত। আগের দিনের মতুনই সব মারামারি কড়োগুড়ি করছে। খালি বড়গুনোর মন ভার। তারা বোধায় কিছু জানতে পেরেছে। অন্য দিন ননদ রাগারাগি-বকাবকি কতো কি করে। আজ সে একদম চুপ। তাকিয়ে দেখলম, চোখ দিয়ে তার টস-টস করে পানি পড়ছে। ফোলা ফোলা টকটকে লাল মুখ বারে বারে এদিকে পাশ করে পানি মুচছে।

বেকাল গেল, সারা বাড়িতে কারুর দেখা নাই। দেখলম সুয্যি ডুবল, দেখলম সাঁঝ নামল, দেখলম আঁদার ঘোনো হলো। আর একটু বাদে ঝিঁঝি পোকা ডাকতে লাগল। অন্যদিন জোনাকি দেখতে পাই

না। বাড়িতে লম্ফ-হেরিকেন জ্বলে, জোনাকি পোকা কে খেয়াল করে ; আজ বাড়িতে কোথাও আলো নাই, বাড়িময় আঁদারে জোনাকি ঘুরে বেড়াইছে।

চুলো জ্বলে নাই। ভাত হয় নাই। কেমন করে ছেলেমেয়েগুলিন বুঝে গেল আজ বাড়িতে রাঁধাবাড়া হয় নাই। রেতে তারা কেউ খেতে পাবে না। তাইলে কি বাপ-মা-ই তাদের শিখিয়ে দিয়েছে যি আজ আর হেঁশেলে খেতে যাস না? আমার কিছুতেই বিশ্বেস হচে না!

সময় যেতে লাগল তবু কেউ কাছে এল না। ননদকেও দেখতে প্যালম না। শ্যাষে বসে থেকে থেকে রাত পেরায় নিশুতি হলে আমি ঐ আঁদারের মদ্যেই গা-মাথা ঢেকে চোরের মতুন পা টিপে টিপে শোবার ঘরে যেয়ে ঢোকলম। ঘর আঁদারই বটে, তবে কত্তার একটো বিদেশী লম্ফ ছিল, সেটোয় একবার ত্যাল দিয়ে খুব কম করে জ্বালাইলে তিন-চার মাস জ্বলত। বহুদিন বাদে সেটিকে ঝেড়ে-ঝুড়ে বার করা হয়েছিল। দেখলম, আঁদার ঘরে খালি একটো নীল ফোঁটা। বোঝলম কত্তা সেইখানেই বসে আছে। আন্দাজে সিদিকে খানিকটো যেয়ে আর যেতে পারলম না। উবুড় হয়ে পড়ে আমি মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলম। ঠান্ডা শক্ত মেঝে, বারকতক ঠুকতেই বুঝতে পারলম কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। কেমন নেশার মতুন হলো, হাত দিয়ে রক্ত মুছি আর তেমনি করেই মাথা ঠুকি। মুখে খালি আমার একটো কথা : বাড়ির ছেলেমেয়েরা আজ না খেয়ে ঘুমুইতে গেয়েছে। ভোখ প্যাটে সারারাত তারা ছটফট করবে। তুমি কিসের কত্তা, আঁদার ঘরে বসে আছ? কারা দুনিয়ায় এনেছে তাদের? বলো, বলতে হবে তোমাকে। এইসব কথা বলতে বলতেই দেখি, ঘরের আঁদার অ্যানেকটো কমে এয়েছে, আমার খোঁকাদুটি বিছেনায় উঠে বসেছে আর পাথরের মতুন বসে আছে কত্তা।

নীল আলোর ফোঁটাটো টুপ করে নিভে গেল। বোধায় ত্যালের শেষ ফোঁটাটোও ফুরিয়ে গেয়েছে। আর বেশিক্ষণ গেল না, কত্তা

আমার দিকে মুখ না ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললে, আর মাথা ঠুকো না। আমি আজকের এই দিনটির অপেক্ষাতেই বসে ছিলাম। দেখছিলাম, কেউ আসে কি না। ভাই আর ভাই আছে কি না। বউদের আমি গেরাহ্যি করি না। দেখছিলাম ভাইদের কেউ বলে কি না যে চিরকাল তুমিই সব করে এসেছ, এখন এই সংকটে তোমাকেই হাল ধরতে হবে। না, কেউ এল না। তা যাই হোক, ছেলেপুলে একদিন না-ই খাক, শুকিয়ে মরতে তাদের আমি দোব না। কাল আমি যাব। সন্ধের আগেই এক গাড়ি ধান যেখান থেকে পারি আনব। তবে ঐ ধান শেষ হবার আগে সবারই সংসার আমি পৃথক করে দোব এই আমার প্রতিজ্ঞা। যাও, আর মাথা খুঁড়ো না।

আমি আর বিছেনায় গ্যালম না। সেইখানেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়লম। বিছেনার চেয়ে মাটি ভালো।

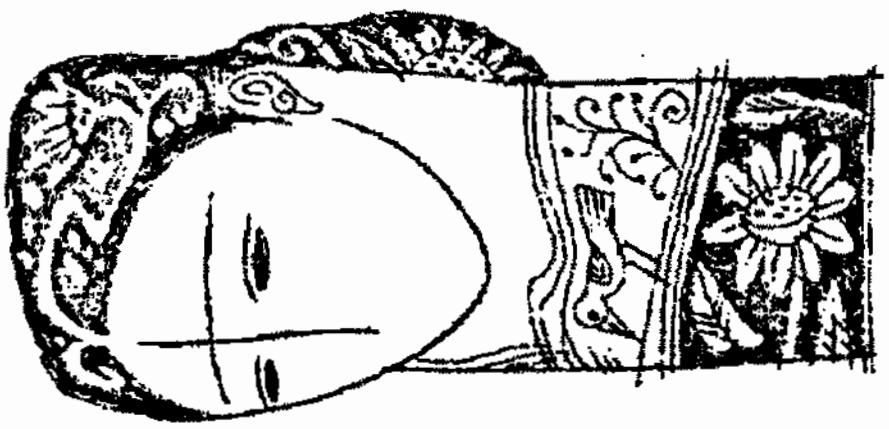

ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, সবাই পেথগন্ন হলো

সত্যিই, কত্তা পরের দিনই গেল আর সাঁঝলাগার আগেই গরুর গাড়িতে এক গাড়ি ধান নিয়ে ফিরে এল। এ এমন মানুষ যি জানে, ঘরে এখুনি খাবার নাই, শুদু ধান নিয়ে গেলেই হবে না, ধান তো আর খাওয়া যায় না, চালের দরকার— সেই লেগে ধানের সাথে এক বস্তা চালও আনলে।

সাঁঝবেলায় গাড়ি য্যাখন বাড়ির ছামনে এসে দাঁড়াইলে, আমার ননদ ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল আর বারে বারে বলতে

লাগল, বাছারা সব না খেয়ে আছে গো, এই কথা কাকে বলি? মানুষ নাই, এই সোংসারে মানুষ নাই! অ্যাকনো এই ভাইকেই হাতে ধরে খাওয়াইতে হবে সবাইকে!

ভাইকে জড়িয়ে ধরে এত কথা সে বলতে লাগলে বটে, ভাই কিন্তুক চুপ। আমি দেখলম কত্তা বুনকে একটো সান্ত্বনা দিলে না, পাথরের মতুন দাঁড়িয়ে থাকলে। তাই দেখে আমার নতুন করে ভয় লাগতে লাগল। বাড়ির ভেতরে যেয়ে দেখি, ভাইয়েরা সব যেমনকার তেমনি ঘোরাফেরা করছে, কারুর কুনো তাপ-উত্তাপ নাই, যেন কিছুই হয় নাই। ছেলেপুলেরা যি দু-দিন খায় নাই, তার সব দায় যেন একা কত্তার। বোধায় সবারই একটি হিশেব, মাঠ জুড়ে ইবার খুব ধান, কুনো পেরকারে তিন-চার মাস কাটাইতে পারলেই আর ভাবনা নাই। ত্যাকন আর অভাব হবে না।

ধান সব সাথে সাথে গাঁয়ের সেই বেধবা বুনদের বাড়িতে ভাঁচা দেওয়া হলো। কাঠ-কুটো জ্বালটও কিছু জোগাড় করে দেওয়া হলো তাদের। আর ভাবনা নাই, কদিন বাদেই আগন মাস পয্যন্ত খাবার মতুন চাল থাকবে বাড়িতে। রেতে কত্তা বললে, অনেক হীন হয়ে এই ধান আনতে হয়েছে আমাকে। কাছের কোনো গাঁয়ে যাই নাই আমি, চেনা মানুষের কাছেই গিয়েছিলাম, তবে দূরের এক গাঁয়ে।

দিলে ধান?

দিলে বৈ কি। আমি জানি চাইলেই দেবে। এমনি এমনি তো নোব না– মাঘ মাসের মধ্যে দেড়গুণ ধান ফেরত দিয়ে শোধ দোব।

এই ধানে ই কমাস আমাদের খুব চলে যাবে, খুব খুশি হয়ে আমি বললম, মাঠে লিকিন এবার ধান খুব, খামারে মরাইয়ের জায়গা হবে না।

তা হবে, সে হলে তো ভালোই।

কত্তার কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে তাকাই। আসলে ভয় ভয় করছিল বলেই খুশি হবার ভাব দেখাইছেলম। কত্তা কি তার সেই পিতিজ্ঞা ভোলে নাই। না, ভোলে নাই, কত্তার মুখ দেখেই বোঝলম

যে ভোলে নাই। ই সোংসার সে আর এক-ভাতে রাখবে না। শাশুড়ি নাই, কত্তাকে জোরের সাথে কথা বলার অ্যাকন আর কেউ নাই। এক উপায়, সব কটি ভাই যেদি তাদের বুনকে সাথে নিয়ে কত্তার কাছে এসে তাকে ধরে। কিন্তুক তাতেও দেরি হয়ে যেচে, উ মানুষের এমনি জেদ যি য্যাতো দিন যায় জেদ তার ত্যাতো বাড়ে আর ভেতরে যি রস-কষ আছে, সব শুকিয়ে যায়। তবে ইসব কথা ভেবে লাভ কি? কেউ তো এল না তার কাছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মাঠের ধানের দিকে চেয়ে সবাই নিজের নিজের হিশেব করছে। আমি যেমন ভাবছি, তেমন হিশেব সবাই না-ও করতে পারে কিন্তুক সোংসারে অ্যাকন শান্তি আর নাই। সবারই ভেতরে একটো রাগ তুষের আগুনের মতুন ধিকি ধিকি জ্বলছে আর জায়ে জায়ে যি আখেজ দেখছি তাতে রেষারেষির, কুনো ঢাকাচাপা নাই, সব সোমায় পেকাশ পেয়ে যেচে। দেখেশুনে ননদ আর কি করবে, মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াইছে। শুদু একটি ভয় তার জানটোকে কুরে কুরে খেচে। বড় ভাগ্নেটি অ্যাকন আর ইখানে থাকে না, শহরে চাকরি করে। সে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে গেয়েছে বলা যায়। ছোটটি অ্যাকনো ইখানে আছে, কিন্তুক ডামাডোলে সোংসার ভাঙলে সে কি আর ইখানে থাকবে, না তার বাপ চাচা তাকে ইখানে থাকতে দেবে? ত্যাকন বাঁচবে কি করে ননদ?

কত্তা আজকাল শহরে কমই যেছে। কথা খুব কম বলছে। সারাদিন বাড়িতেই থাকে, গাঁয়েও কারুর বাড়ি পেরায় যায় না। কত্তামার বাড়ি যাওয়াও কমতে কমতে অ্যাকন পেরায় বন্ধই হয়ে গেয়েছে। গাঁয়ের সেই আবস্তা তো আর নাই। মহামারী যুদ্ধ আর আকাল এসে সব লয়ছয় করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে মানুষ উপোস করেছে, অ্যাকনো করছে। রোগে, শোকে-তাপে, না খেয়ে কতো চেনা লোক যি দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে চলে গেয়েছে, তার সুমার নাই। কত্তামা, যি কিনা রাজার ভাগ্নি, তাদের না খেয়ে হয়তো থাকতে হয় নাই, তবে যুদ্ধ আর আকালের হাওয়া সি সোংসারেও যেয়ে লেগেছে। ইসব নিজের চোখে

দেখতে হবে বলে কত্তা যি কোথাও যায় না, তা আমি জানি। খামারের দিকে পরচালিতে একটো লোহার চেয়ারে সারাদিন সে বসে থাকে, কথা বলতে গেলেই কেমন খেঁকিয়ে ওঠে। সকাল দোপর রেতে দুটি খেয়ে আবার ঐ পরচালির চেয়ারে।

ভেতরে-বাইরে লক্ষ্মী ছেড়েছে। তিন-তিনবার গরু-মোষের কি একটো রোগ এল, ঝেঁটিয়ে গোয়াল খালি হয়ে গেল। চোখের ছামনে বড় বড় হেলে গরু, দুধেল তিনটো গাই, দু-জোড়া হাতির মতুন বড় বড় মোষ দেখতে দেখতে ছটফট করে মরে গেল। এমন দিন ত্যাকন এয়েছিল যি মনে হয়েছিল গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, মানুষজন কিছুই থাকবে না। অ্যাকন দেখছি কিছু কিছু টিকলে বটে, তবে সব যেন কেমন আড়া-আড়া ছাড়া-ছাড়া। শনি ঢুকেছে গেরস্থালিতে– সবাই যেন ডোকলা, সবাই যেন হাঘরে।

বাড়ির ভেতরে জায়েরা কিসের লেগে যি ইসব করছে কে জানে! এই টানছে, এই ছিঁড়ছে, মাটির ভাতের হাঁড়ি এমন করে চুলো থেকে নামাইছে, তাতে যি ভাঙছে না এই বড় ভাগ্যি। ঝন ঝন করে কাঁসার থালা ফেলছে, পেতলের ডেকচি, পানির ঘড়া দুম করে নামাইছে মেঝের ওপর, কাঁসার গেলাস ঠন ঠন করে গড়িয়ে পড়ছে উসারা থেকে এগ্‌নেয়। শাড়ি শায়াটো এমন করে টান দিচে যি কাপড় শুকনোর তারে লেগে ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে যেচে। কিন্তুক এত যে গামুস-গুমুস করছে, মুখে কুনো কথা নাই। বাড়ির ভেতরে বোদ-বাদারি ময়লা আবজ্জনা, ঘরে ঝাঁটপাট নাই, লেপামোছা নাই, সব জায়গায় চিমসে গন্ধ। ননদ-ও হাল ছেড়ে দিয়েছে, কে কখন আসছে, কখন যেচে, সি হিশেব সে আর রাখতে পারছে না।

বাইরে গোয়াল তিনটো পেরায় খালি। দলিজ ঘর খাঁ খাঁ করছে। কবে থেকে মানুষের আসা-যাওয়া নাই, খামার জুড়ে একহাঁটু ঘাস আর কন্টিকারির জঙ্গল। এইসব ছামনে নিয়ে কত্তা বসে থাকে, সে-ও যেন সব্বোনাশটোর লেগে অপিক্ষে করছে।

ইদিকে সারা গাঁয়ের মানুষ মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। য্যাতো দূরেই হোক পোষ মাস, তাকে তো শ্যাষ পয্যন্ত আসতেই হবে। ধান পাকছে, সোনার মতো রঙ ধরছে ধানে, কাঁচা সোনার রঙ এট্টু এট্টু করে ধানের গায়ে লাগছে। সারা মাঠ ভরা, দু-বছর বাদে কি ধানই না এবার হয়েছে! ঘরে বসে ভাবনা করতে করতেই গরম ভাত মনে মনে খাওয়া হয়ে যেচে। সেই আসবে, তাইলে এতকাল কোথা ছিল পোষ মাস!

অন্য অন্য বার কতো কথা বলে দ্যাওর-রা। ইবার সব মুখে কুলুপ এঁটে মাঠের কাজে নেমেছে। একটি কথা বলে না কেউ। ধান কাটা শুরু হয়ে গেয়েছে, আঁটি বাঁধা, ঢিপ দেওয়ার কাজও চলছে। তাপর একদিন শুরু হয়ে গেল ধান বওয়ার কাজ। দুটো মোষের গাড়ি ভোর থেকে সারাদিন ধান আনছে। মুনিষরা সারাদিন ধান পিটোইছে। আমি একবার একবার যেয়ে দেখি, ধান গাদা হচে, পিটনোর পাটার গায়ে ঠিক গাদা করা সোনার নোলক। ঐ থেকেই ধোঁয়া ওঠা কুঁদফুলের মতুন শাদা ভাত হবে। সেই ভাত থালায় থালায় ভরে ছেলেপুলেদের সামনে ধরে দেবে ননদ। ভাবনা এই পয্যন্ত যেই এল অমনি বুকের ভেতরটো কে যেন খামচে ধরলে। ছেলেপুলে কোথা পাব? সব তো আলেদা আলেদা ঘরে নিজের নিজের মায়ের হাতে খাবে।

তবে এইটি আমি জানি কত্তা যেদি নিজে থেকে কিছু না বলে, কারুর সাধ্যি নাই যি তাকে যেয়ে বলবে, আর দেরি করা ক্যানে, সোংসার পেথক করে দাও। না, সি সাধ্যি কারুর হবে না। অ্যাকন আবার কত্তাকে দেখে মনে হচে, সে বোধায় এইবারের মতুন নিজের পিতিজ্ঞে ভুলে গেল! আল্লা, তাই যেন হয়। কিন্তুক তাই কি হবে? হঠাৎ একদিন রেতে, কিছুই যেন হয় নাই, এমনি করে কত্তা বললে, ধার করে আনা ধানের চালে সংসার কতোদিন চলল, বলতে পারবে?

তা পেরায় চারমাস।

ঠিক করে বলতে হবে। এখনো চাল যা আছে, তাতে কতোদিন

চলবে?

কাল বুবুর সাথে যেয়ে দেখেছেলম, দশ-পনেরো দিন যেতে পারে আরও। মাঠের লতুন ধান ভাঁচা দেওয়া হয়েছে বুবু বললে। এমন হিশেব করে দেওয়া হয়েছে যি মজুত চাল শেষ হবার আগেই যেন বাড়ির নতুন চাল আসে।

শেষ হবার দু-একদিন আগে আমাকে বোলো।

ইকথা শুনে কত্তা আবার কি করবে? একবার ভাবলম বটে কথাটো নিয়ে, আবার ভুলেও গ্যালম। ই কথা কি কারুর মনে থাকে? কদিন বাদে যেই বলেছি বাড়ির পুরনো চালে আর দিন দুয়েক চলতে পারে, অমনি কত্তা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

তোমাকে বলেছিলাম না ঠিক করে জানাবে। দিনকতক, দু-দিন, তিনদিন আবার কি কথা। যাও, দেখে এসে আমাকে জানাও ঠিক কদিন যাবে।

কি করব, দেখে এসে বললম আবার, কাল আর পরশু এই দুদিন যাবে। ভাঁচা-বাড়ি থেকে কালকে লতুন চাল দিয়ে যাবে বলেছে।

কি আচ্চয্যি, ঠিক পরের দিনই সাঁঝবেলায় কত্তা উত্তর-দুয়োরি ঘরের উসারায় সব ভাইদের ডাকলে। ছোট দ্যাওর যি শহরে থাকে, তাকেও একদিনের মদ্যে খবর দিয়ে ডেকে আনলে।

সাঁঝবেলায় সারা বাড়ি থমথমে। একটো হেরিকেন জ্বালিয়ে তার চারপাশে ভাইরা সব বসেছে শেতলপাটির ওপর। কত্তা সব শ্যাষে বুনকেও ডেকে নিলে। তাপর আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করলে। সি কথা শোনা যায় কি যায় না, কান পাতলে তবে শোনা যায়। কিন্তুক পেত্যেকটি কথা পোষ্কার, একবারও থামছে না, একটানা বলে যেছে। ভাইরা ঘাড় নামিয়ে শুনছে। জায়েরা দেখলম নিজের নিজের ঘরের দরজার ছামনে দাঁড়িয়ে কথা শোনার চেষ্টা করছে, নোখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, আঙুলে কাপড়ের আঁচল জড়াইছে। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কত্তার কথা শুনছি। মানুষ কি এমন করে কথা বলতে পারে! গলার

আওয়াজে উঁচু-নিচু নাই, কথা হাতড়ানো নাই। এক জেবনের সব বলছে কত্তা। এমন করে বলছে যি মনে হচে কথা শ্যাষ হলে আর একটি কথা যোগও করতে হবে না, বাদও দিতে হবে না। বাপের মিত্যুর কথা থেকে বলতে শুরু করেছে— মা কেমন করে ছেলেপুলেগুলিনকে আগুলে রেখেছে, কেমন করে খাওয়া জুটেছে, মা সারাদিনের পরে ঝিকিমিকি সাঁঝবেলায় দোপরের ভাত খেতে বসেছে, কেমন করে রাত গেল, কেমন করে দিন গেল, মাস গেল, বছর হয়ে গেল।

এইসব কথা বলতে যেয়ে কত্তা মুটেই নিজের কথা সাতকাহন করে বললে না। শুদু ভালোদিন, মন্দদিনের কথা বললে, দু-বারের যুদ্ধুর কথা বললে, একবার বড় খোঁকার মিত্যুর কথা বললে। কিন্তুক তাতে তার গলা কাঁপল না। মায়ের মিত্যুর কথাও বললে অমনি করে। আকাল মহামারীর কথাও বললে। রাত বাড়ছে, সোমায় গড়িয়ে যেছে কিন্তুক মাঝখানে তাকে থামিয়ে কারুর একটি কথা বলবার জো নাই। ভাইরা বসে আছে আর আমরা বউরা সেই যি দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি।

সব কথা বলা হয়ে যাবার পরে কত্তা ঐ একইরকম গলায় খুব কঠিন কঠিন কথা বলতে লাগল। রাগ করে লয় বটে, তবে সি বড় কঠিন কথা। তার আসল কথাটো হচে, বেপদ মসিবতের সাগর পেরিয়ে আসা হয়েছে, অ্যাকন সবারই নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলেদা সোংসার চালানোর ক্ষমতাও হয়েছে। নিজের সোংসার ছেলেপুলে নিজেই চালাইতে চায় সবাই, আর মোট একজনা চালাইলে কিংবা সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে চালিয়ে দিলে ভালো লাগে না। কত্তা খুব ভালোমুখে বললে, এক-এক জন এক-এক ভাবে চলতে চায়, এক-এক পথে ছেলেপুলে মানুষ করতে চায়, একান্নবর্তী পরিবারে তা সম্ভব হয় না। সেইজন্যে যুক্তি পরামর্শ করে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। সবাই যেটা মনে মনে চাইছে, সেটাই করার জন্যে আজ আমি সবাইকে ডেকেছি।

আমরা তো কেউ সংসার ভাঙতে চাই নাই।

তুই নিজের কথা বল্। আর কেউ কি চেয়েছে না চেয়েছে সে সেই-ই বলবে।

আমি সংসার পৃথক করতে চাই নাই।

আমি দেখলম, সত্যি যে সোংসার ভাঙতে চায় নাই, আমার ভাশুর— সে এইকথা বললে না, বললে আর একজনা। আমি জানি ছোট দ্যাওর-ও মন থেকে আলেদা হতে চায় নাই, কিন্তুক সিকথা তার বলার সাওস নাই, একদিষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে ছোটবউ।

এই কথাটি আমি যেন আর একবার কারুর মুখ থেকে না শুনি। মিছে কথা আমি ঘেন্না করি। কে কি ভাবে সেকথা আমি তার নিজের চাইতেও ভালো জানি।

কত্তা আরও কি কি কথা বলতে যেছিল, এই সোমায়, আমার ভাশুর একেবারে কচি শিশুর মতুন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সেই কান্না শুনে কত্তাকে চুপ করতে হলো। ভাশুর ত্যাকন দু-হাতে কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়ছে আর মুখে খালি এক কথা, হায় হায় ই কি হলো, হায় হায় ই কি হলো। ঘাড় পেরায় মাটিতে ঠেকিয়ে ভাইরা সবাই চুপ করে থাকলে। কত্তাও দেখলম ঘাড় নামিয়ে রয়েছে।

খানিক বাদে ভাশুর থামলে কত্তা আবার ঠিক আগের মতুন গলায় বললে, যুদ্ধ চলছে সারা দুনিয়ায়, এখনো শেষ হয় নাই যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ একরকম করে পার হয়ে এইছি। দুর্ভিক্ষ আকাল মারী কিছুই ভেদ করতে পারে নাই এই সংসারের। কতো সংসার ছারখার হয়ে গেল, কতো মানুষ দুনিয়া ছেড়ে গেল, আমাদের কিছু হয় নাই। আর কিছু নয়, বাড়ির ছোটরা যেদিন না খেয়ে উপোস করে দিন কাটালে, আমার মাথায় বাজ পড়ল না, তাদের বাপ-চাচাদের মাথাতেও বাজ পড়ল না। পড়া উচিত ছিল, সংসার ভাঙার জন্যে যে বাপ-চাচারা ছেলেমেয়েদের উপোস করিয়ে অপেক্ষা করতে পারে তাদের মরাই ভালো। সেইদিনই আমি ঠিক করেছি, সকলের মনোবাঞ্ছা আমি পূরণ

করব। মানুষ না হয়ে স্ত্রৈণ হয়েছে যে পুরুষমানুষ তার আর এক সংসারে থাকার কোনো দরকার নাই।

কত্তা এই তো দিলে নিদেন হেঁকে। সে চুপ করলে দেখলম বাকি সবাই মাথা হ্যাঁট করে চুপ করে থাকলে। গলা নামোয় নিয়ে যেয়ে ঐ যি কথা কটি সে বললে, কেউ আর তার কুনো উত্তর করতে পারলে না।

ত্যাকন কত্তাই আবার সহজ গলায় বললে, মন খারাপ করার কি দরকার? যা হবার তাই হচ্ছে। ঝগড়া-ফ্যাসাদ আমরা কেউ করছি না। আর এক দিক থেকে বলি, নিজের মতন করে, নিজের হাতে সংসার করতে ইচ্ছে সবারই করে, সব সময় ঘাড়ে একটি কর্তার ভূত থাকা কি ভালো? সংসার বেশি বড় হয়ে গেলে গোলমাল বিশৃঙ্খলা হয়। তাতে ছেলেমেয়েদেরও ওপর অবিচার হয়।

কত্তার এই কথার পরে বাতাস যেন অ্যানেকটো হাল্‌কা হয়ে এল। সবাই সহজ সুরে কথা বলতে লাগল। সোংসার ভালো করে চালাবার লেগে যেমন করে কথা বলে, সোংসার পেথক্ করার লেগে অ্যাকন তেমনি করেই সবাই জমি-সোম্পত্তি নিয়ে কথা বলতে লাগল। সবকিছুর ভালোটা কত্তার ভাগে দেবার লেগে ভাইদের সি কি ঝুলোঝুলি! একমাত্তর ভাশুর শুদু চুপ করে থাকলে।

বাড়িতে যে যেমন থাকে, ছেলেমেয়ে নিয়ে যে যে-ঘরে থাকে, আগের সেই বেবস্তাই বাহাল রইল। রাঁধা-বাড়ার লেগে যি চালাটো ছিল সিটি বেশ বড়ই। সি-টি আর অ্যাকন ভাগ হলো না শুদু পেয়োজন মতুন আরও কটো চুলো তৈরি করে নেওয়ার কথা বলা হলো। জমি-সোম্পত্তি ল-দ্যাওরের ঠোঁটস্থ, সে-ই মুখে মুখে কোথা কি আছে বলতে লাগল। গরু মোষ ছাগল কুনো হিশেবই তার জানা বাকি নাই। সে বলতে লাগল আর মুখে মুখেই সব ভাগ হতে লাগল। কতক সরেস জমি কত্তাকে দেবার লেগে কে যেন পেস্তাব দিলে, কত্তা আবার একবার ধমকিয়ে উঠল কিন্তুক আমার দাদির দেওয়া জমিটো যা এতদিন এজমালিতে খাওয়া হছিল, সেই জমিটো য্যাকন আবার

আমাদের ভাগে দেবার কথা হলো, ত্যাকন কত্তা বেশি আপত্তি করতে পারলে না। জমি তো তার লয়, সে আপত্তি করবে কি করে? জমি আমার। মনে পড়তে লাগল, একদিন এই জমির ধান আলাদা করে মরাই বেঁধে রেখে ল-দ্যাওর বলেছিল, এ মরাই তোমারই রইল। আমি তাতে রাজি হই নাই। আজ আমাকে রাজি হতে হচে। একবার মনে করলম, যাই, ঐ পুরুষমানুষদের যেয়ে বলি, ই জমি আমার বটে, তবে ই আমি একা নোব না, সবার ভেতরে ভাগ হোক ই জমি। ভাবলম বটে, তবে সি যি কি অসোম্ভাব তাও সাথে সাথে বুঝতে পারলম। সোয়ামির কথা ছাড়া জমি ক্যানে একটি পয়সাও কাউকে দেবার আমার এক্তিয়ার নাই। ল-দ্যাওরের দিকে চেয়ে দেখলম। তার কিছুই মনে নাই, সে হেসে হেসে ই জমি যি আমার, কেনার পর থেকেই আমার সেই কথাটোই বারে বারে বলছে।

সব বিলি-বেবস্থা য্যাকন হয়ে গেল, কত্তা বললে, দলিল সব আমার কাছে, যার যেমন জমি ভাগে পড়েছে সেইরকম সব দলিল আমি পরে সবাইকে বুঝিয়ে দোব। নিজের নিজের দলিল নিজের কাছেই রাখতে হবে।

কথাবার্তা শ্যাষ করে সবাই উঠতে যেছে, এমন সোমায় আমার ননদ ভাইদের কাছে বসে পা ছড়িয়ে মড়াকান্না কাঁদতে শুরু করলে। সি এমনি কাঁদন যি তাতে একটি কথা নাই, তা শুদুই কাঁদা, তা শুনলে পাষাণও ফেটে যায়। অ্যানেকক্ষণ কেঁদে সে এইবার ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বললে, আমার জমি আমাকে দিয়ে তোমরা আমার সব কেড়ে নিলে। জমি নিয়ে আমি কি করব? আমার কবরের লেগেও তো উ জমি লাগবে না। উসব না করে আমাকে বরঞ্চ তোমরা মেরে ফেলো। এই কথা বলে আবার চুল ছিঁড়তে লাগল ননদ।

কত্তা শুদু বললে, কাঁদিস না, তুই একা মানুষ, তোর আবার ভাবনা কি? এখন তোর একার একটি বাড়ি নয়, সব ভাইয়ের বাড়িই তোর বাড়ি।

এই পেথম মনে হলো কত্তা মন-রাখা কথা বললে।

ভাগ-জোগের কথা শ্যাষ হতে হতে সিদিন রাতদোপর পেরিয়ে গেয়েছিল। মাঝে একবার থেমে রাতদোপরের পরে সবাই রেতের খাবার খেয়ে নিলে। সবকিছু গরম করে আমরা বউ-ঝিরা পুরুষদের খাওয়ালম। সব ভাই মিলে মনে হয় এই পেথম আর শ্যাষবারের মতুন একসাথে বসে খেলে। পেথমবার বলছি এইজন্যে যি আমি অন্তত ই সোংসারে আসার পর থেকে পাঁচ ভাইকে একসাথে খেতে দেখি নাই। কত্তা বরাবর নিজের ঘরে আলেদা একা খায়। ভাশুরের সাথে কুনো কুনো ভাইকে কিম্বা ল আর ছোট দ্যাওরকে একসাথে কখনো কখনো খেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে কিন্তুক পাঁচজনাকে একসাথে কখনো দেখি নাই। আর শ্যাষবারের লেগে বলছি, অনুমান যি, আর কি কুনোদিন তাদের একসাথে খেতে দেখতে পাব? সোংসার ভাঙার লেগে জড়ো হয়েছে বলে বাধ্য হয়ে তারা আজ একসাথে বসে খেচে, সোংসার জোড়া দেবার লেগে নয়।

ঐ রেতেই যেমন যেমন কথা হলো সেইভাবেই সব ভাগ হলো, ঝগড়াঝাঁটি হলো না, পাড়াপড়শি, গাঁয়ের লোকদের ডাকতে হলো না। তবে সব ঠিকঠাক হতে, আলেদা আলেদা হাঁড়ি হতে দিনকতক সময় গেল। বুকে পাষাণ বেঁধে চুপচাপ নিজের কাজ করতে লাগলম। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার জো নাই, কিছুই বদলাইল না, যে যেমন ছিল তেমনি থাকলে, শুদু ছেলেপুলেগুলি নিজের নিজের মায়ের কাছে খেতে লাগল।

আমি জানি কি সব্বোনাশ ই সোংসারের হয়েছে। মুখে কারুর একটি বাক্যি নাই। সবাই ঘুরে বেড়াইছে ঠিক যেন মড়া, ধড়ে জান নাই, মুখে হাসি নাই। ছেলেমেয়ের মুখে জ্যোতি নাই, রা-কথা নাই। কি চেল্লাচিল্লি, হাঁকাহাঁকি, মারামারি ছিল ই সোংসারের ছেলেমেয়েদের মদ্যে– অ্যাকন তার কিছু নাই। ননদকে আজ কদিন থেকে দেখতে পাওয়াই যেচে না। নিজের ঘরটিতে– যে ঘরে বড় খোঁকা মরেছিল,

গিন্নি মরেছিল— সেই ঘরে আঁদারের মদ্যে দিনরাত বসে আছে। তার বুনপো, আমাদের ছোট ভাগ্নেটি আজ কদিন হলো নিজের বাড়িতে গেয়েছে, আর বোধায় ফিরবে না। বড় হয়েছে, হয় স্কুলপাশ দিয়ে শহরে পড়তে যাবে, নয় নিজের বাড়িতে বাপ-চাচার কাছে ফিরে যাবে। কথা অ্যাকনো হয় নাই, তবে ননদ ঠিক বুঝে গেয়েছে যি পাখি আর বেশি দিন থাকবে না। আমার ছেলেটি কবে থেকে শহরে পড়ছে কলেজে, বাড়ি পেরায় আসেই না। মেয়েটো-ও শহরের মেয়ে-স্কুলে ভত্তি হয়েছে, থাকে তার মামুর কাছে, আমার সেই মায়ের প্যাটের ভাইটির কাছে। তবে খুকি ঘন ঘন বাড়িতে আসে। বাইরের ঘরটিতে আগের মতুনই আমি ছোট ছেলেদুটিকে নিয়ে থাকি। ওখানে একবার ঢুকে গেলে বাড়ির আর কুনোকিছু আমাকে দেখতে হয় না। কত্তা ঠিক আগের মতুন পরচালিতে লোহার চেয়ারে পিঠ লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। কি ভাবে সেই জানে।

খামারে একটোর পর একটো মরাই বাঁধা হতে লাগল। একদিন দু-দিন পরে পরে মুখে গামছা জড়িয়ে মুনিষরা সব মরাইয়ে ধান তোলে। কেমন রাবণের মতুন মুখ ফুলিয়ে গোমড়ামুখে কাজের দেখাশোনা করে ল-দ্যাওর। এক-একটো মরাই যিদিন শ্যাষ হয়, সিদিন যার মরাই সে মুনিষদের চিতুই পিঠে না হয় ধুকি খাওয়ায়। আগের মতুন আট-নটো মরাই দেখে খুশিতে ডগোমগো হয় না কেউ। খামার ভরে মরাই তেমনিই আছে বটে, কিন্তুক কুনো ভাইয়ের একটি, কুনো ভাইয়ের দেড়টি মরাই, তা দেখে একা একা আর কতো খুশি হবে?

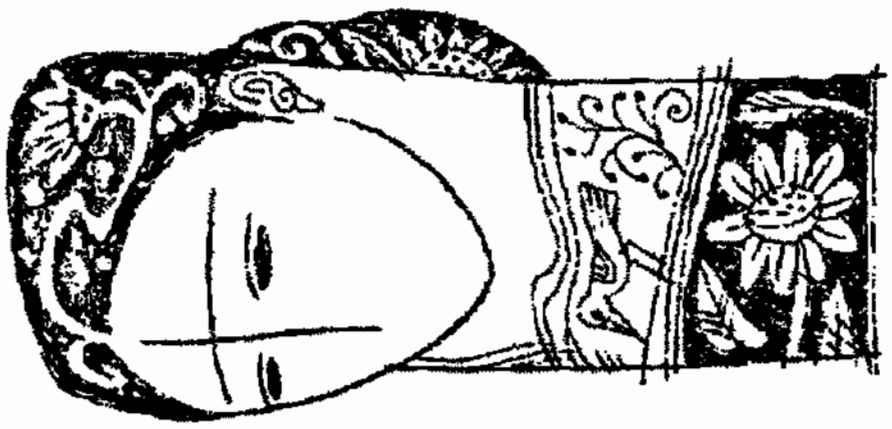

এত খুন, এত লউ, মানুষ মানুষের কাছে আসছে খুন করার লেগে

একদিন দোপরবেলায় চুলো থেকে উজ্জ্বলন্ত ভাতের হাঁড়িটি খালি নামিয়েছি, এমন সোমায় খবর প্যালম রায়েদের বড় ছেলে সত্য কলকেতায় হিঁদু-মোসলমানের হিড়িকে কাটা পড়েছে। পেথম ই কথার কুনো মানে বুঝতে পারলম না। কাটা পড়েছে আবার কি? বাসে চাপা পড়ে, টেরেনে কাটা পড়ে, কলকেতায় মানুষ কাটা পড়েছে মানে কি? মানুষ কি কদু-কুমড়ো যি বঁটির ছামনে ধরলম আর ঘ্যাঁস করে কেটে ফেললম। সবাইকে আমি শুদুই, হ্যাঁগো হিঁদু-মোসলমানের দাঙ্গা আবার ক্যানে শুরু হলো। ই কথার জবাব আর কে দেবে? সবাই তো আমারই মতুন, কথা শুনে হাঁ হয়ে আছে। ঐ রায়েরা, এককালে য্যাতো বড়লোকই থাক, আজ তারা ভিখিরি। ছোটরায় দাদঅয়লা পেট বার করে, গলায় কালো-কিটকিটে পৈতে ঝুলিয়ে খালিগায়ে কাপড়ের একটো ঝোলা নিয়ে পেত্যেকদিন ভিক্ষে করতে বের হয়। তা তার মনে খুব দয়া যি সি ই গাঁয়ে ভিখ্ করে না! যেদি করত, তাইলে ই গাঁয়ের ভদ্দরলোকদের মুখে জুতো পড়ত। সে ভিখ্ করে ভিন গাঁয়ে। কঠিন গরমের দিনে, তেতে পুড়ে কিম্বা ঝড়-বাদলে কাক ভেজা হয়ে ভিক্ষার চাল কটা এনে বামুন-গিন্নির হাতে দেয় তবে চুলো ধরে, দুটো ভাত ছেলেমেয়েদের মুখে ওঠে। ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েদের বিয়ে হয় নাই, দুটি ছেলে ইস্কুলে যায় আবার যায়ও না। শুদু বড় ছেলেটিই কলকেতায় যেয়ে কার বাড়িতে রাঁদুনি হয়েছে, না মুদির দোকানে মাল ওজন করে— সে দু-চার টাকা সোংসারে পাঠায় তবে এতগুলিন মানুষ বেঁচে আছে। সেই সত্য আবার কলকেতায় কি করলে, কার ক্ষেতি করলে যি খচাৎ করে তার মাথাটো কেটে ফেলতে হলো! তার না হয় কল্লা গেল, এইবারে যি তার বাড়ির এতগুলিন মানুষ না খেয়ে মরে যাবে! ছোটরায়ের সাধ্যি নাই যি এতগুলিন পেরানিকে সে

পেরানে বাঁচায়। ছেলেটোকে আমি চেনতম, আমার অ্যাকনকার বড় খোঁকার বয়েসি, দু-একবার তাকে দেখেছি বড় খোঁকার সাথে। সে এমনি ভালো মানুষ যি একটো পিঁপড়ে মারারও ক্ষমতা নাই তার। আমাকে কেটে ফেললেও বিশ্বেস করতে পারব না যি সে কাউকে মারতে গেয়েছে। সত্যর মায়ের, রায়েদের ছোট গিন্নির মুখটো আমার মনে পড়তে লাগল। দু-একবার দেখেছি। ফরশা টুকটুকে বউমানুষটি ময়লা চেকট ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকে। মাজা সোনার মতুন তার খোলা গা বেরিয়ে পড়ে। সেই মানুষের কপালে এমন পুত্রশোক লেখা ছিল! হায় হায়!

সবাই বলতে লাগল নেড়ে মোসলমানরা তাকে মেরেছে। তাই হবে, হিঁদু-মোসলমানে হিড়িক মানেই হচে হিঁদুকে মোসলমান মারবে, মোসলমানে হিঁদু মারবে। আর কিছু দেখাদেখি নাই, পাঁচজনা হিঁদু কলকেতার রাস্তায় একটো মোসলমানকে একা বাগে পেলে তো পিটিয়ে কিম্বা ছোরা ঢুকিয়ে মেরে ফেললে আবার পাঁচজনা মোসলমান একটো হিঁদু দেখতে পেলে কি চিনুক না চিনুক, কিছু করুক না করুক, তাকে তরোয়াল নাইলে টাংগি, নাইলে যা দিয়েই হোক মেরে ফেললে!

বাঃ ভালো! এইবার এই গাঁয়ের হিঁদুরা বলছে সত্যকে মেরেছে মোসলমানরা। তাইলে বিশ্বভোবনের মোসলমানরা বিশ্বভোবনের হিঁদুদের শত্তুর। তাই যেদি হয়, তাইলে ই গাঁয়ের মতুন যেখানে য্যাতো হিঁদু-মোসলমানের গাঁ আছে, সব জায়গাতেই কি দাঙ্গা শুরু হবে? কি অস্থির যি লাগতে লাগল আমার! কত্তা কি এই নিয়ে আমাকে দুটো কথা বলবে না?

আমাদের এই বেরাট গাঁয়ে মাত্তর বিশ ঘর মোসলমান। ছানাপোনা নিয়ে একশোটো লোক হবে কিনা সন্দ। হিঁদু খুব কম করেও পাঁচশো ঘর। আশেপাশের গাঁগুলিনও মোটামুটি হিঁদু-গাঁ। এই কথা কুনোদিন মনে হয় নাই। ক্যানে মনে হবে? মানুষ আপনমনে বাস করছে।

নিজের নিজের পেরান, ছেলেমেয়ে সোংসার নিয়ে হাবু-সোঁটা খেতে হচে সবাইকে। হিঁদু-মোসলমান আবার কি? কুনোদিন মনেও করি নাই যি ই নিয়ে আবার ভাব্না করতে হবে! মনে তো অ্যাকনো করতে চাই না— কিন্তু খালি যি মনের ভেতর আগা লিছে, যেদি ই গাঁয়ে দাঙ্গা লাগে তাইলে এই কটি মোসলমান তো এক লাপটেই মারা পড়বে। সাথে সাথে মনে হলো, মনে পাপ ঢুকেছে তাই এই কথা মনে হচে। ভাবো দিকিনি কত্তা কাটতে যাবে কত্তামাকে! নাপিত বউয়ের স্বামী, নাইলে হলা বাগদির বাপ খুন করতে আসবে আমার ছেলেদুটিকে।

গত কবছর থেকে খালি শুনছি, মোসলমানদের আলেদা একটো দ্যাশের লেগে আন্দোলন হচে, বিটিশদের সাথে খুব দেন-দরবার চলছে। কত্তা খালি তাড়া দিত আর নতিজা করত বলে গত কবছর 'বঙ্গবাসী' কাগজটো এট্টু এট্টু পড়তে চেষ্টা করতম। ত্যাকন থেকেই জেনে আসছি, মোসলমানদের লেগে একটো আলেদা দ্যাশ করার বন্দোবস্ত হচে। কত্তা আর আগের মতুন পেরায় পেত্যেকদিন শহরে যায় না, পেসিডেন্টগিরি যাবার পর থেকে বাড়িতেই থাকে বেশির ভাগ দিন। তাপরে এমন যি আকাল গেল, বুকে হেঁটো ঠেকিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে কুনো পেরকারে সেই পুলসোরাত পার হতে হয়েছে, শহরগঞ্জে যেতে ভয়ই লাগত মানুষের। তা ত্যাকন কত্তা বাড়িতে বসে বসে আর কি করবে, কাগজ-মাগজ পড়ত আর মন-মর্জি ভালো থাকলে দ্যাশ দুনিয়া নিয়ে আমাকে কখনো কখনো দু-চার কথা বলত। যে করে হোক আকালটো মোটামুটি মানুষ সামলাইলে, দুবার ফসল যাওয়ার পরে, তিতিয় বছর খুব ধান হলো। গবরমেন্টের সাধ্যি হলো না, চোরা-কারবারিদেরও লিকিন খ্যামতা হলো না যি আকালটো আর কিছুদিন চালিয়ে যায়। ইদিকে যুদ্ধুর ত্যাজও মরতে মরতে গত বছর বর্ষাকালের গোড়ায় সারা পিথিমির যুদ্ধু বন্ধ হয়েছে। কিন্তুক মোসলমানদের লেগে আলেদা একটো দ্যাশের কথা ক-বছর থেকেই

শুনে আসছি। ই নিয়ে কতো কথা থাকে কাগজে, কত্তাও অ্যানেক কথা বলে এই নিয়ে। সব কি আর বুঝতে পারি? কাগজে অ্যানেক মজার মজার নাম পড়ি, আবার সিসব নাম ভুলেও যাই। কিন্তুক কতকগুলিন আর ভুলতে পারি না। এক সময় খালি পড়তম শ্যামা-হক এই নাম। বুঝতে পারতম না ই একটো লোকের নাম, না দুটি লোকের নাম। কত্তাকে শুদুইলে বললে, না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। দুটি মানুষের নাম তাও বুঝতে পারলে না? শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে আর শেরে বাংলা ফজলুল হক। মন্ত্রীদের একটি সভা আছে, তাদের পরামর্শে আর ব্রিটিশদের চোখ-রাঙানি সয়ে এই দুজনেই এখন দেশ চালাচ্ছে।

কবে বলেছিল কত্তা এই কথা। তাপর কাগজেও পড়েছেলম, কত্তা-ও বললে ঐ সভা ভেঙে গেয়েছে। উদের ক্ষমতা শ্যাষ। অ্যাকন খাঁটি মোসলমানদের শাসন চলবে। সে-ও ক-বছর হয়ে গেল। তার পর থেকেই শুনছি মোসলমানদের আলেদা একটো দ্যাশের লেগে খুব আন্দোলন চলছে, সি লিকিনি না করে ছাড়বে না। আর পড়তে লাগলম, শুনতেও লাগলম কটি নাম– জিন্না, নেহেরু, গান্ধি, প্যাটেল। এমন নাম তো জেবনে শুনি নাই, কিছুতেই মনে থাকত না যেদি হাটে মাঠে ঘরে বাইরে সব সোমায় এই নামগুলিন না শুনতে পাওয়া যেত। আরও পড়লম নাজিমুদ্দীন, লেয়াকত আলী, সোরাবর্দী, আবুল হাশিমের নাম। আবুল হাশিমের নাম খুব দেখতে প্যাতম। ঐ নামটি ভুলি নাই। একে তো মোসলমানদের নেতা, তাপর তার দ্যাশের বাড়ি আমার বাপের বাড়ির খুব কাছে, দু-তিনকোশের মদ্যেই।

সি যাকগো, কথা তা লয়। দাঙ্গার কথাটো বলতে যেয়েই এত কথা। মোসলমানদের আলেদা দ্যাশ পাকিস্তানের কথা হতে হতে এমনি শোরগোল হতে লাগল সি আর কান পাতা যায় না। শ্যাষের দিকে খালি বলে, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়কে তো লেঙ্গে, কিন্তুক নিয়ে করেঙ্গেটা কি? কোথা পাকিস্তান হবে জানিস? তু যাবি সেখানে?

কত্তাও দেখি মাঝে মাঝে খুব রাগ করছে। মোসলমানদের আলেদা দ্যাশের কথা তো সেই আকালের সোমায় থেকেই শুনে আসছি। ত্যাকন এক কান দিয়ে ঢুকত আর এক কান দিয়ে বেরুইত। বলে, মানুষের প্যাটে-পিঠে সেঁটে গেয়েছে, পরনে ত্যানা নাই, লতাপাতা, শামুক, গুগুলি খেয়েও লোকে বাঁচতে পারছে না, শেয়াল-কুকুরের জেবন হয়েছে মানুষের আর তারই মধ্যে আবার মোসলমানদের আলেদা অ্যাকটো দ্যাশের কথা! কে তাতে কান দেবে? কিন্তুক কান দেবার লোক আছে বইকি! যাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তা নাই, খাওয়া-পরার চিন্তা নাই, তারা তো গরিব মানুষের লেগে ঘরে বসে মাহা মাহা চিন্তা করতেই পারে।

যাই হোক সিসব কথায় ত্যাকন লোক কান দেয় নাই। কিন্তুক কথাটো গেল না, জিটিবিটি করে ধরে থাকল। আকাল গেল, যুদ্ধু গেল, পাকিস্তানের কথা আবার ফিরে এল। আগে আগে কত্তা বলত, পাকিস্তানের বাতিকটা বোধ হয় গেল। লোক দেখানো হোক, যাই হোক, ব্রিটিশ চেষ্টা করছে হিন্দুদের গান্ধি, নেহেরু, প্যাটেল আর মুসলমানদের নেতা জিন্নার সাথে বসে একটা পথ বার করতে, যাতে দেশটাকে আর ভাগ করতে না হয়। আবার কদিন বাদে হয়তো এসে বললে, নাঃ হলো না, একটা দক্ষযজ্ঞ মনে হচ্ছে হবেই, এবার জিন্না রাজি না। কদিন পরে ফের বললে, এবার নেহেরু রাজি হলো না। এই করতে করতে একদিন মাহা বিরক্ত হয়ে এসে বললে, এই জিন্না লোকটা একটা দিন জেল খাটলে না, একটা দিন উপোস করলে না গান্ধির মতো, মুসলমানের কিছুই নাই তার, জামাকাপড় আগে পরত সাহেবদের মতো, এখন মুসলমানদের নেতা হয়েছে, শেরওয়ানি পরে, মাথায় পরে তার নিজের কায়দার টুপি।

অত রাগ করছ ক্যানে? আমি এট্টু অবাক হয়ে শুদুই।

রাগ হবে না? সারা দেশের মানুষ কি চায়, না চায়, তার খবর নিতে হবে না? কাগজ-কলম নিয়ে শুধু ঘরে বসে আঁক কষলেই হবে।

আমাকে এট্টু বুঝিয়ে বলো দিকিনি। আঁক কষা আবার কি?

কোথা ভারতের স্বাধীনতা তার কোনো খবর নাই। আঙুলটা পর্যন্ত কোনোদিন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তোলে নাই আর যখুনি এই দেশের স্বাধীনতা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবার অবস্থা ব্রিটিশের, দিশেহারা অবস্থা, তখুনি সে বলছে মুসলমানদের আলাদা দেশ দিতে হবে। আবার প্যাটেল-ম্যাটেল কটা হিন্দু নেতা আছে যারা হিন্দু-মুসলমান দুই দুই না করে কোনো কথা ভাবতেও পারে না।

কত্তা কথাগুলো এমন করে বলছিল যেন নিজের সাথে নিজে কথা বলছে। সেই লেগে আমি একটু চেঁচিয়ে বললম, আহা, ঘরে বসে কাগজ-কলমের কথা কি বলছিলে সেই কথাটি পোষ্কার করে বলো।

ও, কাগজ কলম– কত্তা হাসলে, যাদের জন্যে এইসব কথা, তাদের কাছে না এসে ঘরে বসে চিঠি চালাচালি করা, খবরের কাগজে একগাদা কথা ছাপানো, এইসব করেই বাজিমাত করার কথা বলছিলাম রাগ করে। স্বাধীনতার জন্যে একটা আন্দোলন হচ্ছে, আবার সেই আন্দোলনের পেটের ভেতর মুসলমানদের জন্যে একটা আলাদা দেশের আন্দোলনও হচ্ছে। ডালে-চালে মিশে যাচ্ছে না?

আমি আজ শুনব। মোসলমানদের আলেদা দ্যাশ ঠিক কি কথা?

আচ্ছা, ঠিক আছে শোনো। আমি নিজেও যে খুব বুঝি তা নয়। কোনো কিছুর সঙ্গে এখন আর আমি নাই। খবরের কাগজ-টাগজ পড়ে যা বুঝি তাই বলছি।

আগে বলো, মোসলমানদের দ্যাশ যি বলছ, সেই দ্যাশ হলে সব মোসলমান সিখানে বাস করবে? কেউ তার বাইরে থাকবে না?

আর দূর, তাই কখনো হয় নাকি? সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের কতো দেশ আছে জানো? কতো পোশাক, কতো ভাষা, কতো জাত– তার কোনো অন্ত আছে নাকি! একটিমাত্র দেশে তাদের সবারই থাকার কোনো জায়গা নাই। আমাদের এই ভারতেই কতো দেশ! কতো

কিসিমের মুসলমান এই বিরাট দেশে আছে কেউ জানে? ওভাবে এক দেশে সব মুসলমানকে রাখার কথা হয় নাই। এই বাঙালি হিঁদু-মোসলমানের মধ্যেই কতো মুসলমান আছে, সবাইকে একটা আলাদা দেশে রাখতে পারবে কেউ?

তবে? আলেদা দ্যাশের কথা ক্যানে? আমাদের এই দ্যাশের মোসলমানকেই যেদি একটা দ্যাশের মদ্যে রাখতে না পারে তাইলে উকথা হচে ক্যানে?

আমার এই কথায় কত্তা যেন একটু থমকে গেল। কিন্তুক উ কি থামবার মানুষ? বললে, প্রথমে কথা হয়েছিল, সারা দেশে যেখানে যেখানে মুসলমান অন্য জাতের চেয়ে বেশি বাস করে, সেই সব জায়গা নিয়ে বেশ ক'টা আলাদা দেশ হবে। তারপর সেকথা উড়ে গেল, ব্রিটিশরা বললে দেশ ভাগ কোরো না, বরঞ্চ তিনটে খণ্ড করে এক দেশের মধ্যেই সবাই থাকো। সে কথাটিও আবার নেহেরু প্যাটেল হিন্দু নেতাদের পছন্দ হলো না। এখন জিন্না খেপেছে, কোনো কথা নয়, পাকিস্তান বলে একটি আলাদা মুসলমানদের দেশ চাই।

এতক্ষণ ধরে কত্তা যেসব কথা বলছিল, মনে হছিল তা অন্য কুনো ভাবের কথা– তার একটি বন্ন বুঝতে পারছেলম না। খুব চেষ্টা করলম বুঝতে কিন্তুক কি বুঝব, দুনিয়ার কি কিছু জানি? কোথা কোথা মোসলমান থাকে, এই দ্যাশেই বা কোথা কোথা তারা থাকে, কি খায়, কি মাখে, কি পরে, কেমন করে কথা বলে, কি ভাষায় কথা বলে, কি তাদের স্বভাব-চরিত্তির ইসব কিছুই জানি না। বোঝলম ই নিয়ে কথা বলা আমার ঠিক হবে না, তবে এই কথাটো খুব মনে হছিল যি ইসব কথার সাথে হিঁদু-মোসলমান সোংসারি মানুষের কুনো সম্পক্ক নাই। আর নাই য্যাকন, ত্যাকন আমি মাথা ঘামাইতে যাই ক্যানে! তবে খালি মনে হতে লাগল মোসলমানের দ্যাশ হবে অথচ সব মোসলমান সিখানে থাকবে না, এমনও হতে পারে যি আমি থাকব কিন্তুক আমার সোয়ামি ছেলেমেয়ে থাকবে না। তাই যেদি হয় তাইলে

ই কাজ করতে যেয়ে হিঁদু-মোসলমান সম্পক্ককে বিষ বিষ করতে হবে ক্যানে?

কত্তার সাথে এই নিয়ে আর কুনোদিন কথা বলতে চাই নাই। কিন্তুক মনে হয় তারও বুকের ভেতরে ঝড় বইছিল। অ্যাকন তো আর বুঝতে কিছু বাকি নাই। মাঘ-ফাগুনে কত্তা একদিন বললে, একটো নিব্বাচন হবে। কঠিন নিব্বাচন, এমন নিব্বাচন লিকিনি আর কুনোদিন হয় নাই। এই নিব্বাচনে ঠিক হবে মুসলমানরা তাদের আলেদা দ্যাশ পাকিস্তান চায় কি চায় না।

কত্তার সেই কথার পরে, উঃ, এই অজ পাড়াগাঁয়েও যি কি জগঝম্প বাজতে লাগল! বাড়িতে থাকি, তাও কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কদিন এগু যুদ্ধু শ্যাষ হয়েছে, অ্যাকন শুরু হলো আর এক মাহাযুদ্ধু। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান রব করছে মোসলমানরা। পাকিস্তান চাইদের দলে দাঁড়াইলে আবুল হাশিম, আর বোধায় পাকিস্তান চাই-না-র দলে দাঁড়াইলে সে-ও একজনা মোসলমান। তার নামটো মনে ছিল, অ্যাকন ভুলে যেচি– মনে হচে তার নাম ছিল ছাত্তার।

আমরা আর ভোট দিতে যাই নাই। কত্তাকে শুদুইলে সে কিছুতেই রা কাড়লে না। ভাবে মনে হলো আবুল হাশিম পাকিস্তান-অয়লাকেই ভোট দিয়েছে।

এর পরে আর ছটো মাসও কাটল না। হিঁদু-মোসলমানে লেগে গেল হিড়িক। কে যি লাগাইলে, ক্যানে যি লাগাইলে সিকথা বলতে পারব না। কোথা কুন্ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি দুনিয়ার কুন্ এক কোণে, চাঁদ-সুরুজ যিখানে চুপে-চুপে ওঠে, চুপে-চুপে ডোবে, চুপে-চুপে ধান হয়, গম হয়, ফল-পাকুড় হয়, চুপে-চুপেই আমাদের সন্তান হয়, বাড়ে, মরে। আমরা কার কি করেছি যি সেই গাঁয়ের এক মায়ের অন্ধের নড়ি পুতকে কেটে দুখাণ্ডা করে দেবে?

আমার খুব মনে হতে লাগল একবার রায়দের ছোট গিন্নির কাছে যাই। আমার বড় খোঁকা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল রোগে ভুগে।

ছোট গিন্নির নাড়িছেঁড়া ধনটির দুনিয়া থেকে যাবার সোমায় হয় নাই, কে তাকে মারলে, কুন অপরাধে মারলে, সে-ও জানলে না, তার মা-বাপও জানলে না। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকল ছেলে। পচে গলে লষ্ট হয়ে গেয়েছে সেই লাশ, না কুকুর-শেয়ালে খেয়েছে, নাকি কাক-শকুনে খেয়েছে, তা-ও জানতে পারলে না মা-বাপ। আহা, একবার যাই সত্য-র মায়ের কাছে! তার গায়ে-পিঠে হাত দিতে পারব না জানি, হিঁদুরা আমাদের ছোঁয় না। ছোট গিন্নি তো আবার বামুনের মেয়ে, যিখানে যেয়ে বসব দাঁড়াব সিখানে আবার পানি ঢেলে ধোবে। তা হোক, একবার যাই। কত্তাকে শুদুব কিনা ভাবলম। এই বাড়িতে বউ হয়ে আসার পরে কুনোদিন গাঁয়ের রাস্তায় বেরুই নাই পায়ে হেঁটে। যেখানেই যাই, গেয়েছি গরু-মোষের গাড়িতে, টপ্পরের দু-মুখে শাড়ি বেঁধে। তবে গাঁয়ের মোসলমান পাড়ায় বড় ননদের বাড়িতে দু-একবার যাই মাঝে মাঝে, হেঁটেই যাই। পাড়ার ভেতর দিয়ে ই বাড়ি উ বাড়ির পাশ কাটিয়ে, এর এগ্‌নে ওর এগ্‌নের ওপর দিয়ে চলে যাই। দিনে রাস্তায় কুনোদিন বেরুই নাই। করে বউ হয়ে ঢুকেছি এই বাড়িতে, মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, পাকছে-ও দু-একটি, ইয়া চ্যাওড়া সিঁথি অ্যাকন– তবু বউমানুষের শরম গেল না আমার। মনে করলম, কত্তাকে আর শুদুব না। ক্যানে বেরিয়েছেলম শুনলে রাগ করবে না আমি জানি।

বৈকাল বেলায় গা-মাথা ঢেকে কুনোরকমে টুক করে রাস্তাটো পেরিয়ে পুকুরের পাড়ের কলাবাগানের আড়াল আড়াল গ্যালম রায়বাড়ি। পুকুরের দখিন কোণেই বাড়ি। বাইরে এসে গায়ে বাতাস লাগলে মনে হলো কুন জগতের বাতাস, চাপাপড়া ঘাস যেন নতুন জান পেলে। রায়বাড়ির সিং-দরজা নাই, কবে বিক্রি হয়ে গেয়েছে, সেখানে দুদিকের মাটির পাঁচির হাঁ হয়ে আছে। সেটো পেরিয়ে এগ্‌নেয় যেয়ে দাঁড়াইতেই দেখলম সীমেনার পাঁচির কবে ভেঙে পড়ে গেয়েছে। চারিদিক খাঁ খাঁ, এককোণে একটি মাত্র ঘর, আর এগ্‌নের এক কোণে

রান্নাঘর। ঘরের ছামনে যি একটুকু উসারা আছে, সেইখানে একটি ছেঁড়া ছপ পেতে শুয়ে আছে রায়গিন্নি। দুদিকে গিঁট-মারা ময়লা একটো বালিশ মাথার তলা থেকে বেরিয়ে এয়েছে আর উঁচু উসারার ধাড়ি থেকে রায়গিন্নির এলোচুল এগ্‌নে পয্যন্ত ঝুলে আছে। খানিক আগে হয়তো পানি ঢেলেছে মাথায়, ভালো করে মোছা হয় নাই, চুল গড়িয়ে টপ টপ করে ত্যাকনো পানি পড়ছে, দু-চারটি পাকা চুল দেখা যেচে। ছোট গিন্নির চোখ বোজা, জেগে না ঘুমিয়ে ঠিক বুঝতে পারলম না। বাড়িতে কাক-পক্ষী নাই, একদম ফাঁকা। মেয়েদুটি নাই, ছেলেটি-ও নাই আর ছোটরায় লিশ্চয় ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। এত বড় পুত্রশোকেও তার উপয় নাই, পোড়া প্যাট তো মানবে না, ভিক্ষার চালেই সেই প্যাটের গত্ত ভরাইতে হবে।

কি করব বুঝতে পারছি না। চলে আসব না কি ভাবছি, এমন সোমায় রায়গিন্নি চোখ মেলে আমাকে দেখলে। চোখের পাতা তার তখুনি আবার বন্ধ হয়ে যেছিল, চেয়ে তাকানোর খ্যামতা নাই। কিন্তুক তবু কি কষ্ট করে যি সি চোখের পাতাদুটি খুলে রাখলে, তা আমি বুঝতে পারলম।

কে?

গলার আওয়াজ শুনে গা শিউরে উঠল। ই কি মানুষেরা গলা? আমি নিজের পরিচয় দেলম। মাথায় পানি ঢালতে যেয়ে ছোট গিন্নির লালপাড় ছেঁড়া শাদা শাড়িটিও ভিজে গেয়েছে। মুশুরির বিউলির মতুন গায়ের রঙ তার অ্যাকনো আছে, ভেজা শাড়ির ভেতর দিয়ে সেই রঙ যেন ফুটে বেরুইছে। আমি পরিচয় দিলে অতি কষ্টে উঠে বসতে বসতে ছোট গিন্নি উসারার দিকে দেখিয়ে আমাকে বসতে বললে, বোসো দিদি।

একটু অবাকই হয়ে আমি আস্তে আস্তে ছোট গিন্নির কাছ থেকে একটু দূরে উসারার ওপর মাটিতেই বসতে গ্যালম, গিন্নি ইশারায় আর এট্টু কাছে যেতে বললে।

আমার এমন সাধ্যি নাই যে আসনটা এনে তোমাকে বসতে দি– হারামজাদি দুটি এখন কোন্ চুলোয় গেছে!

তাড়াতাড়ি করে মাটিতে বসে পড়ে আমি বললম, না না, আমি এই মাটিতেই বসি, তুমি বেস্ত হোয়ো না। আমাকে তুমি চিনতে পারো নাই, আমি–

না, না, চিনতে পেরেছি। দু-তিনবারের বেশি তোমাকে দেখি নাই বটে, তবে একবার তোমাকে দেখলে কেউ ভুলতে পারে? পিতিমে দেখা আর তোমাকে দেখা যে এক কথা। আমার কি সৌভাগ্যি যে তুমি এ বাড়িতে এসেছ–

আমি যি মা– খপ্ করে মুখ দিয়ে কথাটো বেরিয়ে গেল আর কি যি হলো জানি না, চোখদুটি আমার পানিতে ভেসে গেল। সেই ঝাপসা চোখেই আবছা দেখতে প্যালম রায়গিন্নি একদিষ্টে আমার দিকে ঠিক যেন শাদা পাথরের চোখে চেয়ে রয়েছে। আমার চাউনি পোষ্কার হলে দেখলম রায়গিন্নির চোখের পাতা পড়ছে না, থির তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাপর, অ্যানেকক্ষণ পর, আস্তে আস্তে তার ডাগর চোখদুটি পানিতে ভরে এল, টইটম্বুর হয়ে এল আর গলা দিয়ে শুকনো বাতাস বার করতে করতে সে বললে, দিদি বড় কষ্ট, বড় কষ্ট দিদি! সি এমন করে বলা, সি এমন করে বলা! আর বলতে বলতেই রায়গিন্নি মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, কোথা রে, কোথা রে, কোথা গেলিরে, কোথা মরে পড়ে থাকলি রে বাবা!

আমার এমন ইচ্ছে হলো যেন সব ভুলে এই মানুষটিকে বুকে জড়িয়ে ধরি। মনে হলো সে-ও যেন হাত বাড়িয়ে আছে। এত ইচ্ছে, তবু যেতে কি পারলম? তখনি মনে হলো, যেতে যি পারছি না, তার কারণ তো আমি মোসলমান আর রায়গিন্নি হিঁদু! আর য্যাত লড়ালড়ি, খুনোখুনি হচে সব তো শুদু হিঁদু-মোসলমান বলে। এক হিঁদু মায়ের পুতকে মারছে একজনা মোসলমান আবার এক মোসলমান মায়ের পুতকে মারছে একজনা হিঁদু। আঃ হায়রে! মানুষ লিকিন বুদ্ধিমান পেরানি।

আমি যেখানকার সিখানেই বসে থাকলম, একফোঁটা নড়তে পারলম না আর রায়গিন্নি মেঝেতে মুখ গুঁজে অমনি করে গুঙিয়ে গুঙিয়ে এমন কাঁদন কাঁদতে লাগল যেন ধরণী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মনে মনে ভাবছি আমি এখানে কিছুই করতে পারব না, মায়ের এমন শোকে আল্লাই সান্ত্বনা দিতে পারবে না, আমি তো কুন ছাড়, তাইলে আমি অ্যালম ক্যানে?

এইসময় সিং-দরজার হাঁ-মুখ দিয়ে রায়গিন্নির হারামজাদি দুটি বাড়ি ঢুকল। সি যি কি সোন্দর মেয়েদুটি! পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা টানা চোখ, যেন পটে আঁকা। প্যাট ভরে খেতে পায় না, রুখু চুল উড়ে বেড়াইছে। কতোদিন ত্যাল পড়ে নাই তাতে, তবু কি রূপ, কি রূপ। হাতে পায়ে চুলে ধুলোর পরত পড়েছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে ধপধপে গায়ের রঙ যেন ফেটে বেরুইছে। তারা মাথা নামিয়ে মায়ের দু-পাশে হেঁটো মুড়ে বসল। সি মুখদুটিতে যি কি আছে আমি বলতে পারব না। একবার একবার বুনদুটি আমার দিকে তাকাইছে, আবার মুখ নামিয়ে নিছে। আস্তে আস্তে তারা মায়ের ছড়ানো চুলগুলি গুছিয়ে তার উবুড় পিঠে রাখলে, তাপর দুপাশ থেকে রায়গিন্নির মুখটি ধরে খুব নামো গলায় বললে, মা ওঠো, ওপাড়ার জেঠি বসে আছে, উঠে কথা বলো। এই বলে তারা মাকে উঠে বসাইলে।

চেয়ে দেখলম ছোট রায় ভিক্ষের ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। ভিক্ষে অ্যানেক পেয়েছে, ঝুলিটি বেঁধে বস্তার মতুন করে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে। খালি-গা, সারা প্যাটে দাদ, চুলকিয়ে চুলকিয়ে যেন খড়ি উঠেছে। ময়লা পৈতেটি দেখে মনে হচে বামুন বটে! এগ্‌নে পেরিয়ে উসারায় উঠে একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে মাটি দেখতে দেখতে সে ঘরে যেয়ে ঢুকল।

কি করব, এইবার আমি আবার উঠব উঠব করছি, রায়গিন্নি ধরা গলায় বললে, কি করে কি হলো দিদি, কিছুই বলতে পারব না। ছেলে মরল মরল, তার দেহটি-ও পেলাম না। শেষ কাজও করতে পারলাম

না। আমাদের হিঁদুদের মধ্যে গঙ্গা না পেলে কারু মুক্তি নাই। যতো পুণ্যিই থাকুক, পাপ তো কিছু সব মানুষেরই থাকে। সেই পাপ কিছুতেই ক্ষয় হবে না মা গঙ্গা কোলে না নিলে। তার দাহ হলো না, ছেরাদ্দ-ও এখনো হয় নাই। তোমাদের মতোই তো দিদি, গোর না দিলে তোমাদের কারু কি গতি হয়?

খবরটো কেমন করে পেয়েছিলে ছোট গিন্নি?

সিদগাঁ আমার বাপের বাড়ি। আমার ছোট ভাই কলকাতায় কাজ করে। সেই তো সত্যকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এক বড়লোকের বাড়িতে রান্নাবাড়ার ঠাকুরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। দুজনাই একসাথে এক মেসে থাকে। আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করলেও দুজনে মেসে ফেরে একসাথে। সেদিনও তেমনি ফিরছিল তারা। রাস্তা ফাঁকা। দাঙ্গা নাকি কদিন আগে শুরু হয়েছিল, এরা ওদের মারছিল, ওরা এদের মারছিল। এক দিকে হিঁদু-পাড়া আগুনে পুড়ছে, আর একদিকে তোমাদের মোসলমান-পাড়া পুড়ছে। ভাই বলছিল, সামনা-সামনি দাঙ্গাতে-ও মানুষ মরছিল।

সত্য তো সামনা-সামনি দাঙ্গাতে মরে নাই।

না দিদি, হিঁদুপাড়ায় একজন মোসলমানকে বাগে পেলে মারছে আবার মোসলমানপাড়ায় একজন হিঁদুকে বাগে পেলে মারছে, চিনুক আর নাই চিনুক। হিঁদু না মোসলমান বুঝতে পারলেই হলো। সেদিন রাস্তা ছিল ফাঁকা, কিরীটী–

কিরীটী তোমার ভাই?

হ্যাঁগো দিদি, ঐ একটিই ভাই আমার। তা কিরীটী বললে, হঠাৎ চারজন তোমাদের জেতের লোক– পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছিল– তাদের ঘিরে ধরল। চারজনের হাতেই ছুরি ছিল। এসেই কোনো কথা নয়, সত্য-র তো খালি গা, পৈতে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বামুন– সত্য-র পেটে বুকে চারজনেই ছুরি ঢুকিয়ে দিল। কিরীটী-ও বাঁচত না– সত্য-র দিকেই ওদের সবার নজর ছিল বলে সে লাফ

দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে একটা বড় নিমগাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। সেখান থেকেই সে সব দেখলে। সত্য দুবার মা মা বলে ডেকেছিল, আর কোনো কথা বলতে পারে নাই। পেটে বুকে পিঠে ছুরি মারতে মারতে ছেলেটিকে আমার ঝাঁঝরা করে দিয়ে আর একটুও দাঁড়ায় নাই তারা। কিরীটী বললে, আমাকে তুমি জুতো মারো দিদি, আমি কাছে গিয়ে সত্যকে আর একবার দেখে আসতে পারি নাই গো, পেরান নিয়ে সেই যে দৌড়েছি, মেসে এসে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে তবে থেমেছি।

আমি রায়গিন্নির মুখের দিকে চেয়ে থাকলম। তার চোখে অ্যাকন আর পানি নাই, চোখদুটি যেন ধকধক করে জ্বলছে। আমার মনে হতে লাগল, আমার বোধায় আসা ঠিক হয় নাই, আমার বোধায় অ্যাকন চলে যাওয়াই ঠিক। রায়গিন্নি কাকে ঘিন্ করবে বুঝতে পারছে না, বোধায় আমাকেই তার ঘিন্ লাগছে। কি দোষ দোব রায়গিন্নির? ঐ মা তার ছেলের লাশটো-ও দেখতে পায় নাই। রাস্তায় সেইখানেই লাশ পড়েছিল না, মুদ্দোফরাস টানতে টানতে নিয়ে যেয়ে মড়া-ফেলার গাড়িতে তুলেছিল কিছুই জানে না সে। কিন্তুক কারা তাকে মেরেছে তা জানতে পেরেছে সে। আমি য্যাতোই আসি একজনা মা-কে সান্ত্বনা দিতে, সে আমাকে ভালো চোখে দেখতে পারবে ক্যানে? আমি আর বসে থাকতে পারলম না, বাড়ি যাবার লেগে উসারা থেকে এগ্‌নেয় এসে নামলম। সাথে সাথে রায়গিন্নির মেয়েদুটি– একটির নাম লক্ষ্মী, আর একটির নাম সরস্বতী– রায়গিন্নির হারামজাদি দুটি উঠে দাঁড়াইলে। ত্যাকন রায়গিন্নি সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, দিদি তুমি যাচ্ছ? আমি আর কি বলব দিদি! আর যেন কারু কোল এমনি করে খালি না হয়। ভগবানকে বোলো আমি যেন কাউকে শাপ-শাপান্ত না করি, ও মা, মাগো–

ছোট গিন্নি আবার মাটিতে পড়ে কাতরাইতে লাগল। আমি গা-মাথা ঢেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অ্যালম।

এই শুরু হলো। কতো কথা যি চারদিক থেকে আসতে লাগল– কতো কাইনি, কতো ঘটনা। সারা গাঁ, সারা এলেকা সরগরম। আকালেও এইরকম হয়েছিল বটে, তবে সি যেন উল্টো। জাড়কালের রেতে মাঠ যেমন ঠান্ডা, শক্ত কঠিন আর শব্দ নাই– যেন কতোদিনের বাসি মড়া পড়ে আছে– মড়া যেন গলতে পচতে গন্ধ বার করতেও ভয় পেছে, আকাল ছিল তেমনি। সারা সারা এলেকা একদম মরে গেয়েছিল। কিন্তুক অ্যাকন যেন গাঁয়ের পর গাঁ উঠে বসেছে, মোসলমানরা মাথায় ফ্যাটা বেঁধেছে, হিঁদুরা কপালে সিঁদুর লেপেছে, রাগে সবারই চোখ টকটকে লাল। বাঁশের ঝাড়ে ঢুকে বাঁশ কেটে লাঠি বানাইছে, কামারশালে যেয়ে টাঙি সড়কি এই সব বানিয়ে নিছে।

আমার ল-দ্যাওরের খুব ফুত্তি। কার কাছ থেকে কি শুনে লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি ঢুকে বলছে, আর হবে না, হিঁদুদের সাথে আর কিছুতেই থাকা হবে না, পাকিস্তান হাশিল করতেই হবে। তার কথা শুনে মনে হচে, তাই বোধায় হয় ঠিক, পাকিস্তান হাশিল না করলে আর উপয় নেই। ই গাঁয়ের হিঁদুরা তো বটেই, আশেপাশের গাঁয়ের সব হিঁদুরা লিকিন তৈরি হচে, একটি মোসলমানও তারা আর রাখবে না। তা ঠিক, এত হিঁদু ই দিগরে আছে একবার যেদি ঢেউয়ের মতুন আসে, একজন মোসলমানও জানে বাঁচতে পারবে না। তোড়ে ভেসে যাবে। তা এই আবস্তায় সে এত লাফইছে ক্যানে? দ্যাওরকে জিগ্‌গাসা করতেই সে এমন নোম্বা নোম্বা বাত দিলে যি বুঝতে পারলম সে ঘোরে আছে, তার মাথা কাজ করছে না।

তৌহিদের খ্যামতা জানো? তৌহিদি শক্তির সামনে হিঁদু মালাউন দাঁড়াইতে পারবে না। এক মোসলমান, সত্তরজনা কাফের!

আবার কিসব বলতে বলতে সে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। হিঁদুদের তো অত দেখতে পাই না, তারা অত চেঁচায়ও না। কতো কথা যি কানে আসে! কুকুর-বেড়াল কান বন্ধ করতেও পারে, খুলতেও

পারে। তাদের কান নড়েচড়ে। মানুষের কান বন্ধ করার উপয় নেই, তার কান খোলাই থাকে! তাই শুনতে না চাইলেও শুনতে পাই, গাঁয়ের হিঁদুদের লিকিন গতি-মতি ভালো লয়, তারা ভিন্ ভিন্ গাঁয়ের হিঁদুদের সাথে ষড় করছে।

তাইলে কি সব মিছে হয়ে গেল। লতুন বউ হয়ে আসার পরে কত্তামা যি আমার লেগে এক-গা গয়না গড়িয়ে রেখেছিল, সামনে বসিয়ে একটি একটি করে গয়না দিয়ে আমাকে সাজিয়েছিল, সি কি মিছে? কত্তা লিকিন তার বড় ছেলে, তার ছোট ছোট ছেলেদের যি ভাইয়ের অধিক যত্ন দিয়ে মানুষ করলে, সি-ও কি মিছে? ভচ্চায্যি বড় খোঁকা মরলে কত্তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বুকে টেনে ঠায় কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে, সি-ও কি হিঁদু-মোসলমানের লোক-দেখানো আদিখ্যেতা? আর ইদিকে যি আপন ভাইরা এক কথায় পেথগন্ন হয়ে গেল, সি বুঝিন্ কিছু লয়? দাইবউ নাপিতবউ কতোদিন আর ইদিগপানে আসে না সি কি শুদু হিঁদু-মোসলমানে দাঙ্গা হচে বলে? আমার বড় খোঁকাটির লেগে এই কমাস আগেও যি সি আমার কাছে কেঁদে গেল, তা-ও কি লোক দেখানো ছিল? সে ছোট জেতের হিঁদু, বড় জেতের হিঁদুদের কাছে লোক-দেখানোর কাঁদন কাঁদার লেগে তার কি দায় ঠেকেছে? হ্যাঁ, থাকে বটে হিঁদুদের মদ্যে দু-চার জনা হিঁদু যারা মোসলমানদের জান থেকে ঘিন্ করে, পারলে দুনিয়ার সব মোসলমানকে কেটে ফেলে। তেমনি মোসলমানদের ভেতরেও তো আছে তেমন মোসলমান যারা হিঁদুদের ঘিন্ করে, তাদের কাফের মালাউন বলে গাল দেয়, পারলে সব হিঁদুকে মাটিলাগ করে দেয়। এমন দু-চারজনা হিঁদু মাথাসরো যোবক ই গাঁয়ে আছে, সি কথা কত্তাও জানে, আমিও জানি। তেমনি মোসলমান পাড়ায় আছে কটো মাথাড্যাকরা ছোঁড়া, রাতদিন হিঁদু মারবে বলে লাফাইছে। এমন তো সব জায়গায় সব সোমায়েই আছে। তাই বলে দাঙ্গা করতে হবে ক্যানে? রায়গিন্নির হাতের নড়ি ছেলেটিকে রাগ নাই ঝাল নাই

শুদু পৈতে দেখে বামুন বলে চেনা গেল বলে মেরে ফেলতে হবে ক্যানে?

বিষ কের্‌মে কের্‌মে কি আমার ভেতরেও ঢুকতে লাগল? এতদিন যা জেনেছেলম, যেমন করে চলেছেলম, সব কি বদলে যেছে? আস্তে আস্তে আমারও মনে হচে দিন আর রেতের মতুন হিঁদু-মোসলমানও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেয়েছে। কে দিন আর কে রাত অ্যাকনো জানি না। সব গোলমাল হয়ে যেছে। কত্তার যি এত জ্ঞান, সেই কত্তাও অ্যাকন চুপ। একার সোংসারে সারাদিন খেটে মরি, কুনো কুনো দিন সকালে, কুনোদিন সাঁঝবেলায় গুমুড়ে গুমুড়ে কাঁদন আসে, চুপে চুপে কাঁদি, শব্দ করে কাঁদি। কেউ কি শুনতে পায়? শুতে এলে কত্তার সাথে দেখা হয়, সে-ও চুপ, মরিয়া হয়ে একদিন শুদুই, ইসব কি হচে? তুমি এমন চুপ ক্যানে?

আমার কিছু করার নাই, এখন আর আমার কিছু করার নাই।

বাঃ, তোমার কিছু করার নাই, তাইলে কে করবে? এতকাল ই সোংসারের লেগে, ই এলেকার লেগে তুমিই তো সব করে এয়েছ!

আমার সময় চলে গিয়েছে। আমাকে ছেড়ে সময় চলে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। এ এমন আগুন লেগেছে, আমি তো আমি, হিন্দু-মুসলমানের কোনো নেতাই এখন আর এই আগুন সামলাতে পারবে না। খেলা করতে গিয়েছিল আগুন নিয়ে। এখন সেই আগুনে দেশ পুড়ে ছারখার হচ্ছে এ তাদের দেখতেই হবে। যতোসব জোচ্চোর বদমাশ!

কত্তা কাকে গাল দিচে, ক্যানে এত হেঁয়ালি করছে তা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকল না।

হেঁয়ালি না করে আমাকে বলো দিকিনি দ্যাশ ভাগ হবে কি হবে না?

আগে সব পুড়ে ছাই হোক, তারপরে পোড়া দ্যাশ ভাগও হবে, স্বাধীনও হবে।

বোঝলম কত্তা এর চেয়ে পোষ্কর করে আর কিছু বলবে না। তারপর বেশিদিন যায় নাই, একদিন সাঁঝরেতে আমাদের গাঁয়েই হ্যাঙ্গামা লাগল হিঁদু-মোসলমানদের মদ্যে। কারণ সামান্য। শ্যাখেদের একগাদা আউশ ধান পিটনোর লেগে খামারে রাখা ছিল, বোধায় জায়গা হয় নাই, খানিক আঁটি রাস্তায় গাদিয়ে রেখেছিল। হাজরাদের মোষের গাড়ি রাস্তার সেই ধানের গাদা মাড়িয়ে চলে গেয়েছে। সাঁঝরেতে দেখতে পায় নাই হতে পারে আবার ইচ্ছে করেও হতে পারে। শ্যাখেদের কত্তা দলিজে বসে লোকজন নিয়ে তামুক খেছিল। সে গজ্জন করে উঠল, ধানের গাদা মাড়িয়ে গেলি যি?

অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাই নাই।

জোস্‌না রেতে আবার আঁদার কি? দেখতে পাস্ নাই মানে?

দেখতে পাই নাই, পাই নাই, কি করবে কি তুমি? যা করেছি, বেশ করেছি।

বাস, আর যায় কোথা। শ্যাখের বড় ছেলে তাগড়া জোয়ান, সে কুদি মেরে ছুটে যেয়ে হাজরার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। এক ঝটকায় তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাজরা বললে, থাকল এই আমার গাড়ি। সবাইকে খবর দিয়ে আসছি আবার। বাপের ব্যাটা হলে গাড়ি তখন আটকে রাখিস।

আসলে ইসব কিছুই লয়। হিঁদু-মোসলমান দু-পক্ষই ভেতরে ভেতরে তৈরি হছিল। আগুন এতদিন ধোঁয়াইছিল, আজ এট্টু ফুঁই পেতেই দপ করে জ্বলে উঠল। খানিকক্ষণের মদ্যেই সারা গাঁয়ের হিঁদু-মোসলমান মুখোমুখি এসে দাঁড়াইলে। আমার দ্যাওর-রা সব ছুটে বেরিয়ে গেল। লাঠি কাটারি গাঁইতি শাবল যে যেমন পেলে হাতে নিয়ে ছুটলে। ছি ছি ছি! সবাই কি সব ভুললে? এক মাঠ, এক ঘাট, এক রাস্তা, এক খরানি, এক বর্ষা, এক ধান— হায়, হায়, দু-দলের মাত্তর কটো লোকের লেগে সব বরবাদ হয়ে গেল! সি যি কি চেল্লানি, কি হাঁকাড়ি কানে আসতে লাগল কি বলব! জোস্‌না রাত খান খান

হয়ে যেতে লাগল। নোংরা কথায় বাতাস ভরে উঠল। সি-সব কথা শুনে আমার গা পাক দিতে লাগল। কত্তা ঠায় পরচালিতে বসে। মানুষের সামান্য বেপদে যে কুনোদিন ঘরে বসে থাকে নাই, আজ এই মাহা বেপদেও সে থির বসে থাকছে কি করে? সি কথাটি তাকে বলতে গ্যালম।

আমি খবর পেয়েছি, শুধু আমাকে মারার জন্যেই আজকের এই ব্যাপার। আমাকে পেলেই মেরে ফেলবে, তারপর সব মিটিয়ে ওরা চলে যাবে। হিঁদুদের বিশেষ কাউকে মারার কোনো কথা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে আছে কিনা জানি না।

কথা শুনে গা শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে অ্যালম। এই কি সব হিঁদুদের মনের কথা? লয়, তা কিছুতেই লয়, ই শুদু দু-চারজনা মাথা মাথা মানুষ আর কটো বজ্জাত হিংসুক ছেলেছোকরাদের মতলব। আমার এই কথাই ঠিক। দু-পক্ষেরই কজনা মানুষের গলা কানে আসতে লাগল। তারা শুদু শুদুইতে লাগল, কাকে মারবে আর ক্যানে মারবে। আর মানুষ মারলে কার কি লাভ হবে।

শ্যাষ পয্যন্ত হলো না কিছু। সারারাত চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছ্রান্ত হয়ে ভোরবেলায় সবাই নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল।

ই গাঁয়ে কিছু হলো না বটে, তাই বলে সারা এলেকায় কি কিছুই ঘটে নাই? দাঙ্গা লাগানোর এমন সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? চেরকাল দেখে আসছি দুনিয়ায় একটো-দুটো মানুষই সব লষ্টের মূল। রাখাল যেমন করে গরু ডাকিয়ে নিয়ে যায় তেমনি করে এই একটো-দুটো মানুষই ঘরো ভালোমানুষদের ডাকিয়ে নিয়ে যেয়ে গাড়ায় ফেলে। শহরগঞ্জেই এমন খারাপ মানুষ বেশি বোধায়। দাঙ্গাহাঙ্গামা সব সোমায় শহরেই শুরু হয় এই লেগে। গাঁয়ের মানুষ শহরে গেলে সব ভুলে যায়, তার পাড়াপড়শি থাকে না, ভাইবন্ধু থাকে না। সে কাউকে চেনে না। পাশের বাড়িতে যে থাকে তাকেও লয়। ছোট দ্যাওরের

শহরের বাসায় দু-একবার গেয়েছি বটে কিন্তুক কিছুতেই জান টেকে নাই।

হিঁদু-মোসলমানের হিড়ি যেদি পাড়াগাঁয়েই চলে এল, তাইলে টাউন শহর কি বাদ থাকবে? ঠিক, একদিন খবর এল, মউকুমা টাউনের ইসুফ মিয়েকে তার নিজের বাড়ির ভিতরে যেয়ে মেরে এয়েছে হিঁদুরা। খুব নাম করা মোকাদিম এই ইসুফ মিয়ে। তার চামড়ার ব্যাবসা। মোসলমানদের মদ্যে তো বটেই, হিঁদুদের মদ্যেও এমন আবস্তাপন্ন মানুষ বেশি নাই। নিজেদের গাঁয়ের বাড়িতে সে থাকে না। ব্যাবসার লেগে শহরে একটো বেরাট রাজবাড়ির মতুন বাড়ি বানিয়েছিল। সিদিন সে বসে ছিল বাইরের ঘরে। একাই ছিল। এই সোমায় পাঁচ-সাতজনার একটি দল সিং-দরজা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকল। তাদের হাতে টাঙি, খাঁড়া, রামদা– এই সব। অ্যাই, অ্যাই, কে, কে, কি চাই, বাড়ির চাকরবাকররা এইসব বলতে বলতেই তারা বাইরের ঘরের পাকা বারেন্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। শোনলম, ইসুফ মিয়ে চোখ তুলে তাকিয়েই দলটোকে দেখতে পেয়েছিল। সাবধান হবার কুনো সোমায় পায় নাই। সে উঠে দাঁড়িয়ে তোমরা কারা, কি চাই– শুদু এই কথাটি বলতে পেরেছিল, তখুনি তার ঘাড়ে পড়ল পেথম খাঁড়ার কোপ।

তাপর জান-পরান দিয়ে ইসুফ মিয়ে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ছুটে পালাইছে, গায়ে মাথায় পড়ছে দুদ্দাড় করে লাঠির বাড়ি। ঝুঁঝিয়ে রক্ত ঝরছে সব্বাঙ্গ দিয়ে আর গোটা দলটো আসছে তার পেছু পেছু। ই ঘর উ ঘর, কতো ঘর ই বাড়ির তার হিশেব নাই। ইসুফ মিয়ে একবার পালঙ্কের আড়ালে লুকুইছে, একবার আলমারির পেছনে দাঁড়াইছে, নাই, রক্ষা নাই, টাঙ্গি খাঁড়া লাঠি সব এক সাথে চলল। শ্যাষে রান্নাঘরে ঢুকে আর কুনোদিকে সে যেতে পারলে না, হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। দেখতে দেখতে খাঁড়া টাঙি রামদায়ের কোপে ইসুফ মিয়ের শরীল সাত টুকরো হয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ল।

আমি নিজে তো যাই নাই, নিজের চোখে দেখিও নাই, কিন্তুক এই বেবরণ শুনেই আমি যেন সব ঘটনা চোখের ছামনে দেখতে প্যালম। তারপর থেকে খালি ওয়াক দিতে লাগল প্যাটের ভেতর। কিছু খেতে গেলেই বমি আসছে। কিন্তুক কিছুতেই বমি হচে না। রেতে ঘুমুইতে যেয়ে চোখ বন্ধ করলেই যেন দেখতে পেচি ইসুফ মিয়েকে একদল লোক একসাথে কোপাইছে।

সত্য আর ইসুফ মিয়ের মিত্যুর বেত্তান্ত শোনবার পর ভেবেছেলম আর হয়তো এমন খবর কুনোদিন শুনতে হবে না। তাই কি কখনো হয়? আমি শুনছি না, জানছি না বলে কি দাঙ্গা বন্ধ হবে? শুনতে চাই নাই তবু কদিন বাদেই শুনতে প্যালম পাশের গাঁয়ের মোসলমানদের একটি ছেলে জেলার বড় শহরে স্কুলে পড়ত। আমার খোঁকার বয়েসি। মনে হচে যেন দেখেছি ছেলেটিকে, খোঁকার সাথে একবার দুবার এয়েছে ই বাড়িতে। সে মোকাদিম বাড়ির ছেলে না হোক আবস্তাপন্ন গেরস্থ ঘরের ছেলে বটে। শহরে তাদের নিজেদের ছোট বাড়িতে সেই সোমায়ে সে একাই ছিল, আর কেউ ছিল না বাড়িতে। একদিন দোপর বেলায় আজরাইল এল তার জান কবচ করতে। কোথাও পালাইতে পারলে না। ছুটে যেয়ে বাড়ির খাটা পাইখানায় লুকিয়েছিল। সেইখানেই খাঁড়া বগী ছোরা ছুরি কিরিচ নিয়ে একদল হিঁদু যেয়ে তাকে কেটে কুচি কুচি করলে। আহা, জড়াপুটুলি পাকিয়ে পায়খানা-ভরা পাতনাতেই সে মুখ গুঁজে মরে পড়ে থাকল।

এই দুটি ভায়ানক খবরের পরে আমার দ্যাওর আর গাঁয়ের সব মোসলমানরা বলতে লাগল, মোসলমান সব মেরে শ্যাষ করবে হিঁদুরা, দ্যাশে একটি মোসলমানকে আর তারা বাঁচিয়ে রাখবে না। বিশেষ করে দ্যাওর-রা এক-একদিন এক-একটি গুজব নিয়ে আসতে লাগল। কুনোদিন এসে বলছে, সাত গাঁয়ের হিঁদু এক হয়েছে, মা কালীর পুজো দিয়ে কপালে সিঁদুর লেপে খাঁড়া হাতে করে তারা সব সাঁঝরেতে ই গাঁয়ে এসে হামলা করবে মোসলমানদের ওপর। কুনোদিন বলছে,

অত সোজা হবে না, মোসলমানকে যারা চেনে নাই, তারা চেনে নাই। পাশের মোসলমান গাঁয়ের সব মোসলমান আজ সেজে আসছে। আগে এই গাঁয়ের হিঁদুকটোকে সাফ করবে, তবে অন্য কথা।

এইবার আমি কি করব? হিঁদু আর মোসলমানকে আলেদা না করে কি করব? কিন্তুক য্যাতো আলেদা করতে যেচি ত্যাতো যেন পাঁকে ডুবে যেচি। খালি মনে হচে দুজনা মোসলমানের এমন মরণের কথা শুনেই কি ভাবছি হিঁদু জাতটোই এমনি? তাইলে কি দুজনা হিঁদুর মোসলমানের হাতে এমুন মরণের কথা শুনলে ভাবতে হবে মোসলমান জাতও ঐ রকম? তাইলে সত্য-র যি মাকে দেখে এয়েছি সে আর ইসুফ মিয়ের মা যদি অ্যাকনো বেঁচে থাকে, সেই থুত্থুড়ি বুড়ি মা-টো কি আলেদা?

খবর সোমানে আসত লাগল। হাজার হাজার মোসলমান যেমন মরছে হাজার হাজার হিঁদুও লিকিন তেমনি মরছে। কারা কম, কারা বেশি ভেবে লাভ নাই। বাড়ির কাজকর্ম ছেড়ে বাইরের ঘরের জানেলা দিয়ে পাড়ার রাস্তার দিকে চেয়ে থাকি। ছেলেমেয়েরা কাছে আসে না, কোথা কোথা ঘুরে বেড়ায়। মেয়েটি থাকে ননদের কাছে। একা বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি। সব ঠিক আছে, পাখি ডাকছে, বাতাস বইছে, আসমান ভেঙে মানুষের মাথার ওপর পড়ছে না, রাস্তা পথ ঘাট যেখানকার যেমন তেমনি আছে– এর মধ্যে খালি মানুষ মানুষকে মারছে! কলকেতার রাস্তায় ডেরেন দিয়ে কলকল করে মানুষের রক্ত বয়ে যেছে। মোসলমানের রক্ত, হিঁদুর রক্ত। আলেদা কিছুই লয়, একই রক্ত। ঐ ডেরেনে হিঁদু-মোসলমান এক।

কত্তাকে বলতে সে বললে, পড়তে কি ভুলে গিয়েছ? পড়ে দ্যাখো না? কাগজ আসা তো এখনো বন্ধ হয় নাই! পড়লেই বুঝতে পারবে, সব কিছু খালি তোমার এই পাড়াগাঁয়েই হচ্ছে না। সারা দেশে আগুন জ্বলছে। কলকাতায় হিন্দু বেশি, মুসলমান কম, কাজেই সেখানে মুসলমান মারা পড়েছে বেশি। মোটকথা এখন আর স্বাধীনতা-

টাধিনতার কথা নাই, স্বাধীনতা দাও আর না দাও, দেশ ভাগ করে দাও।

তাপর একদিন কত্তা বললে, গান্ধি নোয়াখালি গিয়েছে। সেখানে মুসলমান বেশি, খুব হিঁদু মারা যাচ্ছে। বিহারে মুসলমান মরছে বেশি। গান্ধি কলকাতাকে একরকম করে থামিয়েছে, নোয়াখালি বিহারকেও হয়তো এখন থামাতে পারবে, কিন্তুক ইংরেজরা যা চেয়েছিল তাই হলো। হিঁদু-মুসলমান দুই জাতকে চিরদিনের মতো একে-অপরের শত্রু করে দিলে। পাকিস্তানের নাম করে জিন্না ইংরেজদের কাজটিকেই করে দিলে আর ক্ষমতার লোভে পড়ে নেহেরু-রাও তাই করলে। প্যাটেল, শ্যামা মুখুজ্জে মুসলমানদের আলাদা করে দিতে চেয়েছিল, তাই হলো। গান্ধি এখন একঘরে। দরজায় দরজায় তাকে কেঁদে মরতে হবে।

কত্তার সব কথা ভালো বুঝতে পারলম না। শুধু এই বোঝলম, বেপদ মুটেই শ্যাষ হয় নাই, মাহা বেপদ নেমে আসছে, সব লন্ডভন্ড হবে। এই দাঙ্গাই হবে অছিলা। মানুষ যি আবার সব ভুলে যাবে, আবার হিঁদু-মোসলমান একসাথে বসবাস করবে, সুখে-দুখে দিন কাটাবে, এর কাজ উ করবে, ওর কাজ ই করবে, সবই হবে কিন্তুক তার এগু সব ওলটপালট হয়ে যাবে।

দাঙ্গা আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। ঠিক যেন যুদ্ধু আকাল মাহামারীর মতুন। এই আমাদের জেবনেই ওগুনো সব এল, আবার চলেও গেল। উসব তো মানুষের সোংসারে সব সোমায়ে ঘটে না, আসে আবার চলে যায়। ই দাঙ্গাও বোধায় তাই। দাঙ্গা তো জেবনের লিয়ম নয়, শান্তিই জেবনের লিয়ম। মনে হলো, সারা দ্যাশের মানুষের ভারি জ্বর হয়েছিল, জ্বরে গা পুড়ে যেছিল, চোখ হয়েছিল করমচার মতুন লাল, পিয়াসে বুকের ছাতি ফেটে যেছিল আর মাথা গোলমাল হয়ে শুদু ভুল বকছিল। সেই জ্বর এইবার ছাড়ছে।

এইরকম সোমায়ে, কে আর খবর দেবে, কত্তাই একদিন খবর

দিলে, যাও, দেশ তোমার স্বাধীন হয়েছে।

তাই? আমাকে এট্টু বুঝিয়ে বলো– আমি ব্যাগোতা করে ফেললম্।

হ্যাঁ, ইন্ডিয়া স্বাধীন হলো, দুশো বছর বাদে ব্রিটিশ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাবার সময় দেশটাকে কেটে দুভাগ করে দিয়ে গেল। দুভাগ কেন, তিন ভাগ! যেখানে যেখানে হিন্দু বেশি সেইসব জায়গা নিয়ে হিন্দুস্থান, আর যেখানে যেখানে মোসলমান বেশি সেসব জায়গা নিয়ে পাকিস্তান। বাঙালি মুসলমানদের জন্যে পুব-পাকিস্তান। আর একটি ভাগ।

সব হিঁদু সব মোসলমান এই দুই দ্যাশে চলে যাবে?

তাই কি হয় নাকি? যেখানে হিন্দু বেশি সেখানে কিছু কিছু মুসলমান থাকবে আবার যেখানে মুসলমান বেশি, সেখানে হিন্দুও কিছু থাকবে।

আলেদা করবে বলে এমন করলে ক্যানে?

দাঁড়াও দাঁড়াও, আরও একরকম ভাগ হয়েছে বললাম না? আমাদের এই বাংলা ভাগ হয়েছে আর পাঞ্জাব বলে আর একটি দেশও ভাগ হয়েছে। বাংলায় মুসলমান বেশি, হিন্দু কম। তুমি বোধহয় জানো না, বাংলা-বলা লোক ধরলে মুসলমানই বেশি। সেই হিশেবে গোটা বাংলাকেই পাকিস্তানে ঢোকাতে হয়! হিন্দু নেতারা কি তাই হতে দেবে? বাংলাও এখন দুভাগ হয়েছে– যেদিকে হিন্দু বেশি সেই বাংলা হিন্দুস্থানে আর যেদিকে মুসলমান বেশি সেই বাংলা পাকিস্তানে ঢুকেছে।

বাঃ, ই আবার কিরকম কথা? ইখানকার সব মোসলমান পাকিস্তানে চলে যাবে, আর পাকিস্তানের সব হিঁদু হিন্দুস্থানে চলে আসবে?

না, আসবে না। গোঁজামিলই চলতে থাকবে। তুমি যদি মুসলমানের হিশেব করো, তাহলে তোমাকে এই দেশ ছেড়ে দিতে হবে–এ দেশ আর তোমার নয়, তোমাকে যেতে পুব-পাকিস্তান। পুব-পাকিস্তানের হিন্দুদেরও চলে আসতে হবে এখানে। হয়তো তোমার এই বাড়িতে আসবে কোনো হিন্দু গেরস্থ।

কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

নাক তো চাও নাই– কাজেই নাক পাও নাই তবে নরুন একটা পেয়েছ– ঐ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

এই বলে কত্তা বেরিয়ে গেল।

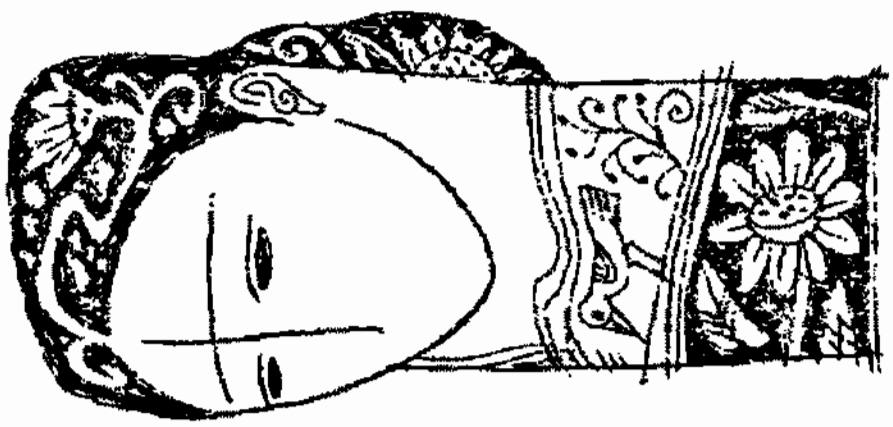

আর কেউ নাই, এইবার আমি একা

বাড়িতে আমি একা রয়েছি। আর কেউ নাই, আর কেউ থাকবে না। আজ দোপরের খানিক বাদে চেরকালের লেগে কাটান-ছিটেন করে সব চলে গেল। ত্যাখন বাড়িভরা মানুষ ছিল। মনে হয় কেউ কেউ মজা দেখতে ই বাড়িতে ঢুকেছিল, অ্যানেকের দাড়ি-গোঁফের তলায় এট্টু এট্টু হাসি আমি দেখতে পেয়েছি।

কদিন ধরে জ্বর আসছে। ঘুষঘুষে জ্বর আর খুসখুসে কাশি। দোপরের পর থেকে মাথা টিপটিপ করে, সাঁঝবেলার মদ্যেই জ্বরটো চলে আসে। গা টিসটিস করে, জাড়-জাড় লাগে, রেতে অ্যানেকদিন খাই না। কাউকে কিছুই বলি নাই। আজ জ্বর এয়েছিল সকাল থেকে। মেয়ে এসে বলেছিল, মা, তোমার মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন? বললম, কই না তো। শুনে মেয়ে কাছে এল। ছেলেমেয়েরা কুনোদিন আমার গা-লাগোটা লয়। ওরা কেউ-ই তো শিশুকালে আমার হাতে খায় নাই, ঘুমোয় নাই। সেই লেগে ওরাও তেমন গায়ে-লাগা লয়, আমারও ছেলেমেয়েদের গায়ে মাথায় হাত দিতে কেমন লাগে। আজই দেখছি, মেয়ে একদম কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, মা,

এখনো একবার ভেবে দ্যাখো। কাগজ-পত্র সব তৈরি হয়ে আছে, তুমি হ্যাঁ বলো। মা, তুমি যা করছ, তা কি কেউ কোনোদিন করে, না করতে পারে। কে কবে শুনেছে স্বামী ছেলেমেয়ে সবাই দেশান্তরী হচ্ছে আর শুধু মা তাদের সাথে যাচ্ছে না, সব ছেড়ে একা পড়ে থাকছে? আমাকে বলতে পারো কেন এমন করছ?

মেয়ে জড়িয়ে আছে, তবু ভেতরে ভেতরে আমি শক্ত হয়ে গ্যালম। একে তো ত্যাকন এট্টু জ্বর এয়েছে, আমি কথা বলতে পারছি না, চোয়াল আটকে আটকে যেছে। আমি বললম, ই নিয়ে আর কথা বোলো না, মা!

মা, তোমার গায়ে কি জ্বর?

না না, উ কিছু লয়।

আজ দশ বছর ধরে এই লতুন বাড়িতে আছি। সোংসার পেথক হবার পর থেকেই ইখানে। এক সোংসারে থাকার সোমায় কত্তা যি একটো ভিটে কিনেছিল মাটির একটি ঘরসুদ্ধু, সেই ঘরটি ভেঙে এই ভিটের ওপর একটি দোতলা কোঠাবাড়ি করা হয়েছিল। ভাইদের সোংসার আলেদা হয়ে যাবার কিছুদিন পরে লতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে আমরা এখানে চলে এয়েছেলম। ত্যাকন থেকেই ফাঁকা বাড়িতে থাকার ওব্যেশ হয়ে গেল। ছত্রিশ জনার হৈ চৈ, চ্যাঁ ভ্যাঁ-তে রাতদিন সরগরম সোংসার ছেড়ে এই বাড়িতে এসে পেথম পেথম আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। করার কিছু ছিল না। সোংসার অ্যাকন ছোট, বলতে গেলে কত্তা আর আমি আর ছোট দুটি ছেলে। একটি গাঁয়ের স্কুলে পড়ে আর একটি খুব ছোট। বড় খোঁকা বাড়িতেই ত্যাকন থাকত। পাকিস্তান হবার পরে সে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে একটি চাকরি খুঁজতে লাগল। তাকে দেখতেই প্যাতম না, ন-মাস ছ-মাসে একবার বাড়িতে আসত। শোনলম, এখানে চাকরির বাজার খারাপ, সে চাকরি খুঁজতে পাকিস্তানে যাবে। তাপর সত্যি সত্যিই শোনলম সে পাকিস্তানে চলে গেয়েছে আর ঢাকায় একটি চাকরিও পেয়েছে। খুশির খবরই

বটে, আমার পেথম পেথম তেমন কিছু মনে হয় নাই। কলকাতায় যাওয়া আর ঢাকায় যাওয়া ত্যাকন একইরকম লাগত। খোঁকা ঘন ঘন বাড়ি না এলেও বছরে একবার তো আসত। শোনলম, শুদু দূর এট্টু বেশি, কলকাতা আর ঢাকায় তফাত কিছু নাই, যাতায়াতে সোমায় এট্টু বেশি লাগে এই যা।

এই যেদি হবে, পাকিস্তান হওয়া-না-হওয়াতে যেদি কুনো তফাত-ই না হবে তাইলে এমন রক্তগঙ্গা ক্যানে করলে সবাই? এত মানুষ মরল, এত মায়ের কোল খালি হলো, এত সোংসার জ্বলে-পুড়ে ছারেখারে গেল, ইসব কি এমনি এমনি! আর অ্যাকন যি হিঁদু-মোসলমানে চোখে চোখে তাকাইতে পারছে না? একই গাঁয়ে বাস করছে, মাঠে-ঘাটে সব জায়গায় একসাথে হচে, তবু সব সোমায়ে মনে মনে সন্দ হচে এই বুঝিন গলা কাটবে, এই বুঝিন বাড়িতে আগুন দেবে। ছি ছি, চেরকালের লেগে এমন ক্ষেতি করে সারা দ্যাশের মানুষের? আর কি করে তারা একে আরেকের পড়শি হয়ে বাস করবে?

এইসব কথা নিয়ে আমি মনে মনে তোলপাড় করতম বটে, কিন্তুক বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার বাগ ছিল না। সবই আগের মতুন। নাপিতবউ আগের মতুনই বাড়িতে আসছে, হাড়িবউকে আজকাল আর আসতে হচে না বটে, বাড়িতে লতুন মানুষ অ্যানেকদিন থেকেই আর নাই। আসবে কিসের লেগে? তবু শুদু কথা বলার লেগেই কখনো-সখনো আসে। মজাক করে কথা বলে, ছেলেমেয়েরা থাকলে তারা দাইমা বলে ডাকে। সবই আগের মতুন। একদিন ল-দ্যাওরকে ডেকে বললম, খুব তো লড়কে লেঙ্গে করে পাকিস্তান করলে। সি দ্যাশটি কিরকম, কোথা সি দ্যাশ তা কি জানো? তা এত কষ্ট করে, মারামারি করে যি দ্যাশটি করলে, অ্যাকন সি দ্যাশে যাবে না?

খেপেছ?

ক্যানে, খেপেছ ক্যানে? এত লাফাইছিলে, অ্যাকন কি হলো?

আরে কি মুশকিল? পাকিস্তান যাব কেন? নিজের দেশ ছেড়ে?

তাইলে কার লেগে দ্যাশটি করতে গেয়েছিলে? কার লেগে অত দরদ ছিল গো তোমাদের?

ঠাট্টা করতে করতেই ইসব কথা বলছেলম বটে, কিন্তুক বলতে বলতেই কেমন চড় চড় করে রাগ চড়তে লাগল আমার। দ্যাওর বোধায় বুঝতে পারলে সি কথাটি, সে আর রা-কথা না করে সিখান থেকে চলে গেল। সে চলে গেলেও আমার বুকের ভেতরটো রি রি করতে লাগল। আসলে বড় খোঁকার ঢাকার চাকরি আমার ভালো লাগে নাই। কিন্তুক কাকেই বা কি বলব? সে তার বাপকেও চাকরির কথা কিছু শুদোয় নাই। চাকরি পেয়ে পেথম বার য্যাকন বাড়ি এল, আমিই তাকে জিগগাসা করলম, সবাই ইখানে, তুমি পাকিস্তানে চাকরি নিলে ক্যানে?

চাকরি একটা দরকার ছিল মা, পেলামই যখন, নোব না কেন?

তাই বলে ভিন্ দ্যাশে চাকরি করবে?

ভিন্ দেশ আবার কি?

ভিন্ দ্যাশ লয়? ভিন্ দ্যাশই যেদি না হবে, তাইলে উ দ্যাশের লেগে অত লড়াই করতে হবে ক্যানে? সহজে তো হয় নাই।

ও তুমি কিছু বোঝো না। সে অনেক ব্যাপার।

তা ঠিক, আমি সত্যিই বাবা কিছু বুঝি না! কিন্তুক ইটুকু তো দেখতেই প্যালম, কতো মায়ের বুক খালি হলো, কতো সোংসারে আগুন লাগল। অ্যাকন সব থেমে গেয়েছে, অ্যাকন বলছ উ কিছু লয়। তাইলে কি বাবা সারা দ্যাশের মানুষকে নিয়ে তামাশা করেছে সবাই?

এমন হয় মা, নতুন একটা দেশ করতে গেলে অমন হয়।

তাইলে ইসব কিছুই লয় বলছ ক্যানে? আমরা সবাই য্যাখন ই দ্যাশেই আছি, তুমি সেই ভিন্ দ্যাশে চাকরি নিলে ক্যানে?

তুমি কিছু ভেবো না তো মা। নামেই দুটো দেশ, কাজে এখনো একই আছে। তুমি ধরে নাও আমি এট্টু দূরে চাকরি করছি। কলকাতা থেকে বাড়ি আসতে যতো সময় লাগত, তার চেয়ে না হয় একটু বেশিই লাগবে।

খোঁকার সাথে এইসব কথা হয়েছিল সেই কতোদিন আগে! সাত-আট বছর আগে। খোঁকা ত্যাকন কিছুই বোঝে নাই, আমিও কিছু বুঝি নাই। মনে হয়েছিল, হোকগো পাকিস্তান, এই তো বেশ চলছে দুই দ্যাশ। তেমন কিছু তো এই গাঁয়ে-ঘরে বুঝতে পারছি না। হলে হোকগো পাকিস্তান। কিন্তুক বেশিদিন গেল না, দু-তিন বছরের ভেতরেই শুনতে প্যালম, আবার ভায়ানক মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছে। বাড়ি বাড়ি লুট হচে, সোনা-দানা ধনসোম্পত্তি কেড়ে নিয়ে মানুষকে ভিটে-মাটি ছাড়া করছে। শহরেগঞ্জে, টেরেনে, ইস্টিমারে মানুষ মেরে মেরে গাদা করছে আর হাজারে হাজারে মানুষ ই দ্যাশ থেকে উ দ্যাশে যেছে, উ দ্যাশ থেকে ই দ্যাশে আসছে। ই দ্যাশ থেকে কজনা যেছে জানি না, উ দ্যাশ থেকে লিকিন বেসুমার মানুষ সব্বস্ব হারিয়ে ইখানে এসে হাজির হচে। কলকেতায় ইস্টিশানে ইস্টিশানে লিকিনি মানুষের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নাই। আকালের সোমায় য্যাতো লোক গেয়েছিল কলকাতায়, অ্যাকন তার চেয়ে অ্যানেক বেশি মানুষ সিখানে গিজগিজ করছে। এইসব শুনে এতদিনে মালুম হতে লাগল যি দুটি আলেদা দ্যাশ হয়েছে বটে! আরও ভালো করে মালুম হলো, যিদিন শোনলম খোঁকা ইবারের ঈদে বাড়ি আসতে পারছে না। বকরিদে আসতে না পারলেও এতদিন ফি ঈদে সে বাড়ি আসছিল, বিয়ে হয়ে বউ নিয়ে যাবার পরেও সবাইকে নিয়ে আসছিল। ইবার আর আসতে পারবে না– পাস্‌পোট না কি চালু হয়েছে, সেই বই সরকার না দিলে কেউ উ দ্যাশ থেকে ই দ্যাশে কিম্বা ই দ্যাশ থেকে উ দ্যাশে যেতে আসতে পারবে না।

কপাল এমনি বটে! একমাত্তর মেয়ের বিয়ে হলো ইখানে। কিন্তুক বিয়ের কদিন বাদেই শোনা গেল, জামাই বড় চাকরি পেয়েছে পাকিস্তানে। বিয়ে য্যাকন হয়েছিল, ত্যাকনো ঐ পাস্‌পোট না কি বলে হয় নাই। তারাও যেছিল আসছিল, ইবার আর তারাও আসতে পারছে না।

এইসব ঘটার পরে আর কোথা কি হয়েছে জানি না, আমার সোংসার বড্ডা ফাঁকা হয়ে পড়ল। খালি ছেলেদুটি। একজনার স্কুলের পড়া শ্যাষ হলো-হলো, আর একজনা খালি স্কুলে ঢুকেছে। দ্যাশ আলেদা হোক আমি চাই নাই অথচ আমারই ছেলেমেয়ে বিদ্যাশে চলে গেল আর আলেদা দ্যাশের লেগে যারা লাফাইছিল তারা যেমনকার তেমনিই রইল। বিনা কারণে শুদু হিঁদু-মোসলমানের মাঝখানে একটো ছেঁয়া পড়ে গেল। সেই ছেঁয়া আর কুনোদিন গেল না। কুনোদিন যাবে কিনা তা জানি না।

আমার যে মেজ খোঁকা গাঁয়ের স্কুলে পড়ছিল, সে একদিন স্কুলপাশ দিলে। কাগজ হাতে করে যিদিন কত্তা বাড়ি ঢুকে আমাকে দেখাইলে খোকা ভালো করে পাশ দিয়েছে, সেইদিনই বৈকাল বেলায় শহরে ছোট দ্যাওরের কাছে তারে খবর এল আমাদের একটি লাতিন হয়েছে। একই দিনে দুটি ভালো খবর। ছেলে বড় স্কুলের পাশ দিয়েছে সি খবর ভালো বৈকি, কিন্তুক আমাদের লাতিন হয়েছে, আমাদের একমাত্তর মেয়ের একটি মেয়ে হয়েছে, ই খবরের কি তুলনা আছে? সাত রাজার ধন মানিক হাতে পেলেও ই খবরের কাছে সি কিছুই লয়। সারা দুনিয়ায় ঢোল পিটিয়ে ই খবর জানাইলেও যি আশ মেটে না আর সেই খবর কিনা তারে জানতে পারলে দ্যাওর আর সে খবর নিয়ে নিজে আসতেও পারলে না, একটো লোক জোগাড় করে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলে। কেউ কোথাও নাই, কেউ এল না ই বাড়ি, নথ নেড়ে নেড়ে, হাসতে হাসতে দাইবউ সোনার মাকড়ি চাইলে না, গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল না। বাড়ির পেথম লাতিন! হায় রে হায়, বাপের সোংসার, ভাইয়ের সোংসার, কত্তার সোংসার সব ভেঙে খান খান। এখন আমি ভালো খবর নিয়ে কি করব?

সাঁঝবেলায় একটি হেরিকেন জ্বালিয়ে দখিন উসারায় বসে আছি। কত্তা-ও আছে। ছেলেদুটিই বাইরে। এখনো ফেরে নাই। মেজ খোঁকার আজ সাত খুন মাপ, কত্তার হিশেবে ছেলে য্যাখন স্কুলপাশ দিয়েছে

ত্যাখন বড় হয়ে গেয়েছে, আর তাকে বকাবকি করা যাবে না। সে আজকে পাশ করার খুশিতে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াইছে।

হঠাৎ আমি ক্যানে যি কাঁদতে শুরু করলম জানি না। দুই দুটো এমন খুশির খবরে কেউ কুনোদিন কাঁদে? কিন্তুক বুকের তলা থেকে গুমুড়ে গুমুড়ে ক্যানে এমন কাঁদন আসতে লাগল কে বলবে? আমার কেউ নাই, ই দুনিয়ায় কেউ নাই, এত থাকলেও আমার কিছু নাই। পচ্চিম আসমানের দিকে তাকিয়ে মনে হল সি আসমানও ধু ধু করছে, চাঁদ নাই, তারা নাই। কাঁদন শুনে কত্তা চুপ করে বসে থাকলে, একটি কথা বললে না। আমাকে কত্তা আজকাল আর কিছু বলে না! কি জানি, পুরুষমানুষ বলে সে কি আমার মতুন কেঁদে হালকা হতে পারে না?

কদিন বাদে পাকিস্তান থেকে মেয়ের চিঠিতে তার খুঁকি হবার খবর এল। সি চিঠিও কাঁদনের চিঠি, মেয়ের পেথম সন্তান তো বাপের বাড়িতেই খালাস হয়, তা তার ভাগ্যে নাই, তার মেয়ে হয়েছে হাসপাতালে। মেয়ে কালো হয়েছে, কালোর ছটায় ভোবন ভাসছে। অনেক কথা লিখেছে, তার পরে লিখেছে একটি সাংঘাতিক কথা। লিখেছে, মেজ খোঁকা আর তো গাঁয়ে থেকে পড়তে পারবে না, তাকে ছাড়তেই হবে, সে নাইলে খুঁকির কাছেই যেয়ে পড়ুক। জামাই তো কলেজের মাস্টার, খুব সুবিধে হবে, বুনকেও তাইলে আর একা থাকতে হয় না, লতুন খুঁকিও তাইলে মামু পায়।

না, আটকাইতে পারলম না! দুই দ্যাশ আলেদা হবার আমি কিছুই বুঝি নাই, কিছুই বুঝি নাই! ঘর বাড়ি সোমাজ সোংসার সব ভাঙতে ভাঙতে সাত টুকরো হবে; ঘটি-বাটি ভাঙবে, বাক্‌সো প্যাটরা ভাঙবে। অ্যাকটো গোটা মানুষও আর গোটা থাকবে না, আমিও থাকব না, কত্তাও থাকবে না। কত্তা এইবার দুটো হবে।

ঠিক তাই হলো। কত্তা আমাকে বেশি কথা বললে না। মেজ খোঁকাও বেশি কিছু বললে না। সে অ্যাকন অ্যাকটো গোটা মানুষ।

এই তার স্বাস্থ্য, এই জোয়ান। যেন অন্য মানুষ। আমারই কোলে এতটুকুন ছিল, আমারই বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে, কিছুতেই বিশ্বেস হয় না। অচেনা লাগছে, কথা বলতে কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে। বুঝতে পারছি, এখন আর আমার কাছে কিছু থাকার সোমায় লয়, আমার কাছ থেকে সব চলে যাবারই সোমায়।

কথা আর কত বলব? দশদিনের মদ্যে সব বেবস্থা করে মেজ খোঁকা পাকিস্তানে তার বুনের কাছে চলে গেল। পুরনো দিনের সব কথা য্যাকন বলতেই বসেছি, ত্যাকন আর কপাল চাপড়ে কি হবে, এইখানেই বলে রাখি সব শ্যাষের আঘাতটো দিলে বড় খোঁকা। জেনে লয়, ইচ্ছে করে লয়, দিলে দুনিয়ার লিয়মে। দিন চেরকাল কারুর হাতে বাঁধা থাকে না, জেবনের কিছুদিনের লেগে কিছুদিন তাঁবে থাকে, তাপর হাতছাড়া হয়ে যায়। আমার দিনও এইবার হাতছাড়া হতে লেগেছে, দিন আর অ্যাকন আমার লয়। বড় খোঁকা জানাইলে, সোংসারে সে কুনোদিন কিছু করতে পারে নাই, কুনো কাজেই লাগতে পারে নাই, এখন আর তার কিছু করারও নাই, তাকে পাঁচে-পেরকারে বাস করতে হচে আর এক দ্যাশে। কুনোদিন আর ফিরতে পারবে না। আর কিছু না পারুক, অ্যাকন সে নিজের ছোট ভাইটিকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে চায়। তাকে যেন তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সে-ই তার ল্যাখাপড়ার দায় নেবে।

পানি কুনোদিন ওপরদিকে গড়ায় না। দাঙ্গাহাঙ্গামায় কই ই দ্যাশের অ্যাকটো মোসলমানকে পাকিস্তানে যেতে দেখলম না। গেয়েছে কিনা আমি কি করে জানব? ই এলেকায় তো দেখলম না। কিন্তুক বড়লোক আবস্তাপন্ন মোসলমানদের লেগে ভালো ঢল নেমেছে পাকিস্তানের দিকে, অ্যানেক মোসলমানই সিদিকে গড়িয়ে যেচে। আমার ছোট খোঁকাটিও একদিন গড়গড়িয়ে চলে গেল। ভালো হলো কি মন্দ হলো, সিকথা আমি বলতে পারব না, শুদু জানলম আমার সব খালি হলো, সাথে আর কাউকে পাব না। এই খালি সোংসারে একা বসে থাকব।

কথাটো কি ভুল হলো আমার? কত্তা তো আছে এখনো! তবে খুব ভুল বোধায় লয়। কত্তা কি আছে আমার? ভেতরে ভেতরে তা মনে হয় না!

পুরনো বাড়ি আমাদের এই লতুন বাড়ি থেকে এট্টু দূরে। সি বাড়ি অ্যাকন আর একটি বাড়ি লয়, ভেঙে ভেঙে অ্যানেক বাড়ি হয়েছে। সবার খুব খোঁজ খবর নিতে পারি না, তেমন কেউ আসে না, ই বাড়িতে, আমিও যেতে পারি না। আছে সবাই আপন আপন ঘর-সোংসার নিয়ে। শুদু বেধবা ননদটি থাকে একদম একা। ভাগ্নেদুটির কেউ অ্যাকন আর থাকে না তার কাছে। বড়টি চাকরি করে শহরে, ছোটটি স্কুলপাশ দেবার পরে নিজেদের বাড়িতে চলে গেয়েছে। ননদ তার বরাদ্দ ঘরটিতে একা থাকে। চল্লিশজনার সোংসারে যে ছিল মাহারানী, বারো-চোদ্দটি ছেলেমেয়ে মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পেয়েছে যার কাছে, অ্যাকন আর কেউ তার কাছে যায় না। সারাদিনে একটি শিশু তার কাছে খাবার চায় না, তাকে জড়িয়ে ধরে তার শাদা কাপড় ময়লা করে দেয় না, কুনো ভাই তাকে ডেকে একটি কথা জিগ্‌গাসা করে না। খুব খারাপ একটি রোগে ধরেছিল তাকে। ঘন ঘন পেশাব হতো, খুব খেতে মন হতো, দিন দিন রোগা হয়ে যেছিল।

আমি বোধায় সাত-আটদিন খবর নিতে পারি নাই। সিদিন সকালবেলায় শোনলম, ল-বউ দেখেছিল ননদের ঘরের দরজা ঠেসানো রয়েছে যেমন পেত্যেকদিন থাকে। বউদের মদ্যে ল-বউ এট্টু খোঁজ-খবর করত, দিনে দু-একবার যেত ননদের ঘরে। ইদিকে সকাল গড়িয়ে দোপর হয়ে যেছে। গিন্নি ঘরের বার হচে না। ত্যাকন উকি মেরে দেখে, কাত হয়ে গিন্নি পড়ে আছে, মরে একেবারে কাঠ। বোধায় মরার আগে পানি খেতে গেয়েছিল, কাঁসার গেলাসের পানি সারা ঘরে গড়িয়ে পড়েছে, খালি গেলাসটো বালিশের কাছে পড়ে আছে। কখন জান গেয়েছে কে জানে? আধশোয়া মড়া ঐ আবস্তাতেই শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেয়েছে, মুখের ওপর দিয়ে কালো পিঁপড়ে চলে বেড়াইছে। ল-বউ

বললে ঠিক শোবার সোমায়ে সে গিন্নির ডাক শুনতে পেয়েছিল, তার নাম ধরেই ডাকছিল, তা উ রকম করে সব সোমায়ই ডাকত, সে আর গা করে নাই– হায় হায় গো, মরার আগে মুখে এট্টু পানি পয্যন্ত পড়ল না– এই কথা বলে ল-বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আর কতো বলব! কথার তো শ্যাষ নাই, তার চেয়ে বরঞ্চ অ্যাকন যি কথাটি বলতে বসেছি সেই কথা বলি। এই কথাটির পরে আমার আর কুনো কথা নাই। এই শ্যাষ কথাটি বলার লেগেই তো এত কথা বললম। সব মানুষেরই একটি করে শ্যাষ কথা থাকে, সেই কথাটির লেগেই তো সারাজেবন।

ছেলেমেয়েদের পাকিস্তান যাওয়া ত্যাকন সাত-আট বছর হয়ে গেয়েছে। মেজ খোঁকার ল্যাখাপড়া পেরায় শ্যাষ, সে লিকিন কুনো অ্যাকটো চাকরিতে ঢুকবে ঢুকবে করছে। ছোট খোঁকাও স্কুলে ভালোই ল্যাখাপড়া করছে। আমি ত্যাতোদিনে বুঝে গেয়েছি ওরা কেউ-ই আর ই দ্যাশে ফিরবে না। এই সোমায় একদিন সাঁঝবেলায় কত্তা আমাকে বেশ তোয়াজ করে তার পাশে বসাইলে।

বড় খোঁকার একটি চিঠি এসেছে– কত্তা বললে। চিঠি তো মাঝে মাঝেই আসে, দরকার মনে করলে কত্তা পড়তে দেয়, নাহলে দেয় না, শুধু বলে চিঠি এয়েছে, সবাই ভালো আছে। আজ দেখছি, কত্তার হাতেই চিঠিটো ধরা। বললম, তা সবাই ভালো আছে?

আছে। বড় খোঁকা একটি কথা লিখেছে।

কি কথা? খারাপ কুনো কথা?

না, না, তা নয়।

কুনো কিছু নিয়েই তো কত্তা কুনোদিন এমন করে না। আজ এমন লুকোচুরি ক্যানে করছে? আবার আমি বললম, তবে?

বড় খোকা লিখেছে, সবাই এখন পুব-পাকিস্তানে। হিন্দুদের দেশ, মুসলমানদের দেশ এসব কথা এখন আর নাই। হিন্দুস্থান পাকিস্তান সবাই মেনে নিয়েছে। কথা তা নয়, ছেলেমেয়ে নাতিনাতিন সবাই

যখন আর এক দেশে থিতু হয়েই গিয়েছে, তখন আমরা বাপ-মা এখানে একা পড়ে আছি কেন। জমি-সম্পত্তি ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে আমরাও তাহলে ওদের কাছে চলে যাই।

মাথায় আমার বাজ পড়ল। এমন কথা কুনোদিন শুনব বলে মনে করি নাই। ই কথার মানে কি একবার ভাবতে গ্যালম। পিথিমি ঘুরে উঠল আমার চারপাশে, তাড়াতাড়ি মেঝে আঁকড়ে ধরলম। কোথা যাব, আমি কোথা যাব? মরে গেলে কোথা যাব তা জানি, কবরে যাব, আমাদের এই লতুন বাড়ি থেকে দিঘির উঁচু পাড়ের কবরস্থান দেখতে পাওয়া যায়, মরে গেলে ঐখানে যাব কিন্তুক ই দ্যাশ ছেড়ে কোথা যাব আমি কিছুতেই ভাবতে পারলম না। আমার খালি মনে হতে লাগল, ক্যানে যাব কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিক। বুঝিয়ে দিলেই আমি যাব, যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব। ওটো মোসলমানদের দ্যাশ আর এটো হিঁদুদের দ্যাশ ই কথা বলে আর কেউ আমার কাছে পার পাবে না। উ যি মিছে কথা, উ যি শয়তানদের কাজ তা অ্যাকন মনে মনে সবাই জানছে। যাদের জান গেয়েছে তারা আল্লার কাছে ফরিয়াদ করে জানতে চাইবে, যারা ভিটেমাটি দ্যাশছাড়া হয়েছে তারাও আল্লার কাছে এই ফরিয়াদ করার লেগে রপিক্ষে করছে। আমি এই কথাটিই কত্তাকে বললম, বড় খোঁকা যা ভালো বুঝেছে বলেছে, তুমি চেরকাল আমাকে সবকথা বুঝিয়ে বলেছ, তুমি অ্যাকন আমাকে বুঝিয়ে দাও, ক্যানে যাবে?

বোঝার কি আছে? ছেলেমেয়ে নাতিপুতি সব যেখানে আছে, সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, ঘরবাড়ি করেছে, সেখানে তাদের কাছে আমরা যাব না?

না, যাব না। ছেলেমেয়েরা করেছে তাদের নিজেদের জেবনের লেগে, তাদের ছেলেমেয়েদের লেগে। আমরা সিখানে যেয়ে কিছুতেই জোড় মিলব না। সি ফাটল তুমি ভরাইতে পারবে?

আহা, আমাদের জীবন তো শেষ। আর আমাদের করার কিছুই নাই।

শ্যাষ তো ভালো কথা। শ্যাষ ইখানেই হবে। শ্যাষ হবার লেগে বিদ্যাশে যেতে হবে ক্যানে?

এমন করে মুখে মুখে তক্ক আমি কুনোদিন কত্তার সাথে করি নাই। কিন্তুক আল্লা জানে আমি তক্ক করি নাই, কত্তার মুখে মুখ করি নাই। আমার বিশ্ব-বোম্ভান্ডো ভেঙে যেচে যি। আমি যি শতেক চেষ্টাতেও কত্তার কথা মেনে নিতে পারছি না? জানের ভেতর থেকে যি কথাগুলিন আসতে লাগল, আমি সেই কথাগুলিন বলতে লাগলম আর এককথা দুকথা হতে হতে আসল কত্তা বেরিয়ে এল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, চিরকাল আমি যা করব বলে ঠিক করি, তাই করি। কারুর কথা আমি শুনব না, আমি সব বেচে-কিনে পাকিস্তান চলে যাব।

সি তুমি যেতে পারো তবে চেরকাল তুমি যা ঠিক কর তাই হয় না। তুমি অ্যানেক কিছু ঠিক কর নাই, কিন্তুক তাই হয়েছে। তুমি পাকিস্তান হওয়াও ঠিক কর নাই, তোমার সোংসার ভাঙাও ঠিক কর নাই। কিন্তুক উসবই হয়েছে। পিথিমিতে যতো জোর তোমার নিজের পরিবারের ওপর। আর একটি মানুষও তুমি পাও নাই জোর খাটাবার লেগে। তা ইবার আমি বলছি, বড় খোঁকা য্যাতোই বলুক, আর তুমি য্যাতো জোরই খাটাও, আমি যাব না।

রাগে জ্বলে ওঠার আগে কত্তা আর একবার নরম হলো, তোমার একটিমাত্র মেয়ে, সেই মেয়েটির মুখ মনে করো, তার কোলে যে খুকিটি এসেছে, তোমার বড় খোকার যে ছেলে হয়েছে– তোমার নিজের নাতিপুতি, তাদের মুখ মনে করো, ছেলেগুলির মুখ ভাবো। এই পৃথিবীতে আর কি আছে তোমার?

চেরকাল তাদেরই মুখ মনে করেছি, চেরকাল তাদেরই মুখ মনে করব। মন করলে এইবার তারা একবার আমার মুখের দিকে দেখুক। তাদের মুখ মনে করতে আমাকে তাদের কাছে যেতে হবে ক্যানে? আমার বড় খোঁকার মুখ আজ কতকাল দেখি নাই, আর দেখব-ও

না কুনোদিন। তা সি মুখটি কি কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পেরেছে?

কথা শুনে আর একবার কত্তা নরমসুরে বললে, নিজের নাতি-নাতনির কাছে যাবে না এমন আজগুবি কথা কেন বলছ তুমি? সেখানে গেলে আবার তোমার সব হবে। নিশ্চিন্তে বাকি জীবনটা কেটে যাবে।

ঐ লোভ আমাকে তুমি আর দেখিয়ো না। চারাগাছ এক জায়গা থেকে আর জায়গায় লাগাইলে হয়, এক দ্যাশ থেকে আর দ্যাশে লাগাইলেও বোধায় হয়, কিন্তুক গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন্ মাটিতে বাঁচে না।

কত্তা অবাক হয়ে বললে, তুমি আবার এত কথা কবে শিখলে?

রাগ আমারও হলো, বললম, এতকাল যা শিখিয়েছ তাই শিখেছি, যা বলিয়েছ তাই বলেছি, অ্যাকন একটি-দুটি কথা আমি বোধায় নিজে নিজে শিখেছি।

এই কথার পরে পাকা একটি বছর গেল। কেমন করে যি গেল সি একমাত্তর আমি জানি। একটির পর একটি বড় খোঁকার চিঠি আসে– খুঁকির চিঠিও আসে দু-একটি। চিঠি এলে কত্তা কখনো আমার সাথে কথা বলে, কখনো বলে না। কথা বলবে কি, দু-এক কথা হতে না হতে তকরার শুরু হয়ে যায়, কত্তা ত্যাকন মুখে যা আসে, তাই বলে। একবার খুব সোন্দর একটি কথা বললে, শুনে ভারি আমোদ প্যালম। কত্তা বললে, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করব। একবার বললে, দেখি, তুমি কি করে এখানে থাকো। সব বেচে-কিনে চুকিয়ে তবে যাঁব।

মুখে মুখে ঐ মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলব সি আমার সাধ্যি কি? আমি একবারও মনে করি নাই যি আমার কথা দিয়ে কত্তার কথা কাটব। আমার শুদু মনে হছিল, কত্তা যাই বলুক আর যাই করুক, আমার কথাটি আমাকে বলতেই হবে আর সেই কথার মতুন কাজ আমাকে করতেই হবে।

শ্যাষ পয্যন্ত কত্তা একদিন বললে, আর এই নিয়ে একটি কথা আমি তোমাকে বলব না। তোমার মতের আর কোনো দরকার নাই। জমি-জমা বদলের কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। একটি বাড়ির ব্যবস্থাও হয়েছে। বাকি আছে আমাদের এই বাড়িটির বিলি-ব্যবস্থা। থাকো তুমি তোমার গোঁ নিয়ে। যাবার দিনে ঠিকই যাবে তুমি।

কথা শুনে খুব নজর করে আমি আমার সারা জেবনের মানুষটির মুখের দিকে চেয়ে থাকলম, কেমন ধুলোর আড়ালে আঁদার আঁদার লাগল মুখটো। বুঝতে পারলম, কত্তা মিছে কথা বলছে না, আমাকে হুমকিও দিছে না। কিছুদিন থেকে খুব শহরে আনাগোনা করছিল। পাকিস্তান থেকে আসা একটি হিঁদু পরিবারের সাথে বদলের কথা হচে। ধুতি-পরা কেমন একধারা একটি লোক আজকাল পেরায়ই বাড়িতে আসছে।

এইবার আমার সাথে কত্তার কথার শ্যাষ দিনটির কথা বলি। সাঁঝের খানিক পরে কিছুই যেন হয় নাই এমনি ভাব করে হেরিকেনের আলোটো এট্টু বাড়িয়ে দিতে দিতে বললে, ব্যবস্থা সব হয়ে গেল। এই রোববারের পরের রোববারে যাওয়া। বড় খোকা আসতে পারছে না, ওদিকের সব ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে তো। খুকি আসছে তার মেয়েকে নিয়ে। মেজ খোকা আসছে তার সঙ্গে। এক্ষুনি সবার আসার দরকারই বা কি। আসা-যাওয়া তো বন্ধ হচ্ছে না। এখন এই বাড়িটা—

সেইখানেই বসে পড়ে আলো-আঁধারিতে কত্তার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আমি বললম, কেমন করে বললম আমি জানি না, বললম, এই বাড়িটিতে আমি থাকব।

কে যেন থাবড়া মেরে কত্তার মুখ বন্ধ করে দিলে। জেবনে এই পেথম আমি আমার সোয়ামিকে এমনি করে মারলম, আলো-আঁদারির চেয়েও আঁদার হয়ে এল কত্তার মুখ। খুব, খুব কষ্ট সিখানে। তবে সে আর কতোক্ষণ? তখুনি পুরুষ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যেখানে খুশি চলে যাও, যেখানে খুশি থাকো গা, এই বাড়ির বদলি-দলিল হয়ে গিয়েছে।

ও কথা শুনেও আমি আমার কথা থেকে সরলম না, এই বাড়িতেই আমি থাকব। আমাকে হাতে ধরে বাড়ির বার করে দিলে তবে আমি যাব।

আর কুনো কথা হলো না। আর তো কথার কিছু নাই। আমিও আর কুনো কথা বলব না। কতো লোক এল, কতো কথা চলল, কতো বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে লাগল। ভাইরা সব দল-বেঁধে এল, ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটা কিছুই বাদ থাকল না। ছোট ভাইটি মাটিতে মাথা কুটতে লাগল। জায়েরা এসে সব আমার গলা জড়িয়ে কেঁদে গেল, রাজ্যের জিনিশ বাঁধাছাঁদা হতে লাগল, কিছু জিনিশ ফেলা গেল। কিছু জিনিশ দান-খয়রাত হলো। মোট কথা দশদিন ধরে বাড়িতে ম-হা-যজ্ঞ হতে লাগল। মুখ বুজে, ঠোঁট টিপে আমি সব কাজে থাকলম। তাপর খুকি আসার ঠিক আগের দিন সকালে কত্তা এসে আমার সামনে দাঁড়াইলে। জেবনে এই কত্তা কারুর কাছে মাথা নামো করে নাই। আজ দেখলম আমার ছামনে মাথাটো হ্যাঁট করে দাঁড়াইলে। শরমে আমি মরে গ্যালম।

তুমি যাবে ধরে নিয়ে ব্যবস্থা করা আছে। কি করছ একবার ভেবে দেখবে না? এমন কাজ কি কেউ কুনোদিন করেছে? যে শুনবে সেই ছি ছি করবে, আমাদের সকলের মুখে চুনকালি পড়বে।

বাড়িটো বিক্কিরি হলো, না বদল হলো?

কোনোটাই এখনো হয় নাই।

ক্যানে?

কত্তা আমার মুখের দিকে একদিষ্টে তাকিয়ে থাকলে, তাপর আস্তে আস্তে বললে, বলতে যেয়ে তাঁর চোখমুখ কুঁচকে গেল, যদি কিছুতেই না যাও, বাড়িটি এইরকমই থাকবে আর তোমার দাদির দেওয়া জমিটাও বদল হবে না।

অন্যদিন জ্বরটো আসে দোপর থেকে, আজ এয়েছে সকাল থেকেই। বাড়িতে সারা গাঁয়ের মানুষ। হাজার বছরেও যি এমন ঘটনা ঘটে নাই। যা হতে লাগল সি আর বলার লয়। বুড়ো বুড়ো মানুষ সব কেউ কত্তার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে, কেউ গাঁ ছাড়তে বারণ করে, কেউ শাপ দেয়। যার যেমন মনে হচে করছে। ভেতরে ভেতরে ঘুষঘুষে জ্বর নিয়ে আমি আর নিজের দ্যাহটিকে টানতে পারছি না। একবার দেখলম, কত্তামার ছেলেরাও এয়েছে। কত্তামা কবে গত হয়েছে। তার ছেলেদেরও দেখলম একটি-দুটি চুল পেকেছে। যা হয় হোক আমি একদিকে সরে গ্যালম।

হেঁশেলে যেয়ে বসে আছি, তখুনি মেয়েকে নিয়ে খুঁকি আমার কাছে এয়েছিল। তার সাথে কি কথা হলো তা তো খানিক আগেই বললম। খুব কাঁদছে দেখে তাকে আমি আবার বললম, মা, তোমরা যা মনে করছ তা কিন্তুক ঠিক লয়। আমি জেদ করে যেচি না মনে কোরো না। তুমি আমার জানের টুকরো, বড় সাদনা করে তোমাকে পেয়েছি মা, তোমার এই কন্যে আমার সাত-রাজার ধন মানিক। বলতে বলতে এইবার আমার চোখ দিয়ে দরদরিয়ে পানি গড়াইতে লাগল। সি পানি মোছলম না, সেই পানির সাগরের ভেতর দিয়ে মেয়ে-নাতিনের আবছেঁয়া মুখ দেখতে দেখতেই বললম, সব ঠিক আছে মা, তোমাদের সাথে যেচি না বলে মনে কোরো না তোমাদের আমি চেরকালের লেগে জান থেকে বিদায় দেলম। আমি জানব, ছেলেমেয়ে সব-সোমায় কাছে থাকে না, তাদের আলেদা জেবন, আলেদা সোংসার, একসাথে থাকবে ক্যানে? আগেও যেমন যেতে-আসতে, অ্যাকনো তেমনি আসবে-যাবে। এতগুলিন কথা বলে আমি চোখ মুছে তাদের দিকে তাকালম। দেখি, খুঁকির চোখেও অ্যাকন আর পানি নাই। আমি তাদের দুজনাকে ধরে চুমো খেলে খুঁকি মেয়েকে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বেলা আর একটু পড়ে এলে রওনা হয়ে যাবার

সোমায় হলো। ত্যাখন ভেতরে ভেতরে বোধায় ভাবলম, মেজ খোঁকা কি একবার আসবে না? না এলে সি ভালো! তবে একবার কি সে আসবে না? এই ভেবে চোখ তুলতেই দেখি, সামনে মেজ খোঁকা। সে কিন্তুক হাসছে। সোজা আমার কাছে এসে বললে, মা, আমি সব জানি। তোমাকে নিয়ে সবাই পিড়াপিড়ি করছে। আমারও করা উচিত ছিল, করি নাই। এখনো আমি তোমাকে একটুও জোর করব না। শুদু ঠিক করে বলো তো মা, তুমি এই কাজটি করলে কেন? অত জোরই বা কিসের তোমার? এই কথাটা জানতে আমার খুব মন হচ্ছে।

সত্যি বলছি বাবা, আমি ক্যানে তোমাদের সাথে দেশান্তরী হব এই কথাটি কেউ আমাকে বুঝুইতে পারে নাই। পেথম কথা হচে, তোমাদের যি একটো আলেদা দ্যাশ হয়েছে তা আমি মানতে পারি না। একই দ্যাশ, একইরকম মানুষ, একইরকম কথা, শুদু ধম্মো আলেদা সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ একটি তালগাছ, উদিকেও তেমনি একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল? কই ঐখানটোয় আসমান তো দুরকম লয়। শুদু ধম্মোর কথা বোলো না বাবা, তাইলে পিথিমির কুনো দ্যাশেই মানুষ বাস করতে পারবে না।

মেজ খোঁকা আমার কথাগুলিন যেন গিলছিল। আমার বলা হয়ে গেলে সে শুধু বললে, মা তোমার কথা ঠিক, তবে আরও কথা আছে।

তা থাকুকগো, তা নিয়ে আমার দরকার নাই। আমি এই বুঝি যি ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে আজকালকার দিনে আর কাছে থাকতে পারে না। কাছে রাখতে গেলেই তারা আর বড় হতে পারবে না। দিনকাল বদলাইছে, তাদের ছেড়ে দিতেই হবে। তাদের জেবন আলেদা হবে, সোংসার আলেদা হবে। তার লেগে আমি ক্যানে আমার বাড়ি, আমার দ্যাশ ছাড়ব? আমি জানব তোমরা সবাই দূরে গেয়েছ। বিদ্যাশ

বলে যেদি না মানি, তাইলে তোমরা যতো দূরে গেয়েছ তার চেয়ে অ্যানেক অ্যানেক বেশি দূর তো ই দ্যাশেই যেতে পারতে। বছরে একবার দুবার মা-কে দেখতে এসো, তাইলেই হবে।

ইচ্ছা করেই কত্তার কথা আর তোললম না। মেজ খোঁকা কিন্তুক হাসিমুখেই বিদায় নিলে। আমি তার পেছু পেছু এসে দেখলম, মালবোঝাই তিনটো গরুর গাড়ি রওনা হয়ে গেয়েছে। নাতনিকে নিয়ে খুঁকি আর একটি গাড়িতে উঠতে যেচে। একবার আমার দিকে তাকাইলে। কত্তাও গাড়ির দিকে যেছিল, কি মনে করে হঠাৎ ফিরে এসে আমার কাছে দাঁড়াইলে, লহমার লেগে তাকাইলে আমার মুখের দিকে, তাপর আবার গাড়ির কাছে ফিরে গেল। কত্তা কবে ফিরবে? এক মাস পরে? দু-মাস? একবছর? দু-বছর? তিনবছর? ফিরবে না কুনোদিন?

এই দোতলা মাটির বাড়ি খুব বড়। একতলায় চারটো ঘর, দোতলায় চারটো ঘর। কটো আর ব্যাভার করতে পারি? দু-একটো বাদে বাকি সব ঘরই পড়ে থাকে। দোতলার একটি ঘরে অ্যাকনো জানেলা বসানো হয় নাই। শুদু এই জানেলা ক্যানে, অ্যানেক জানেলাই অ্যাকনো লাগানো হয় নাই। ভেতরের দিকে অ্যানেক দরজাও নাই। সব দেয়াল ল্যাপা হয় নাই, কাদার ওপরে মিস্ত্রির আঙুলের দাগ দেখা যায়। কত্তা বলে, মানুষ বাড়ি তৈরি শুরু করতে পারে, বাড়ি কুনোদিন শ্যাষ করতে পারা যায় না। তাই বটে! যাই হোক, দোতলার ঐ ফাঁকা জানেলাটির কাছে যেয়ে বসলে ইস্টিশানের সয়রানের অ্যানেকটো দেখা যায়। সেইখানে যেয়ে বসে বসে দেখলম, পাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার সোমায় গাড়িচারটো চোখের আড়ালে চলে গেয়েছিল, অ্যাকন আবার তাদের দেখতে পাওয়া যেছে, দিঘির উঁচু পাড়ে উঠে আবার গরানে নেমেছে। গাড়ি আর গরুগুলিকে শুদু দেখতে পেছি, আর কাউকে লয়। পেছনের ঐ গাড়িতে আছে আমারই প্যাটের ভেতরে-বাড়া নাড়িছেঁড়া আমার দুটি সন্তান আর তাদের বাপ যি তাদের জনমো দিয়েছিল আমারই

ভেতরে। ওরা অ্যাকন চলে যেছে। যে যায় নাই সে আছে ঐ দিঘিটোরই ঢালু পাড়ে কবরের ভেতরে ঘুমিয়ে। সে কুনোদিন যাবে না। একদিন আমি তার পাশেই যেয়ে চেরকালের লেগে ঘুমুবো।

গাড়িচারটো যা-ও বা এতক্ষণ দেখা যেছিল, চোখের পানিতে অ্যাকন আর কিছুই দেখতে পেচি না। কি ঢল যি নামল পানির আর কিছুই দেখতে পেচি না। ঘরদুয়োর বিশ্বসোংসার উঠছে নামছে। বুকের ভেতর কতো বাতাস, কতো আগুন, কতো আলো, কতো ছেঁয়া ফুলে ফুলে গলার কাছে আসছে আবার নেমে যেচে। অ্যাকন যদি এমনি করে মরণ হয়, বেশ হয়।

তাই কি কুনোদিন হয়? কখন গাড়িচারটো মিলিয়ে গেয়েছে। আলো কমছে, ছেঁয়া বাড়ছে। দেখতে দেখতে সব আলো নামতে নামতে সরতে সরতে কোথা চলে গেল আর ছেঁয়া পড়তে লাগল। সারা বাড়িতে অ্যাকন ছেঁয়া, ঘরে ঘরে ছেঁয়া, ঘরের বাইরে এগ্‌নেয় ছেঁয়া, ডুমুর গাছে ছেঁয়া, পেয়ারা গাছে ছেঁয়া। বাড়িতে আমি একদম একা, অ্যানেক আওয়াজ হতে লাগল সারা বাড়িতে। পচ্চিম দিকের আসমানটো দেখতে পেচি, একটি তারা দেখতে পেচি, কতোদিন বাদে মায়ের মুখটো দেখতে পেচি, কুন্ এক জগতের গাছপালা মাঠঘাট দেখতে পেচি আর কানে আসছে কতো রকমের আওয়াজ। পেয়ারা গাছে বাদুড় এসে বসল ডালপালা নাড়িয়ে, কিচ্ কিচ্ শব্দ করে একটো ইঁদুর ছুটে গেল, মাথার ওপর দিয়ে দু-একটো চামচিকে উড়ছে তো তার কুনো শব্দ নাই, ঝমঝম করে একবার ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাক্‌ছে। আবার সব চুপ।

আমি কি ঠিক করলম? আমি কি ঠিক বোঝলম? সোয়ামির কথা শোনলম না, ছেলের কথা শোনলম না, মেয়ের কথা শোনলম না। ই সবই কি বিত্তি-বাইরে হয়ে গেল না? মানুষ কিছুর লেগে কিছু ছাড়ে, কিছু একটা পাবার লেগে কিছু একটা ছেড়ে দেয়। আমি কিসের লেগে কি ছাড়লম? অনেক ভাবলম। শ্যাষে একটি কথা মনে হলো,

আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটো দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুদু মোসলমানরা থাকবে কিন্তুক হিঁদু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলেদা কিসের? আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়। আমাকে আরও বোঝাইতে পারলে না যি ছেলেমেয়ে আর জায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।

সকাল হোক, আলো ফুটুক, তখন পুবদিকে মুখ করে বসব। সুরুজের আলোর দিকে চেয়ে আবার উঠে দাঁড়াব আমি।

আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।

—

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় একটি নাম হাসান আজিজুল হক। ১৯৩৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার যবগ্রামে তাঁর জন্ম। নিজের গ্রাম থেকে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে ওপার-বাংলায় চলে যান তিনি, দর্শনশাস্ত্রের পড়াশোনার পর অধ্যাপনা করেন সেখানকার কয়েকটি কলেজে। ১৯৭৩ সাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক, এখন অবসরপ্রাপ্ত। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল জুড়ে চলেছে তাঁর সৃষ্টির কাজ, অবিস্মরণীয় অনেক গল্পের স্রষ্টা তিনি। গল্প অনেক লিখেছেন, কিন্তু, রহস্যময় কোনো কারণে, উপন্যাস-লেখায় বিশেষ আগ্রহ দেখান নি প্রতিভাবান এই কথাসাহিত্যিক। এ-বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজের উৎসুক প্রতীক্ষার যেন অবসান হলো, আমাদের হাতে এসে পৌঁছল হাসান আজিজুল হকের হৃদয়স্পর্শী এই উপন্যাস : 'আগুনপাখি'।

"আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে
না যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই
আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়। আমাকে
আরও বোঝাইতে পারলে না যি ছেলেমেয়ে আর
যায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে
হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি
করব ? আমি আর আমার সোয়ামি তো
একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ।
খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ,
কিন্তুক আলেদা মানুষ।"